

182. Ac. 907. 1.

# ভারতে বিবেকানন্দ ।

অর্থাৎ

স্বামীজির আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার  
ভারতভ্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অভিনন্দন  
ও তাহার উত্তর সমূহ, তাঁহার ভারতীয়  
সমুদয় কুড়িটী বক্তৃতার উৎকৃষ্ট  
অনুবাদ প্রভৃতি ।



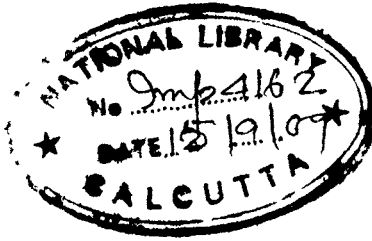
২৫শে ফাল্গুন, ১৩১৪ ।

মূল্য ১।০ টাকা ।

---

কলিকাতা ৯৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ সারদা প্রেস হইতে  
শ্রীলালচাঁদ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ৩৩ নং বোসপাড়া লেন, উষোধন  
কার্যালয় হইতে স্বামী সত্যকাম কর্তৃক প্রকাশিত।

---



**RARE BOOK**

## সূচীপত্র ।

| বিষয় ।                              | পৃষ্ঠা । |
|--------------------------------------|----------|
| সিংহল                                | ১        |
| কলঙ্ঘোর স্বামীজির বক্তৃতা            | ৩        |
| কলঙ্ঘোর দেবমন্দিরে                   | ১৭       |
| কাণ্ডি                               | ১৮       |
| জাফনাভিমুখে—অহুরাধাপুর               | ১৮       |
| জাফনার পথে—ভাভোনিয়া                 | ১৯       |
| জাফনা অভিনন্দন                       | ২০       |
| জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা—বেদান্ত    | ২২       |
| ভারত—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি            | ৪০       |
| পাঘান অভিনন্দনের উত্তর               | ৪১       |
| রামেশ্বর মন্দিরে বক্তৃতা             | ৪৪       |
| পাঘানে স্বামীজির স্বাতিস্তম্ভ        | ৪৬       |
| রামনাদে অভ্যর্থনা                    | ৪৭       |
| রামনাদ অভিনন্দন                      | ৪৮       |
| রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর              | ৪৯       |
| পরমকুডি অভিনন্দন                     | ৬০       |
| পরমকুডি অভিনন্দনের উত্তর             | ৬১       |
| মনমাহুরা অভিনন্দন                    | ৬৮       |
| মনমাহুরা অভিনন্দনের উত্তর            | ৬৮       |
| মাহুরা অভিনন্দন                      | ৭৩       |
| মাহুরা অভিনন্দনের উত্তর              | ৭৪       |
| কুন্তকোণমের পথে—ত্রিচিনপল্লী ও তাজোর | ৮০       |
| কুন্তকোণম অভিনন্দন                   | ৮১       |
| কুন্তকোণম বক্তৃতা                    | ৮২       |
| মারাব রম্ অভিনন্দন                   | ১০৭      |

| বিষয়।                                          | পৃষ্ঠা। |
|-------------------------------------------------|---------|
| মাস্ত্রাজ                                       | ১০৮     |
| মাস্ত্রাজ অভিনন্দন                              | ১০৮     |
| মাস্ত্রাজে খেতড়ি মহারাজ প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র  | ১১০     |
| মাস্ত্রাজ অভিনন্দনের উত্তর                      | ১১১     |
| মাস্ত্রাজ বক্তৃতা :—                            |         |
| ( ১ ) আমার সময়য়োজন                            | ১১৫     |
| ( ২ ) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা       | ১৩৯     |
| ( ৩ ) ভারতীয় মহাপুরুষগণ                        | ১৬২     |
| ( ৪ ) আমাদের উপস্থিত কর্তব্য                    | ১৮৪     |
| ( ৫ ) ভারতের ভবিষ্যৎ                            | ২০৩     |
| চেন্নাপুরী দাতব্যভাণ্ডারে বক্তৃতা               | ২২৬     |
| কলিকাতা                                         | ২২৭     |
| কলিকাতা অভিনন্দন                                | ২২৭     |
| কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর                        | ২৩০     |
| স্বামীজির কলিকাতা বক্তৃতা—                      |         |
| সর্বাবয়ব বেদান্ত                               | ২৪৫     |
| গীতাত্ত্ব                                       | ২৪৫     |
| আলমোড়া                                         | ২৮১     |
| আলমোড়া অভিনন্দন                                | ...     |
| আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর                        | ...     |
| আলমোড়ার অন্যান্য বক্তৃতা                       | ২৮৬     |
| পঞ্জাব ও কাশ্মীর                                | ২৮৭     |
| স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক জনৈক ভক্তের             |         |
| ডায়েরি অবলম্বনে স্বামীজির আলমোড়া হইতে কাশ্মীর |         |
| হইয়া লাহোর পর্য্যন্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তের         |         |
| সংক্ষিপ্ত বর্ণনা                                | ২৮৯     |
| শিয়ালকোট বক্তৃতা—ভক্তি                         | ৩০০     |



| বিষয় ।                                  | পৃষ্ঠা । |
|------------------------------------------|----------|
| লাহোর                                    | ৩১১      |
| লাহোর বক্তৃতা :—                         |          |
| ( ১ ) হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ ... | ৩১৭      |
| ( ২ ) বেদান্ত ...                        | ৩৩৯      |
| রাজপুতানা                                | ৩৮৬      |
| খেতড়ি বক্তৃতা ...                       | ৩৯০      |
| ঢাকা                                     | ৩৯৬      |
| উপসংহার                                  | ৪০৪      |

---



# ভারতে বিবেকানন্দ

## সিংহল ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯৭ সালে। তিনি নর্থ জার্মান লয়েড লাইনের প্রিন্স রিজেন্ট লিওপোল্ড নামক জাহাজে করিয়া সিংহলের অন্তর্গত কলম্বোর পঁছলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটা সাহেব ও একটি মেম। সাহেবদ্বয়ের নাম কাণ্ডেন সেভিয়ার ও মিষ্টার গুডউইন। মেমটি পুরোঁকৃত কাণ্ডেনের সহধর্মিণী। সেভিয়ার-দম্পতী ইতিপূর্বে কার্যোপলক্ষে ভারতে আসিয়াছিলেন ও অনেক দিন বাসও করিয়াছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ; সন্তান সন্ততি নাই। ইংলণ্ডে স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদকেই আপনাদের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা,—ভারতের কোন নিভৃত প্রদেশে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় অতিবাহিত করিবেন এবং অদ্বৈতবাদ প্রচারে তনু মন ধন সব নিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের বাসনা সকল হইয়াছে। হিমালয়ের অন্তর্গত মায়াবতী নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের যে অদ্বৈত আশ্রম, তাহা ইহাদেরই অর্থাহুকুল্যে স্থাপিত হইয়াছে। কাণ্ডেন কয়েক বর্ষ পূর্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন—তাঁহার সহধর্মিণী এখনও বর্তমান। আশ্রমে এক্ষণে বেলুড় মঠের কয়েকটা সন্ন্যাসী, মিসেস সেভিয়ার, অমৃতানন্দ নামক জনৈক আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং কয়েকটা এতদ্বন্দ্বীয় ব্রহ্মচারী রহিয়াছেন। সাহেবগণ যেক্রপ আপনাদের মান অভিমান ভুলিয়া ধর্মের জন্ত তপস্বী করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

মিষ্টার গুডউইন যুবা, অমায়িক, ঘোর কর্মনিষ্ঠ। তিনি একজন বিখ্যাত সাস্টেতিকলেখনবিৎ (Stenographer)। যখন স্বামীজি আমেরিকায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা রিপোর্ট করিবার জন্ত একরূপ এক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়াতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইনি প্রথম

বেতন লইয়া কৰ্মে নিযুক্ত হন, পরে স্বামীজির গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তদবধি সৰ্বদা তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জন্মই স্বামীজির বক্তৃতাগুলি সাধারণে পড়িতে পাইতেছেন। দুঃখের বিষয়, অল্প দিন ভারত প্রবাসের পরেই উতকামনে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

কলম্বোর হিন্দু সমাজ স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্ত একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি সভ্য, স্বামীজির জনৈক গুরু-ভাই এবং হ্যারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্ত পূর্ব হইতেই একখানি ষ্টিম লঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন ষ্টিম লঞ্চে করিয়া স্বামীজি কিনারায় পঁহুছিলেন, তখন দেখা গেল সহস্র সহস্র হিন্দুর ভিড়, সকলেই স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ সমবেত। তথা হইতে তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া বার্ণেস ষ্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত নির্দিষ্ট বাঙ্গালায় লইয়া যাওয়া হইল। এই রাস্তাটি কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত; কলম্বোর যে দাক্ষিণিন্যের বিখ্যাত বাগান আছে, তথা হইতে সিকি মাইল। এই বাঙ্গার যেখানে আরম্ভ, সেইখানে একটি বৃহৎ তোরণ নির্মিত হইয়া নারিকেল বৃক্ষের শাখা, পত্র ও পুষ্পের দ্বারা Welcome (স্বাগত) লিখিত হইয়াছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ছিন্ন তালপত্র দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রবেশমুখে আর একটি ঐরূপ অর্ধচন্দ্রাকার তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। এই বাঙ্গালায় বহু হিন্দুর সমক্ষে সিংহলের বাবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় কুমার স্বামী মহাশয় একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

এই অভিনন্দন পত্রে সিংহলবাসীরা যে ভারত প্রত্যাবর্তনের প্রথমেই তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহাতে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের সমক্ষে সার্বভৌমিক হিন্দুধর্মের ভাব প্রচার করিবার জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজি অভিনন্দন পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন,—“আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। তবে আমি এই অভিনন্দনকে আমার ব্যক্তিগত কার্যের জন্ত প্রশংসা মনে করি না। এই অভিনন্দনে ইহাই স্মৃতি হইতেছে যে, হিন্দুগণ ধর্মকেই সর্বধর্মের মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করেন। আপনারা এ ক্ষেত্রে কোন

বিখ্যাত রাজপুরুষ, যোদ্ধা অথবা ধর্মীর অভিনয় করিতেছেন না। এক জন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর জন্ত এই সকল আয়োজন। ইহাতে কি বুঝিতেছেন না যে, হিন্দুর মতি গতি কোন্ দিকে? যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে এই ধর্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।”

পরদিন শনিবার ঐ বাঙ্গালায় স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্ত ধর্মী, দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধর্মিদরিদ্রনির্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটা দরিদ্রা রমণী স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফল মূল উপহার হস্তে স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামীজিকে ঈশ্বরলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে ভগবদীতা পাঠ এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। রমণী বলিলেন, “গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে কি হইল?” উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত এক দিন স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামীজি এবং তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামীজির সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন না; স্বামীজি যত ক্রণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামীজির পাশ্চাত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দুগণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজির সম্মানার্থ এই বাঙ্গালার “বিবেকানন্দ মন্দির” নাম রাখা হইল।

শনিবার অপরাহ্নে ফ্লোরাল হল নামক স্থানে স্বামীজি একটা বক্তৃতা করিলেন। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, হলে ওলার্ক স্থান ছিল না। প্রাচ্য ভূমে আসিয়া ইহাই স্বামীজির প্রথম বক্তৃতা।

### কলঙ্ঘায় স্বামীজির বক্তৃতা ।

যে সামান্য কার্য্য আম' দ্বারা হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই, পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যটন কালে এই পরম পবিত্র আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্বাদী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কাণ্ড হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ দমনে উপকার বিশেষ হইয়াছে

আমার, কারণ, পূর্বের বাহা হয়ত, হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম,—ভারত পুণ্যভূমি—কর্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি,—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে ‘পুণ্যভূমি’ নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবন্নাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সৎগুণের বিকাশ হইয়াছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্ত-দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বজায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দঙ্ককারী জড়বাদ রূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বঙ্গগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।

আমি সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতালাভ করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি। আপনাদের মধ্যে নীহারী বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয় বিশেষ রূপ অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতির নিকট জগৎ যতদূর শান্তি, আর কোন জাতিরই নিকট ততদূর নহে। “শান্তিপ্রিয় হিন্দু” কথাটা সময়ে সময়ে তিরস্কারবাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন তিরস্কার বাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই

আছে। হিন্দুগণ চিরকালই জগৎপিতার প্রিয় সন্তান। জগতের অন্ত্যস্ত স্থানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য ; প্রাচীনকালে ও বর্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব বাহির হইয়াছে সত্য ; প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব একজাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য ; প্রাচীনকালে বা বর্তমানকালে কোন কোন জাতীয় জীবনতরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দিকে মহাশক্তিশালী সত্যের বীজগম্বু ছড়াইয়াছে সত্য ; কিন্তু বহুগণ, ইহাও দেখিও, ঐ সকল সত্য প্রচার, রণভেদীর নিষেধ ও রণসাজে সজ্জিত গর্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল—রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অজস্র রুধিরশ্রোত না বহাইয়া কোন জাতিই অপর জাতিকে নূতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ওজস্বী ভাব প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছিল।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতি সকল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—কিন্তু ভারত ঐ উপায় অবলম্বন না করিয়াও সহস্র সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিল ! যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইউরোপীয়গণের পূর্বপুরুষেরা জর্মানির গভীর অরণ্যমধ্যে অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া নীলবর্ণে আপনাদিগকে অমূরঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস ঘাহার কোন খবর রাখে না, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনাক্ষারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ, ভারত হইতে প্রসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটাই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা জয় করি নাই,—সেই শুভকর্য্যফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীক বাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। এখন তাহারা কোথায় ? তাহাদের এখন চিরুমাত্রও নাই। গ্রীসদেশের গৌরবরবি আজ অন্তমিত ! এমন সময় ছিল, যখন রোমের সৈন্যবাহিত বিজয়পতাকা জগতের বাহ্যিক সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উজ্জীয়মান ছিল। আজ

সেই ক্যাপিটোলাইন গিরি\* ভয়স্তপ মাত্রে পর্য্যবসিত! যেখানে সীজারগণ দোদাঁড় প্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ উর্ধ্বনাত তন্তু রচনা করিতেছে। অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে আবার পড়িয়াছে; মদগর্বে ক্ষীণ হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের ত্রায় বিলীন হইয়াছে।

এই রূপেই এই সকল জাতি মনুষ্যসমাজে আপনাদের চিহ্ন এককালে অধ্বস্ত করিয়া এখন তিরোহিত হইয়াছে। তোমরা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনুষ্য এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবেন না; তিনি কোন্ অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলাম বলিয়া মনে করিবেন না। সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, যতই দুঃখ দুর্ভিক্ষপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সে গুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ সদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে চাও, তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধর্ম্ম। সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া আমি যে ব্যক্তিষ্টিং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

অজ্ঞাত জাতির পক্ষে ধর্ম্ম সংসারের অজ্ঞাত কাষের ত্রায় একটা কাষ মাত্র। রাজনীতি চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, সেই সকলের চেষ্টা আছে। কিসে আরো অধিক ভোগসুখ লাভ করিব, ভোগে নিতেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কিসে একটু উত্তেজিত হইবে, এইরূপ নানা চেষ্টার সহিত একটু আধটু ধর্ম্ম কর্ম্মও করা আছে। এখানে—এই ভারতে

\* Capitoline hill,—রোম নগর সাতটি পর্ব্বতের উপর নিম্নিত ছিল; তন্মধ্যে যেটির উপর রোমকদিগের ক্লবদেবতা জুপিটারের স্নুহৃৎ মন্দির ছিল, তাহার নাম ক্যাপিটোলাইন গিরি। জুপিটার দেবের মন্দিরের নাম ক্যাপিটল; তাহা হইতে পাহাড়টির ঐ নাম হইয়াছে।

কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্মের জন্ত—ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। চীন-জাপান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহা জানে? পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল নানাবিধ গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উছাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহার সংবাদ রাখ? যদি রাখে, দুই চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট ধর্মসভা বলিয়াছিল এবং তথায় একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য, দেখিতেছি, এখানকার সামান্য মুটে মজুরেও তাহা জানে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, কোন্ দিকে হাওয়া বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোকপ্রকাশ করিতে পূর্বে পূর্বে গুণিতাম, বিশেষতঃ এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্য্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয় পড়িতাম। এখন আমি বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা সত্যও বটে, আবার অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি বা যে কোন দেশের একজন চাষাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত? সে তোমাকে বলিয়া দিবে, সে উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীলদলভুক্ত—সে কাহার জন্তই বা ভোট দিবে। আমেরিকার চাষা জানে, সে রিপাবলিকান বা ডেমোক্রাটসম্প্রদায়ভুক্ত\*। সে এমন কি, রৌপ্য-সমস্যা + সম্বন্ধেও কিছু

\* রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট। যে দেশের শাসন সেই দেশীয় সকল ব্যক্তির দ্বারা একত্রে নির্বাহিত হয়, তাহাকে ডেমোক্রাসি (Democracy) ও যে দেশের শাসনভার প্রজা-সাধারণের দ্বারা নির্বাহিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে থাকে, তাহাকে রিপাবলিক (Republic) বলে। প্রাচীন এথেন্স, রোম প্রভৃতি ডেমোক্রাসির এবং বর্তমান ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রিপাবলিকের দৃষ্টান্ত। এই দুই বিভিন্ন শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতিগণকে যথাক্রমে ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান বলে।

\* রৌপ্যসমস্যা—Silver question,—ব্যবসায়গিজের ন্যূনাধিক্য, নূতন ধনির আবিষ্কার প্রভৃতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রৌপ্য ধাতুর পরিমাণ অজ্ঞাধিক হইয়া থাকে। ইউরোপে এইরূপে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক রৌপ্য জমিয়া গিয়াছে। কাষেই সেখানে রৌপ্যের দর পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে অর্থাৎ যে পরিমাণ রৌপ্য যে পরিমাণ ব্যবশেষ পূর্বে পাওয়া যাইত, সে পরিমাণ আর এখন পাওয়া যায় না। ইউরোপের সহিত যে সকল অপরপর দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ আছে, অথবা যে সকল স্থান তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে,



অবগত আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। সে বলিবে, আমি আর কিছু জানি না, গির্জায় গিয়া থাকি মাত্র। বড় জোর সে বলিবে, আমার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুকশাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা কর, সে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না; সে তোমার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে। সে বলিবে, সে আবার কি? সে সোসিয়ালিজম + প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং এতদ্রূপ অশান্ত বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিনন্দিত। সে জীবনে কখন এ সকল বিষয় সম্বন্ধে শুনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে; রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকু মাত্র বুকে। তাহাকে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম কি, সে আপনাদের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন ছুই একটা কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। আমি ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

ঐ সকলে কিন্তু রৌপ্যের দর ঐরূপে কম না হওয়ায় দ্রব্য এবং মুদ্রাদি বিনিময়ের সময় রৌপ্যের দর লইয়া বিশেষ গোল বাধে। উহাতে ভারত এবং অপরাপর দেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেই গোল মিটাইবার জন্য সকল ইউরোপীয় জাতি মিলিয়া এখন অর্ধ-মুদ্রাবিশেষের একটা নির্দিষ্ট দর স্থির করিয়া দেওয়ায় ঐ বিবাদের জটিলতা, আজকাল কিছু কমিয়াছে। ইহাকেই রৌপ্যসমস্যা বা Silver question কহে।

+ সোসিয়ালিজম,—Socialism, পাশ্চাত্য দেশের একটা প্রবল সম্প্রদায়ের মত। এই সম্প্রদায় অল্পবিত্ত শ্রমজীবী দ্বারাই গঠিত। ইহারো বলে, মূলধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ব্যবসায় লাভের অংশ সমান থাকা উচিত। অন্তঃ এক্ষেপে যেরূপ ঘোর পার্থক্য আছে, তাহা যাহাতে কমিয়া গিয়া শ্রমজীবীর পূর্বাপেক্ষা লাভের অংশ অধিক পায়, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা এই সম্প্রদায় শ্রমজীবীদিগকে সজ্ঞবদ্ধ করাইয়া ধর্মঘট প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা তাহাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছে। এবং ধর্মঘট করিবার সময় যাহাতে তাহাদের পরিবারবর্গের আহারাদির কষ্ট না হয়, সে জন্য চাঁদা তুলিয়া কণ্ড প্রভৃতি করিয়াছে ও নিত্য করিতেছে। পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক চিত্তাঙ্গীল ব্যক্তিও ইহাদের প্রার্থনা জ্ঞানসঙ্গত বিবেচনা করিয়া ইহাদের সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু; আমরা বলি, অনন্ত পূর্বজন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্তমানের যে রূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ যৌক থাকে; সেই পথেই তাহাকে যেন চলিতেই হইবে। সেই ভাব অবলম্বন ব্যতীত সে বাচিতেই পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতিরও একটা না একটা যেন বিশেষ যৌক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানব জাতির জীবনকে সর্বান্বেষণ করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্ঘাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখন ছিলও না আর জানিয়া রাখ, কখন হইবেও না। তবে আমাদের অল্প জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই,—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাব্যাহারে রক্ষা করা এবং যখন সমগ্র উপস্থিত হয়, তখনই এই সমগ্রীভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্রাণিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরাজেরা আগ্রাসন করিয়া বাহিনীযোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতের বিভিন্নজাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে। আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অগ্ৰাঙ্গ দেশের, অগ্ৰাঙ্গ জাতির সম্মিলন ঘটাইয়াছে, চিরবাতস্ত্যপ্রিয় ভারতের যখনই বাতস্ত্য ভঙ্গ করিয়াছে,

যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বজা ছুটিয়াছে। বর্তমান (উনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার\* বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক কৃত অস্পষ্ট লাতিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, “ঔপনিষদের (উপনিষদের পারস্ব অনুবাদের নাম) মূল ব্যতীত উহা অপেক্ষা জগতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। কীবদশায় উহা আমাকে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যু-কালেও উহাই আমায় শান্তি দিবে।” তৎপরে সেই বিখ্যাত জার্মান ঋষি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, “গ্রীক সাহিত্যের পুনরুদ্বোধে জগতের চিন্তা-প্রণালীতে যেরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, শীঘ্রই তদপেক্ষা শক্তি-শালী ও বহুস্থানব্যাপী ভাববিপর্যয় ঘটবে।” আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে। সাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, সাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, সাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় চিন্তার এই ধীর, অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটা বিশেষত্ব আছে। আনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে পূর্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাঁহা দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে, যদি ইংরাজি ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্বারা “মানব জাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা

---

\* মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শুকো পারস্য ভাষায় উপ-নিষদের অনুবাদ করেন। ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এই অনুবাদকার্য সমাপ্ত হয়। সুলতান উর্দোসার রাজসভাস্থ ফরাসী রেনিডেট জেন্টিল সাহেব বর্ণিয়ার সাহেবের দ্বারা এই পারস্য অনুবাদ আঁকেতিল দুপেরো নামক বিখ্যাত পণ্ডিতক ও জেনারেলের আবিষ্কারকে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাতিন অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এই লাতিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপ আকৃষ্ট হন। শোপেনহাওয়ারের দর্শন এই উপনিষদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। এইরূপে ইউরোপে উপনিষদের ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

এই,—Fascination (সম্বোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে; বরং ঠিক তাহার বিপরীত। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাহারা অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে, মনোযোগ সহকারে ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার ব্যবহারের মূলীভূত মহান তত্ত্বসমূহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শতকরা নিরনব্বই জন ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্য্যো, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ উষাকালীন ধীর শিশিরসম্পাতেয় ত্রায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্বসংসর্গ ধর্ম্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহূর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানবজাতিকে তাঁহাদের মতানুবর্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবি করিয়া থাকেন, তাহা শূন্যমায়ে পর্য্যবসিত হইয়া হাওয়ার উড়িয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রব্রতন্ত্ব-সন্ধানের প্রবল মুগ্ধাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারসমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ত্রায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম কেবল অজ্ঞ-দিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই ভারতের দর্শন, ভারতবাসীর মনের ধর্ম্মবিদ্যক সর্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সর্বোচ্চ দার্শনিক সত্য সকলের স্বারাই ভারতবাসীর ধর্ম্ম-জীবন নিয়মিত। তাই আজ এই সকল মহান তত্ত্ব—অসীম অনন্ত জগতের একত্ব, নিগুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্ত স্বরূপ ও তাহার বিভিন্ন জীবশরীরে অবিচ্ছেদ সংক্রমণরূপ অপূর্ণ তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তত্ব,—এই সকল তত্ত্ব পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ জগৎকে একটী ক্ষুদ্র মুংপিণ্ড মাত্র মনে করিত আর ভাবিত, কালও অতি অল্প দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্বোপরি মানবাত্মার

অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বর্তমান এবং সর্বকালই এই মহান তত্ত্ব সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তিপরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধিরাহিত্য (Conservation of energy) \* প্রভৃতি আধুনিক ভয়ানক মত সকল সর্বপ্রকার অপরিণত ধর্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন সেই মানবাত্মার অপূর্ণ স্বজন, ঈশ্বরের অদ্ভুত রাণীস্বরূপ বেদান্তের অপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী, মনোব উন্নতি ও বিস্তার সাধক তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানব জাতির শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই, ভারতবর্ষভূর্ত এদেশে ভারতীয় ধর্মের প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ, যে ভিত্তিমূলের উপর ভারতীয় ধর্মরূপ সৌধ নিম্নিত, আমি তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা প্রশাখা, শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণ বিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করা হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ করাও হইয়াছে। একটি সনাতন। উহা মানুষ্যের স্বরূপ; আত্মার স্বরূপ; ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ; ঈশ্বরের স্বরূপ; পূর্ণত্ব; সৃষ্টিতত্ত্ব; সৃষ্টির অনন্তত্ব; জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে, পূর্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশ মাত্র, এতদ্বিষয়ক মতবাদ; যুগপ্রবাহ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত নিয়মাবলি এবং এতদ্বিধ অজ্ঞাত তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন তত্ত্ব—এমন সকল প্রাকৃতিক বিষয় লইয়া, যে গুণি কালেব দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এ গুলি ব্যতীত আবার অনেক গুলি গোণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই গুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য নিয়মিত। সে গুলিকে প্রকৃতির অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত পক্ষে স্মৃতি ও

---

\* জগতে যত বিভিন্ন শক্তি আছে, তাহার ক্রমাগত একটী অপরিণত পরিণত হইতেছে, সমুদয় কিন্তু শক্তির সমষ্টির পরিমাণ সর্বদাই একরূপ। এই তত্ত্বকে Conservation of energy বলে।

পুরাণের অন্তর্গত । এই গুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন সম্পর্ক নাই । আমাদের আৰ্য্য জাতির ভিতরও এ গুলি কমাগতঃ পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে, দেখা যায় । এক যুগের যে নিধান, অন্য যুগের তাগ নহে । যখন এ যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তাহারা আবার অন্য আকার ধারণ করিবে । মহামনা ঋষি সকল আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালোপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্তন করিবেন ।

জীবাশ্মা, পরমাশ্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডেব এই সকল অপূর্ণ অনন্ত চিন্তো-  
ন্নতিবিধাযক ক্রমবিকাশশীল ধারণার তিস্তিস্বরূপ মহান্ তত্ত্বসমূহ ভারতেই  
প্রসূত হইয়াছে । ভারতেই কেবল মানুষ ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার জন্য  
প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই । “আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার  
ঈশ্বর মিথ্যা, এস যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি !” ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার  
জন্ত যুদ্ধরূপ সংকীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখন দেখা দিতে  
পারে নাই । এই সকল মহান্ মূলতত্ত্ব মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর  
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সহস্র বর্ষ পূর্বের ছায় আজও মানবজাতির কল্যাণ-  
সাধনে শক্তিসম্পন্ন । যতদিন এই পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, যতদিন  
কর্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যক্তি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং  
যতদিন স্বীয় শক্তির দ্বারা আমাদের নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে  
হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বর্তমান থাকিবে ।

সর্বোপরি, ভারত জগৎকে এই তত্ত্ব শিখাইবে । যদি আমরা বিভিন্ন  
জাতির মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী পর্যবেক্ষণ করি,  
তবে আমরা সকল স্থলেই দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্  
পৃথক্ দেবতা ছিল । এই সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর  
বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, তবে সেই সকল দেবতার আবার এক সাধারণ  
নাম হয় । যেমন বেবিলোনীয় দেবতাগণ । যখন বেবিলোনিয়েরা  
বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতা সকলের  
সাধারণ নাম বাল (Baal) ছিল । এইরূপ ইহুদী জাতিরও বিভিন্ন  
দেবগণের সাধারণ নাম মোলক (Moloch) ছিল । আরও দেখিতে  
পাইবে, এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ অপর সকল  
হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বসিয়া

দাবি করে । ইহা হইতেই স্বভাবতঃই এই ভাব আসিয়া থাকে, যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চায়। বেবিলোনিয়েরা বলিত, বাল মেরোডক দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ। অত্যাচ্ছ দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। মোলক যাতে অত্যাচ্ছ মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ভারতেও এই দেবগণের মধ্যে সংঘর্ষ, এই প্রতিদ্বন্দ্বিহ বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণ শ্রেষ্ঠতালভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যবলে এই অশান্তি কোলাহলের মধ্য হইতে “একং সবিপ্রা বহুধা বদন্তি” (সেই সত্যস্বরূপ একমাত্র, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন) এই মহাবাকী উথিত হইয়াছিল। শিব, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন অথবা বিষ্ণুই সর্বস্ব, শিব কিছুই নহেন, তাহাও নহে। এক ভগবানকেই কেহ শিব কেহ বিষ্ণু আবার অগ্রে অত্যাচ্ছ নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন কিন্তু বস্তু এক। পূর্বোক্ত কয়েকটা কথার মধ্যে সমগ্র ভারতের ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের ইতিহাস বিস্তারিত ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার পুনরুক্ত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের এক অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে উপাদানে এই বিরাট্ জাতীয় শরীর নির্মিত তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভূমি, পরধর্মের বিদ্বेष-রাহিত্যের এক অপূর্ণ লীলাক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্তমান, অথচ সকলেই নির্ধিক্রোড়ে বাস করিতেছে। এষ্ট অপূর্ণ ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা—এই পরধর্মের দেশরাহিত্য। তুমি হয়ত দৈতবাদী আমি হয়ত অদৈতবাদী। তোমার হয়ত বিশ্বাস,—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়ত বলিতে পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু উভয়েই খাটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই ইহা কিরূপে হয়,

বুঝিবে,—“এবং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি” (সেই সংস্করণ একমাত্র; বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন।) হে আমার স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দ, সর্বোপরি, এই মহান্ সত্য আশাদিষ্টকে জগৎকে শিখাইতে হইবে। অত্যাশ্র দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁট্কাইয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি; তাহারা হির হইয়া কখন এটা ভাবে না যে, তাহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার সকল বর্তমান। এখনও সর্বত্র এই ভাব,—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই ঘোর সন্ধীর্ণতা! তাহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহা মূল্যবান্ সামগ্রী! অর্থোপাসনাই তাহার মতে জীবনের একমাত্র সন্যবহার! তাহার যাহা আছে, তাহাই বার্থ উপার্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে! যদি সে মৃত্তিকার কোন অসার বস্তু নির্মাণ করিতে পারে, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তবে আর সব ফেলিয়া দিয়া তাহাকেই ভাল বলিতে হইবে! জগতে শিক্ষার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র জগতের এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—জগতে এখনও সত্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সত্যতার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এক্ষণে মনুষ্যজাতির শতকরা ৯৯.৯ জন অল্প বিস্তর অসত্য অবস্থার রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তোমরা অনেক বড় বড় কথা পড়িতে পার, পরধর্ম বিদ্বেষরাহিত্য ও এতদ্বিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসম্বন্ধে আমরা গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় কম; শতকরা নিরনব্বই জন, এ সকল বিষয় মনে স্থানই দেয় না। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি, এখনও প্রবল পরধর্মবিদ্বেষ বর্তমান; নূতন বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্বেও যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইত, এখনও সেই প্রাচীন আপত্তি সকল উত্থাপিত হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ, জগতে যতটুকু পরধর্ম বিদ্বেষরাহিত্য ও ধর্মতাবের সহিত সহানুভূতি আছে, তাহা এখানেই, এই আর্ধ্যভূমেই বিদ্যমান, অপর কোথাও নাই। এখানেই কেবল ভারতবর্ষবাসীরা মুসলমানদের জন্ত মসজিদ ও খ্রীষ্টিয়ানদের জন্ত গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অন্য



ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিও, তাহার্য্য কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তাহার্য্য সেই মন্দির এবং পারের ত সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। এই কারণেই জগতের পক্ষে এই শিকার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট জগৎকে এগনও এই পরধর্মে দেবরাহিত্য—শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের সহিত প্রবল সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নতোজে কথিত হইয়াছে,—

“ত্রয়ী সাংখ্যঃ যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি  
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।  
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ভুজুটিলনানাপঞ্চজুষাং  
মৃণামেকো গম্যন্তুর্মসি পয়সামর্গব ইব ॥”

অর্থাৎ “বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে কেহ একটাকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটাকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, এইরূপ রুচিতেদে সরলকুটিল নানাপঞ্চগামী জনগণের তুমিও তজপ একমাত্র গম্য।” ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতেছে বটে, কিন্তু সকলেই একস্থানে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে হে প্রভু, সকলেই তোমার নিকট আসিবে। তখনই তোমার ভক্তি এবং তোমার শিব সম্পূর্ণ, যখন তুমি শুধু তাঁহাকে কেবল যে শিবলিঙ্গে দেখিবে, তাহা নহে, সর্বত্র দেখিবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরির ভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি যথার্থ শিবের ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্বজীবে ও সর্বভূতে দেখিবে। “যে নামে, যেরূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বৃত্তিতে হইবে, সে তাহারই উপাসনা। কেবলার \* দিকে মুখ করিয়াই কেহ জাহ্নু অবনত করুক অথবা ত্রীষ্টয়

\* মহম্মদের জন্মভূমি মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ মক্কানগরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মস্জিদের মধ্যবর্তী আরতাকার ক্ষুদ্র মন্দিরবিশেষে যে বৃক্ষপ্রস্তর রক্ষিত আছে, তাহার নাম কেব্লা। কথিত আছে, দেবদূত গেব্রিয়েলের নিকট হইতে এই প্রস্তর খণ্ড পাওয়া যায়। মুসলমানেরা ইহাকে, অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যেখানেই থাকুন

গির্জায় বা বৌদ্ধ মন্দিরেই উপাসনা করুক, ক্ষাতভাবে বা অক্ষাতসারে সে তোমারই উপাসনা করিতেছে। যে কোন নামে যে কোন মূর্তির উদ্দেশে যে ভাবেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হউক না কেন, তাহা তোমারই পাদপদ্মে পৌঁছে, কারণ, তুমি সকলের একমাত্র প্রভু, সকল আত্মার অন্তরাত্মা স্বরূপ। জগতে কি অভাব, তাহা তিনি তোমা আমা অপেক্ষা অনেক ভালরূপ জানেন। সর্ববিধ ভেদ তিরোহিত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূল। জগতে অনন্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব সমূহ বিদ্যমান থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে পবনকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পরে বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অতএব সেই মূল সত্য আমাদের পুনরায় শিক্ষা করিতে হইবে, যাহা কেবল মাত্র এখান হইতে— আমাদের মাতৃভূমি হইতেই—প্রচারিত হইয়াছিল। আর একবার ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে। কেন আমি একথা বলিতেছি? কারণ এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। আমাদের জাতীয়সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা অনুরূপ হইয়া রহিয়াছে। এখানে—কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে আর চক্ষুগ্ৰাস্য ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না। এই ভাবে আমাদের জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। ভারত এতদপেক্ষাও অত্যন্ত উচ্চতর শিক্ষা দিতে সমর্থ বটে কিন্তু সেগুলি কেবল পণ্ডিতদের জন্য। এই শাস্ত্রভাব, এই তিতিক্ষা, এই পরদর্শ্যে দ্বৈষরাহিত্য, এই সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বাব রূপ মহান শিক্ষা আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বজাতি সর্ববর্ণ শিক্ষা করিতে পারে। “একং সৎবিপ্রা বহুধা বদন্তি।”

### কলঙ্ঘোর দেবমন্দিরে ।

পরদিন রবিবারেও অনেক ব্যক্তি স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামীজিও সকলকে মধুর উপদেশ দানে তৃপ্ত করিলেন। সন্ধ্যাকালে স্বামীজি স্থানীয় মন্দিরে দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। অগণ্য ব্যক্তি তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামাইয়া গোলাপ জল ও ইহার অভিমুখে ছিড়িয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

পুষ্পমালা দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া ফলোপহার দিতে লাগিল। স্বামীজির সম্মানার্থ স্থানীয় প্রথা অনুসারে তাঁহার ঘাইবার পথে প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহের দ্বারদেশেই, বিশেষতঃ কলম্বোর তামিল পল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত চেকু-ট্রাটের প্রত্যেক গৃহদ্বার আলোকমালা ও ফলরাশিতে সুশোভিত হইয়াছিল। মন্দিরে পৌঁছিবামাত্র সমাগত জনগণ ‘জয় মহাদেব’ ধ্বনি করিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ ও সমাগত জনগণের সহিত অল্পক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া স্বামীজি মন্দির হইতে নিজ বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিবার জন্ত তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের সহিত রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত বসিয়া ধর্মবিষয়ক আলোচনা করিলেন। সোমবার এখানে স্বামীজির আর একটি বক্তৃতা হয়।

### কাণ্ডি।

কলম্বো হইতে স্বামীজির জাহাজে করিয়া বরাবর মালদ্ভে ঘাইবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সিংহল এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সহর হইতে ভ্রমণে তার আসিতে লাগিল যে, আপনি একবার মাত্র পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। সকলের অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার পূর্ব অভিপ্রায় পরিবর্তন করিয়া স্থলপথে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ১৯শে মঙ্গলবার প্রাতে রেলযোগে কাণ্ডি যাত্রা করিলেন। কাণ্ডি সিংহলের প্রসিদ্ধ পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। কাণ্ডিনিবাসীরা দেবমন্দিরের চিত্রিত পতাকা লইয়া জয় ও বাদ্য ধ্বনি সহকারে স্বামীজিকে একটা বাঙ্গালায় লইয়া গিয়া এক মনোহর অভিনন্দন প্রদান করিলেন।

অভিনন্দনের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও সহরেব প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু দর্শনের পর স্বামীজি কাণ্ডি পরিত্যাগ করিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যাকালে মাতালে নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

### জাফনাভিমুখে — অনুরাধাপুর।

বুধবার প্রাতে স্বামীজি প্রায় দুইশত মাইল দূরবর্তী জাফনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথের উত্তরপার্শ্ব শতভারশ্রামলাঙ্গ হইয়া উজ্জ্বল শোভা ধারণে

স্বাক্ষিপণের নয়নানন্দ বর্ধন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে দাঙ্গুল নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল গিয়াই গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে পথে প্রায় তিনঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে গোধকট ঘোষে কানাহাড়ি ও তিনপানি হইয়া ধীরে ধীরে অম্বরাধাপুরে পৌঁছিলেন। অম্বরাধাপুর এক অতি প্রাচীন সহর। এখানে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বর্তমান। সেই সকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম সহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বর্তমান আছে। যথা বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একশাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বখবৃক্ষ, সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্য বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর, দাগোবা নামে বিখ্যাত প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভসমূহ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অম্বসন্ধান বলে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অম্বমান করেন যে, তামিলগণের দ্বারা সিংহল আক্রমণের পর হইতে এই সকল দাগোবার মধ্যে পূর্বকালীন বৌদ্ধগণের দ্বারা অধিকৃত রাশি রাশি মণি মুক্তা, হীরা, জহরৎ গুপ্তভাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

এই বৃক্ষতলে প্রায় দুই তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে স্বামীজি 'উপাসনা' সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। তিনি ইংরাজীতে বলিতে লাগিলেন আর দ্বিভাষিগণ তামিল ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে অসার পূজাধর্মের ত্যাগ করিয়া বেদের উপদেশাবলি কার্য্যে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্মের সার্বভৌমিকতা বুঝাইয়া দিয়া এই বৌদ্ধধর্ম-প্রধান স্থানে তিনি বলিলেন, ঈশ্বরকে শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ অথবা যে নামই লাও না, তিনি সেই একই। এই কারণেই অপরের ধর্মের প্রতি শুধু বিদ্বেষশূন্য হইলেই চলিবে না, উহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

### জাফনার পথে—ভাভোনিয়া ।

অম্বরাধাপুর হইতে জাফনা ১২০ মাইল দূরবর্তী। এদিকে পঞ্চও বেক্রপ কদর্য্য, অশ্বগুলিও তদ্রূপ, স্তূতরাং অতি কষ্টে বাইতে হইল। কেবল পথের অপূর্ব শোভায় এ কষ্ট তত গায়ে লাগিল না। যাহা হউক, পথে দুই সাক্ষি কাহারও নিভা হয় নাই। মধ্যে ভাভোনিয়া নামক স্থানের হিন্দুগণ স্বামী-

জিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিল। ইহারা স্বামীজির দর্শনে অত্যন্ত  
জট হইয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিয়াছিল—তাহারা  
অভ্যর্থনায় বলিল, স্বামীজির মধুর স্বভাব, উদার ভাব ও নিঃস্বার্থতা তাহা-  
দিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

### জাফনা ।

সংক্ষেপে ইহাদিগের অভিনন্দনের উত্তর দিয়া আবার সিংহলের শোভাময়  
জঙ্গলের মধ্য দিয়া জাফনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে  
সিংহল ও জাফনা দ্বীপের সংযোগসেতু ‘হস্তী গিরিবন্ধে’ স্বামীজিকে এক অভ্য-  
র্থনা প্রদত্ত হইল। জাফনা সহর হইতে ১২ মাইল অগ্রে উক্ত সহরের গণ্য  
মান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে  
গাড়ী করিয়া সকলেই স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। জাফনা সহরের  
প্রত্যেক রাস্তা, এমন কি, প্রতি গৃহ নানারূপে শোভিত হইয়াছিল। সায়ে-  
কালে যখন মশালের আলো জালিয়া স্বামীজিকে হিন্দুকলেজের প্রাঙ্গণে  
লইয়া যাওয়া হইল, তখন সেই দৃশ্য অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই স্থানে  
এক বৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করা হইল—সমবেত লোক-  
সংখ্যা ১০০০০ হইতে ১৫০০০ হইবে। এই অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ  
দেওয়া গেল :—

### শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

জাফনাসহরাধিবাসী আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্মের প্রধান কেন্দ্র-  
স্বরূপ এই স্থানে আপনাকে স্বাগত সন্তোষণ করিতেছি। লঙ্কাদ্বীপের এই  
অংশে পদার্পণ করিবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, আপনি  
তাহা অনুগ্রহ পূর্বক স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে  
আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন জাফনায় তাগিল রাজগণ  
রাজত্ব করিতেন। তাহারা উঁহাদের ধর্মের পোষকতা করিতেন। কিন্তু  
যখন তাহাদের রাজ্য গিয়া পর্তুগিজ ও ওলন্দাজের অধিকার হইল, তখন  
তাহারা ধর্মীয়ভাবে বাধা দিতে লাগিল, প্রকাশ্যে পূজাপাঠ বন্ধ করিয়া

Imp 4162 dl-15/9/09

RARE BOOK

মিল এবং পবিত্র মন্দির সমূহ, এমন কি, এখানকার যে দুইটা মন্দিরের ধ্বংস বহুদূরব্যাপী ছিল, সে গুলিও ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। ইহার ক্রমাগত বলপূর্বক আমাদের পূর্বপুরুষগণকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করিলেন না, তাহাই তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসে ধরিয়া রহিলেন। এই ধর্মই আমরা তাঁহাদিগের নিকট মহামূল্য দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সূশাসনে সেই ধর্মের পুনরায় উন্নতি হইতেছে, শুধু ইহাই নহে, যে সকল মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল, সেই গুলির কিছু কিছু পুনর্নির্মিত হইয়াছে, কতক কতক হইতেছে।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতের ব্রহ্মবিজ্ঞা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করিয়াছেন, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ জানাইয়াছেন, এবং তদ্বারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্যভূমির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের ধর্মের জ্ঞান আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জ্ঞান আমরা এই সুযোগে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আরও এই জড়বাদ-সর্বস্ব যুগে যখন সর্বত্রই শ্রদ্ধার হ্রাস ও আধ্যাত্মিক সত্যান্বেষণে লোকের অরুচি, এই যোর দুর্দিনে আপনি যে আমাদের প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জ্ঞান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জ্ঞানও আমাদের বহুতর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকে আমাদের ধর্মের উদারতা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্ত করিয়াছেন এবং তদ্বৈশী পণ্ডিতগণের অন্তরে এই সত্য দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন সকল বিষয় হিন্দুদিগের দর্শনে রহিয়াছে।\* এই সকল কারণে আমরা যে আপনার প্রতি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

যলাই বাহুল্য, আপনি যখন পাশ্চাত্যদেশে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন আমরা উৎসুক ভাবে আপনার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। আপনি যেরূপ সর্বাঙ্গতঃ করণে ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন এবং উহাতে সফলকামও হইতেছিলেন, তাহাতে আমরা অন্তরে অন্তরে পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম। পাশ্চাত্য দেশের যে সকল স্থান জ্ঞান ও ধর্ম চর্চায় সমুন্নত,

সেই সকল স্থানের সংবাদপত্র আপনার ও আপনার অমূল্য গ্রন্থরাশির যে গুণগান করিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, আপনার মহান্ ত্রুত কিরূপে উদ্‌ঘাপিত হইয়াছে ।

আমাদের দেশে অল্পগ্রহপূর্বক আপনি যে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যেমন বেদকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ মনে করেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। আশা করি, আমরা আপনাকে বহুবার এখানে দেখিতে পাইব ।

ঈশ্বর আপনার মহৎকার্য্যের সহায় হইয়া আপনাকে সফলকাম করিয়াছেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন স্বাস্থ্য ও বল দান করিয়া দীর্ঘকাল আপনাকে আপনার মহান্ ত্রুতসাধনে নিযুক্ত রাখেন ।

বশস্বদ

জাফনাবাসী সমগ্র তিন্মুগের পক্ষ হইতে ।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর দিলেন, তাহা অতিশয় মন্দস্পর্শী হইয়াছিল। পরদিন (রবিবার) সন্ধ্যাকালে উক্তস্থানেই স্বামীজি ‘বেদান্ত’ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা ।

বেদান্ত ।

বিষয় বৃহৎ কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত ; একটী বক্তৃতায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি যত সহজ ভাষায় পারি বর্ণনা করিব। যে হিন্দু নামে পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথা স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আরসার্থকতা নাই, কারণ, ঐ শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিদ্ধ নদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসিকদিগের উচ্চারণবৈকল্যে এই সিদ্ধ শব্দ হিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে ; তাঁহারা সিদ্ধনদের পরপারনিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন।

এইরূপে হিন্দুশব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে ; মুসলমান হিন্দু।

শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য এই শব্দ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখন ইহার আর সার্থকতা নাই ; কারণ, বর্তমান কালে সিদ্ধনদের পারবর্তী সকলে আর প্রাচীন কালের যত এক ধর্ম্ম মানেন না।

সুতরাং ঐ শব্দে শুধু হিন্দুমাত্র বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে । অতএব আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব না । তবে আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করিব ? আমরা বৈদিক শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয় । জগতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে । লোকের বিশ্বাস, এই গ্রন্থগুলি ঈশ্বর অথবা অস্ত্র কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষবিশেষের বাক্য সুতরাং ঐ গ্রন্থগুলিই তাহাদের ধর্মের ভিত্তি । পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদিগের বেদই প্রাচীনতম । অতএব বেদসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা আবশ্যক ।

বেদনামক শব্দরাশি পুরুষযুগ্মনিঃসৃত নহে । উহার সন তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই, কখনই নির্দিষ্ট হইতে পারে না । আর আমাদের ( হিন্দুদের ) মতে, বেদ অনাদি অনন্ত । একটা বিশেষ কথা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্ত্রাশ্রয় ধর্ম ঈশ্বর নামক ব্যক্তির অথবা ভগবানের দ্বারা বা প্রেরিত পুরুষের বাণী বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখায় ; হিন্দুরা বেদ ।

কিন্তু বলেন, বেদের অস্ত্র কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; কারণ, বেদ অনাদি অমন্ত, উহা ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি । বেদ কখনই লিখিত হয় নাই, উহা কখনই সৃষ্ট হয় নাই, অনন্ত কাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে । যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত । বেদ অর্থে এই ঐশ্বরিক জ্ঞানরাশি ( বিদ্যাদুর অর্থ জানা ) । বেদান্ত নামক জ্ঞানরাশি

ঋষি । ঋষিনামধেয় পুরুষসমূহের দ্বারা আবিষ্কৃত । ঋষির অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা,

তিনি পূর্বে হইতেই অবস্থিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাত্র, ঐ জ্ঞান ও ভাবরাশি তাঁহার নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে । যখনই তোমরা শুনিবে, বেদের অমুক অংশের ঋষি অমুক, তখন ভাবিও না যে, তিনি উহা লিখিয়াছেন অথবা নিজের মন হইতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি পূর্বে হইতেই অবস্থিত ভাবরাশির দ্রষ্টামাত্র, ঐ ভাবরাশি অনন্তকাল হইতেই এই জগতে বিদ্যমান ছিল । ঋষি উহা আবিষ্কার করিলেন মাত্র । ঋষিগণ আধ্যাত্মিক আবিষ্কর্তা ।

বেদনামক গ্রন্থরাশি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ বাগযজ্ঞের কথা আছে ; উহাদের মধ্যে



অধিকাংশই বর্তমান যুগের অল্পপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি এখনও কোন না কোন আকারে বর্তমান। কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি যথা সাধারণ মানবের বেদের দুই বিভাগ—কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদই সমগ্র হিন্দুধর্মের ভিত্তি স্বরূপ।

পর্যাস্ত অল্প বিস্তর অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞানকাণ্ড আমাদের ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশ—উহার নাম বেদান্ত—বেদের শেষ ভাগ—বেদের চরম লক্ষ্য। বেদজ্ঞানের এই সার ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ। আর ভারতের সকল সম্প্রদায়—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব—যে কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহারা উপনিষদ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণেই আমরা হিন্দু শব্দের পরিবর্তে বৈদান্তিক শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। ভারতের সকল প্রাচীনপন্থী দার্শনিককেই বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে আর আজকাল ভারতে হিন্দুধর্মের যত শাখাপ্রশাখা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে স্বতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, উহাদের উদ্দেশ্য যতই জটিল বোধ হউক না কেন, যিনি বেশ করিয়া উহাদের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উপনিষদ হইতেই উহাদের ভাবরাশি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল উপনিষদের ভাব আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, ষাঁহারা হিন্দুধর্মের খুব অমার্জিত শাখাবিশেষেরও রূপকত্ব আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, উপনিষদে রূপকভাবে বর্ণিত তত্ত্ব সেই রূপকের দৃষ্টান্ত বস্তুতে পরিণত হইয়া ঐ সকল ধর্মে স্থানলাভ করিয়াছে। উপনিষদেরই বড় বড় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের যত প্রকার পূজার যন্ত্র প্রতিমাদি আছে, সকলই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ, বেদান্তে ঐগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ঐ ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিণেবে যন্ত্র প্রতিমাদি-রূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেদান্তের পরই স্মৃতির প্রামাণ্য। ঐগুলিও ঋষিলিখিত গ্রন্থ, কিন্তু ঐগুলির প্রামাণ্য বেদান্তের অধীন। কারণ, অত্যাগত ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে তাহাদের শাস্ত্র বেরূপ, আমাদের পক্ষে স্মৃতিও তদ্রূপ। আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, বিশেষ বিশেষ ঋষিগণ এই সকল স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন ; এই অর্থে অত্যাগত ধর্মের শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য বেরূপ, স্মৃতির প্রামাণ্যও তদ্রূপ ;

তবে স্মৃতিই আমাদের চরম প্রমাণ নহে। স্মৃতির কোন অংশ স্মৃতি যুগে যুগে যদি বেদান্তের বিরোধী হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিভিন্ন।

উহার কোন প্রামাণ্য থাকিবে না। আবার এই সকল স্মৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন। আমরা শাস্ত্রে পাঠ করি, সত্যযুগে এই এই স্মৃতির প্রামাণ্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলিতে আবার অত্যাগত স্মৃতির প্রামাণ্য। দেশকালপাত্রের পরিবর্তন অনুসারে আচার প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে আর স্মৃতি প্রধানতঃ এই আচারের নিয়ামক বলিয়া সময়ে সময়ে উহাদেরও পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। আমি এই বিষয়টী তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলি। বেদান্তে ধর্মের যে মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয়। কেন ? কারণ, ঐগুলি মানব ও প্রকৃতিতে যে অপরিবর্তনীয় তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলির কখন পরিবর্তন হইতে পারে না। আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতির তত্ত্ব কখন পরিবর্তিত হইতে পারে না। সহস্র বৎসর পূর্বে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এখনও তাহাই আছে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু যে সকল ধর্মকার্য্য আমাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সেগুলিও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। সময়বিশেষে কোন বিশেষ বিধিই স্মৃতির সত্য ও ফলপ্রদ হইবে, অপর সময়ে নহে। স্মৃতির আমরা দেখিতে পাই, কোন সময়ে কোন খাদ্যবিশেষের বিধান রহিয়াছে, অল্প সময়ে তাহা আবার নিষিদ্ধ। সেই খাদ্য সেই সময়বিশেষের উপযোগী ছিল, কিন্তু ঋতু পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে উহা তৎকালের অনুপযোগী হওয়ায় স্মৃতি ঐ খাদ্য ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণে স্বভাবতঃই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, যদি বর্তমানকালে আমাদের সমাজের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে ; ঋষিরা আসিয়া কিরূপে ঐ সকল পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ধর্মের মূল সত্যগুলি এক বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইবে না, উহার সমভাবে থাকিবে।

তৎপরে পুরাণ। পুরাণ পঞ্চলক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব সকলের নানাবিধ রূপকের দ্বারা বিরতি প্রভৃতি নানা বিষয় আছে।

পুরাণ। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত, তাহা অতি প্রাচীন; পণ্ডিত-

দের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই ঐ সকল গ্রন্থের সময় নিরূপণে সক্ষম। পুরাণ তৎকালীন লোকের ভাষায় লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐগুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য, আর সাধারণ লোকে দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটাই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

তার পর তত্ত্ব। এইগুলি কতক কতক বিষয়ে প্রায় পুরাণের মত এবং

তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত প্রাচীন যাগ-তত্ত্ব।

যজ্ঞকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই সকলগুলিই হিন্দুদের শাস্ত্র। আর যে জাতিতে এত অধিক পারমাণে ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান এবং যে জাতি অগণ্য বর্ষ ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের চিন্তায় তাহার শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে এত অধিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অতি স্বাভাবিক। আরও সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কেন হইল না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন কোন বিষয়ে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিশয় বিভিন্নতা বিদ্যমান। সম্প্রদায় সকলের এই সকল খুঁটিনাটি বিভিন্নতা বুঝিবার এক্ষণে আমাদের সময় নাই। সুতরাং যে সকল মতে যে সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক, সম্প্রদায় সকলের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব। হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই এই মত যে, এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয়

নাই—একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগৎসৃষ্টি করিলেন, তার পর সৃষ্টিতত্ত্ব।

তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টিকারিণী শক্তি এখনও বর্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় বিষ্ণু বলিতেছেন,—

‘যদি হুং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্ত্রিতঃ ।

\* \* \* উপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥’

যদি আমি ক্ষণকাল কৰ্ম্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে ।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিব্যরাত্র কার্য্য করিতেছে, ইহা যদি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায় । এমন সময়ট ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি বিদ্যমান ছিল না, তবে অবশ্য যুগশেষে প্রলয় হইয়া থাকে । আমাদের সৃষ্টি ইংরাজী Creation নহে । Creation বলিতে বুঝায়—কিছুনা হইতে কিছু হওয়া, অসৎ হইতে সতের উদ্ভব । আমি এরূপ অসঙ্গত কথা বিশ্বাস করিতে বলিয়া তোমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অবমাননা করিতে চাহি না । এই প্রপঞ্চ পূৰ্বেও বিদ্যমান ছিল, প্রলয়ের সময় উহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে একেবারে অব্যক্তভাবে ধারণ করে । পরে কিছুকাল যেন বিশ্রামের পর আবার কে যেন উহাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় ; তখন পূৰ্বে ন্যায়ই সমবায়, পূৰ্বে ন্যায়ই ক্রমবিকাশ, পূৰ্বে ন্যায়ই প্রকাশ হইতে থাকে । কিছুকাল এইরূপ খেলা চলিয়া আবার ঐ খেলা ভাঙ্গিয়া যায়—ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, শেষে সমুদয় আবার লীন হইয়া যায় । আবার বাহির হইয়া আসে । অনন্তকাল এইরূপ তরঙ্গতুল্য গতিতে একবার সম্মুখে আর বার পশ্চাতে আসিতেছে । দেশ কাল এবং অন্যান্য সমুদয়ই এই প্রকৃতির অন্তর্গত । এই কারণেই সৃষ্টির আরম্ভ আছে বলা সম্পূর্ণ পাগলামি মাত্র । সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না । এই ‘হেতু যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই কোন যুগবিশেষের আদি অন্ত বুঝিতে হইবে ; উহার অন্য কোন অর্থ নাই ।

কে এই সৃষ্টি করিতেছেন ? ঈশ্বর । ইংরাজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে । সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত । তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণ স্বরূপ । ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? ব্রহ্ম—নিত্য, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যজাগ্রত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্বব্যাপী, নিরাকার, নিরংশ । তিনিই এই ঈশ্বর ।

জগৎ সৃষ্টি করেন । এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি এই ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও নিত্য বিধাতা হন, তাহা হইলে দুটি আপত্তি উপস্থিত হয় । জগতে ত যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে—এখানে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ; কেহ ধনী, কেহ

দরিদ্র। এরূপ বৈষম্য কেন হয়? আবার এখানে নিষ্ঠুরতাও বর্তমান। কারণ, এখানে একের জীবন অন্যের মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, প্রত্যেক মানবই নিজ ভ্রাতার গলা টিপবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই উৎপাত, এই দিবা রজনী গগনব্যাপী দীর্ঘ নিশ্বাস—ইহাই জগতের অবস্থা!—ইহাই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ঈশ্বর ধোরতর নিষ্ঠুর। মানুষ যত ঈশ্বরের বৈষম্য নিষ্ঠুর দানব কল্পনা করিয়া থাকুক না কেন, এই ঈশ্বর তাঁহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। বেদান্ত বলেন, ঈশ্বর এই বৈষম্য ও প্রতি-  
নৈষ্পাণ্য দোষ। যোগিতার কারণ নহেন। তবে কে ইহা করিল? আমরা নিজেরাই ইহা করিয়াছি। মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে উত্তমরূপে রুষ্টি, তাহাই উহাতে শস্তশালী হইল। যে ভূমি শুষ্ক নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারিল না। ইহা সেট মেঘের অপরাধ নহে। তাঁহার অনন্ত অপরিবর্তনীয় দয়া—আমরাই কেবল এই বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। কিরূপে আমরা এই বৈষম্য সৃষ্টি কবিলাম? কেহ জগতে সুখী হইয়া জন্মাইল, কেহ বা অসুখী। তাহারা ত এই বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই? করিয়াছে বৈ কি। তাহাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মের দ্বারা এই ভেদ—এই বৈষম্য হইয়াছে।

সুতরাং এক্ষণে আমরা সেই দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোচনায় আসিলাম—  
বাহাতে শুধু আমরা হিন্দুরা নহি—বৌদ্ধ ও জৈনগণও একমত। আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, সৃষ্টির ন্যায় জীবনও অনন্ত। শূন্য হইতে  
কর্মফল। যে জীবনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। তাহা হইতে পারে না। এইরূপ জীবনে কোন প্রয়োজনই নাই। কালে যাহার আরম্ভ, কালে তাহার অন্ত হইবে। গত কল্য যদি জীবনের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আগামী কল্য উহার শেষ হইবে—শেষে উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। অব-  
শ্যই জীবন পূর্ণেও বর্তমান ছিল। আজ কাল ইহা বড় বেশী বুঝাইবার আবশ্যক নাই, কারণ, আজকালকার সমুদয় বিজ্ঞান এই বিষয়ে আমা-  
দিগকে সাহায্য করিতেছে—আমাদের শাস্ত্রনিহিত তত্ত্বগুলি জড়জগতের ব্যাপারগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেছে। তোমরা সকলেই ইহা পূর্ব হইতেই অবগত আছ যে, আমাদের প্রত্যেকেই অনন্ত অতীতের কর্মসমষ্টির  
ফলস্বরূপ। কবিগণের বর্ণনামুযায়ী শিশু প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ প্রসূত হইয়া

আসে না, শিশুর স্বল্পে অনন্ত অতীতকালের কর্মসমষ্টি রহিয়াছে। ভালই হউক মন্দই হউক, সে নিজের অতীত কর্মের ফলভোগ করিতে আসে। আমরা জানি, এই কারণেই জন্ম হয়। ইহা হইতেই বৈষম্যের উৎপত্তি। ইহাই কর্মফল। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের গঠনকর্তা। এই মতবাদের দ্বারা অদৃষ্টবাদ খণ্ডিত হয় এবং ইহাই ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈঘর্ঘ্য দোষ নিরাকৃত করে। আমরা বাহ্য কিছু ভোগ করি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, অপর কেহ নহে। আমরাই কার্য ও আমরাই কারণ স্বরূপ। সুতরাং আমরা স্বাধীন। যদি আমি অসুখী হই, তবে বুঝিতে হইবে, আমিই আমাকে অসুখী করিয়াছি। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে সুখীও হইতে পারি। যদি আমি অপবিত্র হই, তবে তাহাও আমার নিজকৃত; তাহা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমি ইচ্ছা করিলে আবার পবিত্র হইতে পারি। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে বুঝিতে হইবে। মানবের ইচ্ছা কোন ঘটনাধীন নহে। ইহার সম্মুখে সকল শক্তি, এমন কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পর্যন্ত মাথা নোয়াইবে, উহার দাস হইয়া থাকিবে। তাহা হইলেই এই দাঁড়াইল যে, মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অনন্ত, প্রবল ও মহান।

এইবারে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসিবে, আত্মা কি। আত্মাকে না জানিলে আমাদের শাস্ত্রের ঈশ্বরকেও জানিতে পারি না। ভারতে ও ভারতের প্রদেশে বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা দ্বারা সেই সর্বাঙ্গীত সত্তার আত্মতত্ত্ব। আভাস পাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আমরা জানি, ইহার ফলও অতি শোচনীয় হইয়াছে। অতীত সত্তার আভাস পাওয়া দূরে থাক, আমরা যতই জড়জগতের আলোচনা করি, ততই অধিক জড়বাদী হইতে থাকি। যদিও একটু আধটু ধর্মভাব পূর্বে থাকিত, তাহাও জড়জগতের আলোচনা করিতে করিতে দূর হইয়া যায়। অতএব আধ্যাত্মিকতা ও সেই পরম পুরুষের জ্ঞান বাহ্য জগৎ হইতে পাওয়া যায় না, অন্তরমধ্যে, আত্মার মধ্যে উহার অন্বেষণ করিতে হইবে। বাহ্য জগৎ আমাদের কাছে সেই অনন্ত সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে না, অন্তর্জগতে অন্বেষণ করিলেই উহার সংবাদ পাওয়া যায়। অতএব কেবল আত্মতত্ত্বের অন্বেষণেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু কতক কতক বিষয়ে সকলের ঐক্য আছে :—তাহা এই,—জীবাত্মা

সকল অনাদি অনন্ত—তাহারা স্বরূপতঃ অবিনাশী। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক আত্মায় সর্ববিধ শক্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞতা রহিয়াছে। এই গুরুতর তত্ত্বটী সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় ভেদ নাই—কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার ও ঐ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে—স্বরূপতঃ তাহার সহিত আমার কোন ভেদ নাই, সে আমার ভ্রাতা, তাহারও যে আত্মা, আমারও তাহাই। ভারত এই মহতম তত্ত্ব জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সমগ্র মানবের ভ্রাতৃত্ব তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে—ভারতে উহা সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃত্ব এই আকার ধারণ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী, এমন কি, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ পর্য্যন্ত আমার ভাই—তাহারা আমার দেহস্বরূপ। ‘এবং তু পণ্ডিতৈশ্চাত্মা সর্বভূতময়ং হরিম্’ ইত্যাদি। এইরূপে পণ্ডিতগণ সেই প্রভুকে সর্বভূতময় জানিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে উপাসনা করেন। সেই কারণেই ভারতে ত্যাগজাতি ও দরিদ্রগণের প্রতি এত দয়ার ভাব বর্তমান; সকল বস্তু সম্বন্ধেই, সকল বিষয়েই ঐ দয়ার ভাব। আত্মায় সমুদয় শক্তি বর্তমান, এই মত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি।

স্বভাবতঃই এইবার আমাদের দীর্ঘরত্ন আলোচনার সময় আসিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বেই আত্মা সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। যাহারা ইংরাজী ভাষা চর্চা করেন, তাঁহারা অনেক সময় soul ও mind এই Soul কি আত্মা? দুইটী কথায় বড় গোলযোগে পড়িয়া যান। সংস্কৃত আত্মা ও ইংরাজী soul শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থবাচী। আমরা যাহাকে মন বলি, তাঁহারা তাহাকে soul বলেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ গত বিশ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে নাই। এখন যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে। আমাদের এই স্থূল শরীর রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে মন। কিন্তু মন আত্মা নহে। উহা সূক্ষ্ম শরীর—সূক্ষ্ম তন্মাত্রায় নির্মিত। উহাই জন্ম জন্মান্তরে বিভিন্ন শরীর আশ্রয় করে—কিন্তু উহার পশ্চাতে soul বা মানুষ্যের আত্মা রহিয়াছেন। এই আত্মা শব্দ soul বা mind শব্দের দ্বারা অনুদিত হইতে পারে না—সুতরাং আমাদের সঙ্কৃত আত্মা শব্দ অথবা আজকালকার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতামুযায়ী self শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। যে শব্দই আমরা ব্যবহার করি না কেন, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মা—মন ও স্থূলশরীর উভয় হই-

তেই পৃথক্। আর এই আত্মাই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে সঙ্গে লইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। যখন ইহা সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ হয়, তখনই ইহার আর জন্মমৃত্যু হয় না। তখন ইহা স্বাধীন হইয়া যায়,—ইচ্ছা করিলে এই মন বা সূক্ষ্ম শরীরকে রাখিতেও পারে অথবা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত কালের জ্ঞান স্বাধীন ও মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য। ইহাই আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব। আমাদের ধর্মেরও স্বর্গ নরক আছে, কিন্তু উহারা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ নরকের স্বরূপ বিচার করিলেই সহজেই প্রতীত হয় যে, উহারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এই মর্ত্যালোকেই পুনরাবর্তিত হইবে—

একটু না হয় বেশী সুখ, একটু না হয় বেশী ভোগ। তাহাতে বরং স্বর্গ।

আরও খারাপই হইবে। এইরূপ স্বর্গ অনেক। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ইহলোকে কোন সংকল্প করে, তাহারা মৃত্যুর পর এইরূপ কোন স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই দেবত্ব বিশেষ বিশেষ পদমাত্র। এই দেবতারও এক সময়ে মামুষ ছিলেন; সংকল্পবশে ইহাদের দেবত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইন্দ্রবরুণাদি নাম কোন দেববিশেষের নহে। সহস্র সহস্র ইন্দ্র হইবেন। রাজা নহষ মৃত্যুর পর ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রত্ব পদমাত্র। কোন ব্যক্তি সংকল্পের ফলে উন্নত হইয়া ইন্দ্রত্বলাভ করিলেন, কিছুদিন সেই পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন আবার সেই দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেন। মনুষ্যজন্ম আবার সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। কোন কোন দেবতা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যেমন এই জগতের অধিকাংশ লোক ধনমান ঐশ্বর্য্য হইলে উচ্চ তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, সেইরূপ অধিকাংশ দেবতাই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মুক্তির চেষ্টা আর করেন না। তাঁহাদের গুণ কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে তাঁহারা এই পৃথিবীতে পুনরায় আসিয়া মনুষ্য রূপ ধারণ করেন। অতএব এই পৃথিবীই কর্ম্মভূমি; এই পৃথিবী হইতেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। সুতরাং এই সকল স্বর্গ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে কোন্ বস্তু লাভের জন্ত আমাদের চেষ্টা করা উচিত?

মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র বলেন, শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেরও ভূমি প্রকৃতির মুক্তিই আমা-  
দের লক্ষ্য। দাসমাত্র। বিশ হাজার বৎসর ভূমি রাজত্ব ভোগ করিলে—

তাহাতে কি হইল? যতদিন তোমার শরীর থাকে, ততদিন তুমি সুখের দাসমাত্র। যতদিন দেশকাল তোমার উপর কার্য্য করিতেছে,



শতদিন তুমি ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণেই আমাদেরকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কেই জয় করিতে হইবে। প্রকৃতি ঘেন তোমার পক্ষতলে থাকে—প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া তোমাকে তাহার বাহিরে গিয়া স্বাধীন মুক্তভাবে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তখন তুমি জন্মের অতীত হইলে—সুতরাং তুমি মৃত্যুরও পারে যাইলে। তখন তোমার সুখ চলিয়া গেল—সুতরাং তুমি তখন দুঃখেরও অতীত হইলে। তখনই তুমি সর্বাভীত অব্যক্ত অধিনাশী আনন্দের অধিকারী হইলে। আমরা যাহাকে এখানে সুখ ও কল্যাণ বলি, তাহা সেই অনন্ত আনন্দের এক কণামাত্র। ঐ অনন্ত আনন্দই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা তেমনি লিপ্সবর্জিত। আত্মাতে নরনারী ভেদ নাই। দেহসম্বন্ধেই নরনারী ভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রীপুং-ভেদারোপ ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে আত্মা লিপ্স ও বয়োবর্জিত। কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

কিরূপে এই আত্মা বদ্ধ হইলেন? আমাদের শাস্ত্র ঐ প্রশ্নের একমাত্র বন্ধন ও উত্তর দিয়া থাকেন। অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা মুক্তি। অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জানোদয়েই উহার নাশ হইবে, আমাদেরকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্বভূতকে ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরে পরমাত্মরক্তিবলে জ্ঞান উদয় হইবে—অজ্ঞান দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও আত্মা মুক্তিলভ্য করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের দ্বিবিধ স্বরূপের বিষয়

উল্লিখিত হইয়াছে—সগুণ ও নিগুণ। সগুণ ঈশ্বর অর্থে সর্ব-সগুণ ও ব্যাপী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা—জগতের অনাদি জনক জননী। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্যভেদ। মুক্তি অর্থে তাঁহার সামীপ্য ও সাযুজ্যপ্রাপ্তি। নিগুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় তাঁহার প্রতি সচরাচর প্রযুক্ত সর্বপ্রকার বিশেষণ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই নিগুণ সর্বব্যাপী পুরুষকে জ্ঞানবান বলা যাইতে পারে না—কারণ, জ্ঞান মনের ধর্ম। তাঁহাকে চিন্তাশীল বলা যাইতে পারে না। কারণ, চিন্তা সসীম জীবের জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। তাঁহাকে বিচারপরায়ণ বলা

যাইতে পারে না, কারণ, বিচারও সসীমতার—দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে না, কারণ, বদ্ধ ভিন্ন মুক্ত পুরুষের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার আবার বন্ধন কি? প্রয়োজন ভিন্ন কেহই কোন কার্য্য করে না। তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? বেদে তাঁহার প্রতি পুংলিঙ্গ প্রযুক্ত হয় নাই। ‘সঃ’ শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট না হইয়া নিগুণ ভাব বুঝাইবার জন্ত ‘তদ্’ শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই নিগুণ পুরুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? তাঁহার সহিত আমরা অতিরিক্ত। আমরা প্রত্যেকেই সেই সর্বপ্রাণীর মূল কারণ স্বরূপ নিগুণ পুরুষের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যখনই আমরা এই অনন্ত নিগুণ পুরুষ হইতে আমাদের পৃথক্ ভাবি, তখনই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি আর তাঁহার সহিত আমাদের অভেদ জানেই মুক্তি। সংক্ষেপতঃ আমাদের শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের এই দ্বিবিধ ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাই। এখানে ইহা বলা আবশ্যক

অদ্বৈতবাদই যে, নিগুণ ব্রহ্মবাদই সর্বপ্রকার নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতি নীতিবিজ্ঞান প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত নের ভিত্তি। হইয়াছে—মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য ভাল বাসিবে। ভারতবর্ষে আবার মনুষ্য ও ইতর জাতিতে কোন প্রভেদ করা হয় নাই, প্রাণী নির্লিংশেষে সকলকেই আত্মতুল্য গ্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিবর্গকে আত্মতুল্য ভাল বাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। নিগুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে এক মাত্র সমর্থ। যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ড স্বরূপ জানিলে, তখনই তুমি জানিতে পারিলে, অপরকে ভাল বাসিলে নিজেই ভাল বাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। অদ্বৈতবাদের কথা বলিতে গিয়া আরো অনেক কথা আসিয়া পুড়ে। সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ণ প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ে চাই বীৰ্য্য। ভক্তিবলে মানুষের যে বিবিধ শক্তির বিকাশ হয়, তাহা উপায় অদ্বৈত- আমি জানি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাহাবার বাদ। সময় নাই—এখন কিছু বীৰ্য্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই

নিগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কারবিবর্জিত হইয়া আমিই সেই নিগুণ ব্রহ্ম এই জ্ঞান সহায়ে নিঃস্বপ্ন পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ণ শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না। ভয়? কার ভয়? আমি

প্রকৃতির নিয়ম পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করি না। মৃত্যু আমার নিকট উপহাসের বস্তুমাত্র। মানুষ তখন নিজ আত্মার মহিমায় অবস্থিত হয়, যে আত্মা অনাদি অনন্ত ও অবিনাশী, যাঁহাকে কোন বস্তু ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যিনি অনন্ত, জন্মরহিত, মৃত্যুশূন্য, যাঁহার মহিমার সম্মুখে সূর্য্য, চন্দ্র সমূহ—এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সিন্ধুতে বিলুপ্ত প্রতীয়মান হয়, যাঁহার মহিমার সম্মুখে দেশকালের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। আমরাদিগকে এই মহিমাময় আত্মার প্রতি বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে। তবেই বীৰ্য্য আসিবে। তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব, তবে তুমি দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধ হইবে। অদ্বৈতবাদ আমরাদিগকে আপনাকে দুর্বল ভাবিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু আপনাকে তেজস্বী, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ ভাবিতে উপদেশ দেয়। আমার ভিতর ঐ ভাব এখনও প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহা আমার ভিতরে রহিয়াছে। আমার মধ্যে সকল জ্ঞান, সকল শক্তি, পূর্ণ পবিত্রতা ও স্বাধীনতার ভাব রহিয়াছে। তবে আমি ঐগুলি জীবনে প্রকাশিত করিতে পারি না কেন? কারণ, আমরা উহাতে বিশ্বাস করি না। যদি আমি এখনই উহাতে বিশ্বাসী হই, তবেই উহার প্রকাশ হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। অদ্বৈতবাদ ইহাই শিক্ষা দেয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ অস্থিচরিত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক; সাহসী, সর্বজয়ী, সর্বসংসহ হউক। এই সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে আত্মার মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা বেদান্তই—কেবল বেদান্তেই পাইবে। উহাতে অজ্ঞাত ধর্মের মত ভক্তি, উপাসম প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু আমি যে ভাবের কথা বলিতেছি, তাহাই জীবন ও শক্তিপ্রদ ও অতি অপূর্ণ। বেদান্তেই কেবল সেই মহানুভব নিহিত, যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

আমি তোমাদের নিকট আমাদের ধর্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব সকল বলিলাম। ঐ গুলি কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে

স্মটিকতক কথা বলিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে যে কারণ সকল বর্তমান, তাহাতে এখানে অনেক সম্প্রদায় থাকিবারই কথা। কার্য্যতঃও দেখিতেছি, এখানে অনেক সম্প্রদায়। আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এখানে দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করে না।

শৈব এ কথা বলে না যে, বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, ইষ্টনিষ্ঠা।

অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে এ কথা বলে না। শৈব বলে, আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমিও তোমার পথে চল ; পরিণামে আমরা একস্থানে পৌঁছিব। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা-কেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ কথা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন প্রণালীর প্রয়োজন। তুমি যে প্রণালীতে ঈশ্বর লাভ করিবে, সে প্রণালী হয়ত আমার খাটবেনা, হয়ত তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে। সকলকেই এক পথে যাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যদি কখন পৃথিবীর সর্বলোক এক ধর্ম-মতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। বতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিনই আমরা বর্তমান থাকিব। তবে ভেদ আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই। তোমার পক্ষে তোমার পথ ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। আমার পক্ষে আমার পথ ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে নহে। প্রত্যেকের ইষ্ট বিভিন্ন, এ কথায় এই বুঝায় যে, প্রত্যেকের পথ বিভিন্ন। এটা মনে রাখিও, জগতের কোন ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিবাদ নাই। আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন ইষ্টদেবতা। কিন্তু যখন দেখি, লোকে আসিয়া আমাদের নিকট বলিতেছে, ইহাই একমাত্র পথ এবং ভারতের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক দেশ জোর করিয়া আমাদেরকে ঐ মতাবলম্বী করিতে চায়, তখন আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকি। বাহ্যার ঈশ্বরলাভোদ্দেশে বিভিন্নপথাবলম্বী ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন করিতে

ইচ্ছুক, তাহাদের মুখে প্রেমের কথা বড়ই অসঙ্গত ও অশোভন। তাহাদের প্রেমের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অপরে অল্প পথের অনুসরণ করিতেছে যে ইহা সহ্য করিতে পারে না, সে আবার প্রেমের কথা বলে! যদি ইহাই প্রেম হয়, তবে আর ঘেঁষ কি? খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদ—জগতের যে কোন অবতারেরই উপাসনা করুক না, কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত আমাদের বিবাদ নাই। হিন্দু বলেন, ‘এস ভাই, তোমার যে সাহায্য আবশ্যক, তাহা আমি করিতেছি; কিন্তু আমি আমার পথে চলিব, তাহাতে কিছু বাধা দিও না। আমি আমার ইষ্টের উপাসনা করিব। তোমার পথ খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে হয় ত তাহাতে ঘোবতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন খাদ্য আমার শরীরের উপযোগী, তাহা আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝিতে পারি, কোটি কোটি ডাক্তার সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। এইরূপ কোন পথ আমার উপযোগী হইবে, তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি ঠিক বুঝিতে পারি। ইহাই ইষ্টনিষ্ঠা। এই কারণেই আমরা বলিয়া থাকি যে, যদি কোন মন্দিরে গিয়া অথবা কোন যন্ত্র বা প্রতিমার সাহায্যে তুমি তোমার আত্মায় অবস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পার, বেশ ত। ত্রুশো প্রতিমা গড় না কেন। যদি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার ঈশ্বর উপলব্ধির সাহায্য হয়, তবে শীঘ্র ঐ সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন কর। যে কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর, যে কোন মন্দিরে যাইলে তোমার ঈশ্বর লাভের সহায়তা হয়, তাহাতেই গিয়া উপাসনা কর। কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর পথ হইতে দ্রষ্ট হইয়াছ। তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশুপদবীতে উপনীত হইতেছ।

আমাদের ধর্ম কাহাকেও বাদ দিতে চায় না, উহা সকলকেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে চায়। আমাদের জাতিভেদ ও অগাঢ় নিয়মাবলি ধর্মের সহিত সংস্কৃষ্ট আপাততঃ বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা সমাজসংস্কার।

নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল নিয়মের আবশ্যক ছিল। যখন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই এই প্রাচীন প্রথাগুলি আমার ভাল বলিয়াই

বোধ হইতেছে। এক সময়ে আমি ঐগুলির অধিকাংশই অনাবশ্যক ও বৃথা মনে করিতাম। কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই আমি ঐগুলির কোনটার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কারণ শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে ঐগুলি গঠিত হইয়াছে। কালকের শিশু, যে কালই হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে যদি আসিয়া আমাকে আমার অনেক দিনের সংকল্পিত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিতে বলে, এবং আমি যদি সেই শিশুর কথা শুনিয়া তাহার মতামতসারে আমার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করি, তবে আমিই আহান্যক হইলাম, অপর কেহ নহে। ভারতের নানা দেশ হইতে আমরা সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইতেছি, তাহারও অধিকাংশ ঐ ধরণের। তাহাদিগকে বল, তোমরা যখন একটা স্থায়ী সমাজ গঠন করিত পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দুদিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উঠা ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পতঙ্গের গায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বৃদ্ধদের গায় তোমাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধদের গায় লয়। অগ্রে আমাদের গায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা বালক মাত্র।

আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইয়াছে। আমি এক্ষণে বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কলিযুগে ধর্ম কয়েকটা কথা তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদ-দানই শ্রেষ্ঠ ব্যাসের জয় হউক, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাথন। মাত্র ধর্ম। অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্বী ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তার পর বিদ্যাদান, তার পর প্রাণদান। অন্ন বস্ত্র দান সর্ব নিকৃষ্ট দান। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমন কি, প্রাণদান পর্যন্ত তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব তোমাদের এইটুকু জানা উচিত যে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান হইতে অন্যান্য সর্ব কর্ম

নিকট। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়। আমাদের শত্রু আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ। আর এই ত্যাগের দেশ ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথায় এইরূপ ধর্মের অপ-রোক্ষাগ্নুভূতির দৃষ্টান্ত পাইবে? জগৎ সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমার বিশ্বাস কর, অন্যান্য দেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানেই, কেবল এখানেই এমন লোক পাওয়া যায়, যে ধর্ম জীবনে পরিণত করিয়াছে। শুধু ধর্মের লম্বা চোড়া কথা বলিলেই ধর্ম হয় না, তোতা পাখীও লম্বা লম্বা কথা হয়, আজকাল কলেও কথা কয়, কিন্তু এমন জীবন দেখাও দেখি, বাহাতে ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতা, তিতিক্ষা ও অনন্ত-প্রেম বিদ্যমান। এই সকল গুণ থাকিলেই তুমি ধার্মিক পুরুষ হইলে। যখন আমাদের শাস্ত্রে এই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব রহিয়াছে এবং এমন মহৎ জীবন সকল উদাহরণ স্বরূপ রহিয়াছেন, তখন যদি আমাদের যোগিশ্রেষ্ঠগণের জন্ম ও মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তারত্নগুলি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সম্পত্তি না হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ সকল তত্ত্ব আবার সুধু ভারতেই প্রচার করিতে হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতে উহা ছড়াইতে হইবে। ইহাই আমাদের এক শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর যতই তুমি অপরকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, ততই তুমি দেখিবে, তুমি নিজের কল্যাণ বিধান করিতেছ। যদি তোমরা যথার্থই তোমাদের ধর্ম ভালবাস, তবে তোমাদিগকে সর্বসাধারণের চুকোঁধ্য শাস্ত্র হইতে এই সকল রত্নরাশি লইয়া তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণকে দান রূপ মহাব্রত সাধনে প্রাণপণ করিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদের একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হায়, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষ্যাবিষে জর্জরিত হইতেছি! আমরা সর্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি। অমুক আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন হইল—আমি কেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম না—অহংহ আমার এই চিন্তা। এমন কি, ধর্মকর্মেরও আমরা এই শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষী—আমরা এমন ঈর্ষ্যার দাস হইয়াছি! ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোন প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা এই ঈর্ষ্যাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই তুমি প্রভু হইতে পারিবে।

প্রাচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে ।  
ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিত্যাগ কর, তবেই তুমি এখনও যে সব বড় বড় কাষ পড়িয়া  
রাহিয়াছে, তাহা করিতে পারিবে । আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অদ্ভুত অদ্ভুত  
কর্ষ করিয়াছিলেন—আমরা ভক্তি ও স্পর্দ্ধার সহিত তাঁহাদের কার্য্যকলাপের  
আলোচনা করিয়া থাকি । কিন্তু এক্ষণে আমাদের কার্য্য করিবার সময়—  
আমাদের পরবংশীয়েরা যেন আশীর্বাদ ও গৌরব সহকারে আমাদের কার্য্য-  
কলাপের আলোচনা করে । আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যতই শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত  
হউন না কেন, প্রভুর আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকেই এমন কার্য্য সকল করিব  
যে, তাহাতে তাঁহাদেরও গৌরবরবি ম্লান করিয়া দিবে ।





## ভারত ।

### মালদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ।

সিংহলে স্বামীজির অভ্যর্থনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কলম্বো হইতে জাফনা পর্য্যন্ত লোকে একবাক্যে উৎসাহসহকারে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সিংহলদেশে পূর্বে কেহই স্বামীজিকে জানিত না, উক্তদেশে তাঁহার জন্মও নহে, তার পর বড় বড় সহর হইতে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের এমন সুবিধা নাই, যাহাতে স্বামীজির আগমনবার্তা সর্বসাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং তাঁহার এই অভ্যর্থনা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই অল্প কয়েকদিনেই লোকের মনের উপর স্বামীজি এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দ যাইয়া কিছুদিনের জন্য এখানে কার্য্য করেন। এক্ষণে সিংহলে একটী বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

জাফনায় স্বামীজির বক্তৃতা হইয়া গেলে পর স্বামীজি ভারতে বাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জাফনা হইতে জলপথে ভারতবর্ষ ৫০ মাইল দূরবর্তী। একখানি দেশী জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল। রাত্রি বারটার কিছু পরেই স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণ রওনা হইলেন। বায়ু অমুকূল থাকতে বড়ই আনন্দের সহিত সকলে ভারতাবিমুখে বাইতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পাঙ্গানে জাহাজ পঁহছিল, অপরাহ্নে একখানি নৌকা করিয়া স্বামীজি তীরে অবতরণ করিলেন। জেটিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাদের রাজা স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। জেটির নিম্নেই এক চন্দ্রাতপ নানাবিধ পুষ্পগন্ধে অতি সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই চন্দ্রাতপের নিম্নে পাঙ্গানবাসীর পক্ষ হইতে নাগলিঙ্গম্ পিলে মহাশয় এক অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অভিনন্দনে তাঁহার স্বামীজিকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সফল ফলিয়াছে, এক্ষণে এই নিদ্রিত ভারতকে তাহার বহুদিনের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অমুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ভিয়া পড়িয়া লাগুন। রামনাদের রাজাও

ছদ্মের আবেগের সহিত স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করিলেন ।  
স্বামীজি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন ।

### পাশ্চাত্য অভিনন্দনের উত্তর ।

আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতেই ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি । এখানেই বড় বড় ধর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এখানেই, কেবল এখানেই ত্যাগধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । এখানেই, কেবল এখানেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মনুষ্যের সমুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ স্থাপিত হইয়াছে ।

আমি পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি—অনেক দেশ পর্যটন করিয়াছি—অনেক জাতি দেখিয়াছি । আমার বোঝ হয়, প্রত্যেক জাতিরই এক একটা মুখ্য আদর্শ আছে । সেই আদর্শই যেন তাহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ । রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে, ধর্মই, কেবল ধর্মই যথার্থ ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ । ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল ।

শারীরিক শক্তিবলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে সত্য, বুদ্ধিবলে বিজ্ঞান সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া তাহা দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য দেখান যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ প্রভাব, এগুলির প্রভাব তাহার তুলনায় কিছুই নহে ।

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় ভারত দেশেই ক্রীষ্টধর্মের আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি—হিন্দু বা হীনবর্ষা ও নিরক্ষর—যে সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাইয়া যায়, তাহাদের নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি । কিন্তু তাহাদের শিক্ষায় এই ফল ফলিয়াছে যে, অন্তান্ত দেশের লোকের নিকট ‘হিন্দু বা হীনবর্ষা ও নিরক্ষর’ ইহা একটা কিস্তদন্তী স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে । ভারত যে কোন কালে নিষ্ক্রিয় ছিল, এ কথা আমি কোন মতেই স্বীকার করি না । আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেরূপ কর্মপরায়ণ, অতঃ কোন স্থানই সেরূপ নহে । তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে । আর ইহার মহামহিমাময় জীবনের প্রতি সাক্ষিতে ইহা যেন অবিনাশী অক্ষয় নব যৌবন লাভ করিতেছে । ভারতে কর্মপরায়ণতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু অপরের উহাতে লক্ষ্য না পড়িবার কারণ এই,—মনুষ্য প্রকৃতিই এই

যে, যে যে কার্য্য করে বা ভাল বোঝে, সে সেটাকেই জগতের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বলে। মুচি জুতো খেলাইই বুঝে, মিস্ত্রি পাঁথনিই বুঝে—জগতে যে আর কিছু করিবার বা বুঝিবার আছে, তাহা তাহাদের বুঝিবার অবসর হয় না। যখন আলোকের পরমাণুর স্পন্দন অতি তীব্র হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না, কারণ আমাদের দর্শনশক্তির একটা সীমা আছে—তাহার বাহিরে আর আমরা দেখিতে পাইব না। যোগী কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে সাধারণ অজ্ঞ লোকের জড়দৃষ্টি ভেদ করিয়া তিতরের জিনিষ দেখিতে সমর্থ হন।

একণে সমগ্র জগৎ আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞান ভারতভূমির দিকে তাকাইয়া আছে। ভারতকে জগতের সকল জাতির কল্যাণ সাধনের জ্ঞান কার্য্য করিতে হইবে। এখানেই মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সকল বিদ্যমান। পাশ্চাত্য মুখমণ্ডলী একণে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে নিবদ্ধ ভারতবাসীর সনাতন বিশেষত্ব-পরিচায়ক এই আদর্শকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন ধর্ম্ম-প্রচারকই ভারতের বাহিরে হিন্দু মত প্রচারে গমন করেন নাই। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘যখনই ধর্ম্মের প্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি জগতের কল্যাণের জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকি’। ধর্ম্মোতিহাস গবেষণায় স্ফূর্তিত হইয়াছে যে, যে কোন জাতির ভিতর উত্তম নীতি শাস্ত্র প্রচলিত, তাহারাই উহার কতক অংশ আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে আর যে সকল ধর্ম্মে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট, তাহারাইও মুখ্য বা গোণ ভাবে উহা আমাদের নিকট গ্রহণ করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্কলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, দম্ব্যতা, জুলুম প্রভৃতি হইতেছে, জগতের ইতিহাসে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সকলেই জানেন, বাসনা জয় না করিলে মুক্তি নাই। যে প্রকৃতির দাস, সে কখন মুক্ত হইতে পারে না। জগতের সমগ্র জাতিই একণে এই মহাসত্য বুঝিয়া উহার আদর করিতে শিখিতেছে। যখনই শিষ্য এই সত্য ধারণার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহার উপর গুরুর কৃপা হয়। ভগবান্ অনন্ত কাল ধরিয়া সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি অনন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের জ্ঞান সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের প্রভু সকল

ধর্ম্মেরই ঈশ্বর। এই উদার ভাব কেবল ভারতেই বর্তমান। জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ উদার ভাব দেখাও দেখি।

বিধির বিধানে আমরা হিন্দুগণ বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিসকল আমাদের নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তার জন্য আসিতেছে। সমগ্র ভারতসম্প্রদায়ের এক্ষণে কর্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ত্রায়তঃ বাধ্য। একটী বিষয় আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি। অন্যান্য দেশের ভাল ভাল ও বড় লোকেরা কোন দস্যু ব্যারণ হইতে তাঁহাদের বংশাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ বাহির করিতে পারিলে বড়ই প্রীতি অনুভব করেন। এই সকল ব্যারণ পার্শ্বত্যাগে বাস করিত, সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পথিকদিগের সর্বস্ব লুটপাট করিত। এইরূপ দস্যু ব্যারণের সম্ভাবনা বলিয়া পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য দেশের বড় লোকদিগের বড় গৌরবের বিষয়। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আমাদের পক্ষপাতকে পরিত্যাগ-নিবাসী, ফলমূল্যাহারী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ঋষিমুনির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করি। আমরা এক্ষণে অবনত ও হীন হইয়াছি বটে কিন্তু যদি আমরা আমাদের ধর্ম্মের জন্য আবার প্রাণ পণ করি, তবে আমরা আবার মহৎপদবীতে উন্নীত হইতে পারি।

আপনারা আমাকে যে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার প্রতি যে কি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। যদি আমার দ্বারা কিছু সংকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যেকটীর জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী, কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদ্ভূত হয়, তিনি আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। তিনি এক্ষণে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরো অধিক কার্য্যের আশা করিতেছেন। যদি ইহার ন্যায় আরো কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

স্বামীজির উত্তর শেষ হইলে তিনি একখানি গাড়ীতে চড়িয়া রাজার বাঙ্গালাভিমুখে চলিলেন। রাজার অতিপ্রায়ানুসারে গাড়ীর ঘোঁড়া খুলিয়া লওয়া হইল—সকলে মিলিয়া, এমন কি, রাজা পর্যন্ত সেই শকট সেই ক্ষুদ্র সহরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিন দিন স্বামীজি এখানে বড়ই আনন্দে কাটাইলেন। পাশ্চাত্য ও তন্নিকটবর্তী রামেশ্বরের অনেক অধিবাসী এই সময়ে আসিয়া স্বামীজির দর্শন লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিল। একদিন স্বামীজি রামেশ্বর মন্দির দর্শনার্থে গমন করিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে স্বামীজি এখানে পদব্রজে আসিয়াছিলেন—তখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না। বাহা হউক, স্বামীজির পাড়ী যখন মন্দির সন্নিধানে পৌঁছিল, তখন এক বৃহৎ জনতা হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, মন্দিরের চিহ্নিত পতাকা, দেগী সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্মানের চিহ্ন লইয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামীজি সমস্ত মন্দিরটী বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন—তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য্য সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনীটীও স্বামীজি দেখিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সমবেত লোকগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে বলা হইল। স্বামীজি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। নাগলিঙ্গম্ মহাশয় তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিলেন।

### রামেশ্বর মন্দিরে বক্তৃতা ।

ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমই ধর্ম্ম। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিব পূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনে। আর যাহারা অশুদ্ধব্রতাব হইয়াও অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র—মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকিলে বাহ্য পূজায় কোন ফল লাভ হয় না। এই কলিযুগে লোকে এত হীনস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা মনে করে, অতি সহজেই ধর্ম্মলাভ হয়। তাহারা মনে করে, তীর্থস্থানে গমন করিবামাত্র তাহাদের পাপ ক্ষান্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি কেহ অপবিত্র ভাবে কোন তীর্থে গমন করে, তবে সেখানে অপরাপর ব্যক্তির যত পাপ সব তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে আরও গুরুতর পাপের বোকা লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। তীর্থে সাধুগণ বাস করেন, তথায় অত্যান্য পবিত্র ভাবোদ্দীপক বস্তুসমূহও থাকে। কিন্তু যদি কোন স্থানে কেবল কতকগুলি সাধু ব্যক্তি বাস করেন অথচ সেখানে যদি একটীও মন্দির না থাকে, তাহাকেই তীর্থ বলিতে হইবে। যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, অথচ যদি তথায় অনেক অসাধু লোক বাস করে, তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না। আবার তীর্থে বাস করাও বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ, অন্য স্থানের পাপ তীর্থে ধুও, কিন্তু তীর্থের পাপ কিছুতেই ধুও না। সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই ষথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম নির্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় হন।

কোন ধনী ব্যক্তির এক বাগান ছিল—তাহার দুই মালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন খুব অলস, সে কোন কাষ করিত না; কিন্তু তাহার প্রভু আসিবা মাত্র করঘোড়ে ‘প্রভুর কিবা রূপ—কিবা গুণ’ বলিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত। অপর মালিটী বেশী কথা জানিত না—সে খুব পরিশ্রম করিয়া প্রভুর বাগানে সকল প্রকার ফল ও শাকসবজি উৎপন্ন করিত ও সেই গুলি মাথায় করিয়া অনেক দূরে তাহার প্রভুর বাটীতে লইয়া যাইত। বল দেখি, এই দুই জন মালীর ভিতরে প্রভু সর্কাপেক্ষা কাহাকে অধিক ভাল বাসিবেন? এইরূপ শিব আমাদের সকলের প্রভু, জগৎ তাঁহার উদ্যান-স্বরূপ আর এখানে দুই প্রকার মালী আছে। এক প্রকার মালীরা অলস, কপট, কিছুই করিবে না, কেবল শিবের রূপ—তাঁহার চোক নাক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করিবে; আর এক প্রকার লোক আছেন, যাঁহারা শিবের দরিদ্র, দুর্বল সম্মানগণের জন্য তাঁহার স্বেচ্ছা সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন। এই দ্বিবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে শিবের সর্কাপেক্ষা প্রিয় কে হইবে? নিশ্চয়ই যিনি শিবের সম্মানগণের সেবা করেন।

যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্ভানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সম্ভানগণের সেবা সৰ্ব্বাগ্রে করিতে হইবে—অগ্রে জগতের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস। অতএব এইটী সৰ্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি, তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে, এবং যে কেহ তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম্ম। এই সংকল্প বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয় দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে। সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা। যে মনে করে, আমি আগে থাইব, আমি অপরাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব, আমি সৰ্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইব, যে মনে করে, আমি অপরের অগ্রে স্বর্গে যাইব, আমি অপরের অগ্রে মুক্তিলাভ করিব, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর। স্বার্থশূন্য ব্যক্তি বলেন, আমি সকলের অগ্রে যাইতে চাই না, সকলের শেষে যাইব—আমি স্বর্গে যাইতে চাই না—যদি পরোপকারের জন্ত নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কেহ ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্ম্মিক, সেই শিবের সামীপ্য লাভ করে। সে পণ্ডিতই হউক, মুখীই হউক, সে শিবের বিষয় কিছু জাম্বুক বা না জাম্বুক, সে অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শিবের অধিক নিকটবর্ত্তী। আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি জগতে যত দেবমন্দির আছে, দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়া থাকে, সে যদি চিতাবাঘের মত সাজিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

### পাশ্চাত্যে স্বামীজির স্মৃতিস্তুতি ।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারের পর স্বামীজি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম পাশ্চাত্যে পদার্পণ করেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ রামনাদের রাজা একটী স্মৃতি-

স্তু নিৰ্মাণ কৰিয়া দিয়াছেন। উহাৰ উপৰ যে কথাগুলি খোদিত আছে, তাহাৰ বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিতে আশ্চৰ্য্য-ৰূপে কৃতকাৰ্য্য হইয়া তাঁহাৰ ইংৰাজ শিষ্যগণেৰে সহিত ভাৰতেৰে যে স্থানে প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰেন, রামনাদেৰে ৰাজা ভাস্কৰ সেতুপতি সেই স্থানে এই স্তুতিস্তুত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিলেন।

### রামনাদে অভ্যর্থনা ।

পাঠকবৰ্গেৰে জানা আবশ্যক, পাশ্চান ভাৰতেৰে নিকটবৰ্তী একটা ক্ষুদ্ৰ দ্বীপ। স্তুত্ৰাং পাশ্চান হইতে আবার জাহাজে চড়িয়া ভাৰতে আসিতে হইল। ভাৰতে পৌঁছিয়া রামনাদেৰে ৰাজ্যৰ ছত্ৰে স্বামীজি প্ৰাতৰোজনে ক্ৰিয়া নিৰ্বাহ কৰিলেন। তাৰ পৰা তিৰুপিলানি নামক স্থানে পৌঁছিলে ভাৰতাকাৰ অধিবাসিগণ স্বামীজিকে অভ্যৰ্থনা কৰিলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় রামনাদ দেখা গেল। সমুদ্ৰতীৰ হইতে স্বামীজি বৰাবৰ গোশকটে বাইতেছিলেন, কিন্তু রামনাদেৰে নিকট পহুঁছিয়া স্বামীজি একখানি নৌকায় উঠিয়া একটা বৃহৎ হ্ৰদেৰে মধ্য দিয়া বাইতে লাগিলেন—দাক্ষিণাত্যে এৰূপ অনেক বড় বড় হ্ৰদ আছে। স্তুত্ৰাং রামনাদে উক্ত হ্ৰদেৰে তীৰে স্বামীজিৰে অভ্যৰ্থনা হইল—হ্ৰদতীৰে অভ্যৰ্থনা হওয়াৰ দৰূণ অভ্যৰ্থনা সভা বেশ জমিয়াছিল। রামনাদেৰে ৰাজা অবশ্য অভ্যৰ্থনাকারীদেৰে অগ্ৰণী। তিনি স্বয়ং স্বামীজিকে অভ্যৰ্থনা কৰিয়া লইয়া রামনাদেৰে কয়েকটা সজ্জাস্ত লোকেৰে সহিত তাঁহাৰে পৰিচয় কৰিয়া দিলেন। যখন সকলে রামনাদেৰে নিকট পহুঁছিয়াছিলেন, তখনই স্বামীজিৰে সন্মানাৰ্থ তোপ পড়িতে আৰম্ভ হইয়াছিল—যখন রামনাদে পহুঁছিলেন, তখন রকেট (Rocket) বাজি ছোঁড়া হইতে লাগিল। স্বামীজি ৰাজ্যৰে গাড়ীতে চড়িয়া ৰাজভ্ৰাতা পৰিচালিত ৰাজ্যৰে শৰীৰ-ব্ৰহ্মকগণেৰে দ্বাৰা বেষ্টিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। ৰাজ্য পদব্ৰজে সমবেত জনতাৰে নেতৃত্বৰূপ হইয়া স্বামীজিৰে অনুধাবন কৰিতে লাগিলেন। ৰাস্তাৰে দুই ধাৰে মশাল জ্বলিতেছিল। দেশী বিলাতী দুই প্ৰকাৰ বাদ্য হইতেছিল। স্বামীজি জাহাজ হইতে নামিবাৰে পৰা হইতে নগৰে প্ৰবেশ পৰ্য্যন্ত বিলাতী বাদ্য চলিতেছিল—তাহাৰা ‘হেৰে এসেছেন বিজয়ী বীৰ’ (See the Conquering hero comes) এই গান গাহিতেছিল। অৰ্দ্ধেক পথ এইৰূপে



আসা হইলে রাজা কর্তৃক অধুৰূপ হইয়া স্বামীজি সুন্দর বাজশিবিকায় আরোহণ করিয়া শঙ্কর ভিলায় আসিলেন। ঋণকাল বিচারের পর স্বামীজি উক্ত স্থানের রহৎ বক্তৃতা হলে গমন করিলেন। ইতিমধ্যেই তথায় লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজিকে দেখিবামাত্র তাহার পূর্বের স্মার উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা প্রথমতঃ স্বামীজিকে বহু প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাজা দিনকর সেতুপতিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতে বলিলেন। অভিনন্দন পাঠ শেষ হইলে উক্ত অভিনন্দনপত্রটি অতি সুন্দর কারুকার্য্যধচিত একটা বড় রূপার গিল্টি করা বাক্সে করিয়া তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

### রামনাদ অভিনন্দন ।

শ্রীপরমহংসযতিরাজদিগ্বিজয়কোলাহলসৰ্বমতসম্প্রতিপন্নপরমযোগেশ্বরশ্রীমন্ত-  
শ্ববান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকরকমলসজ্জাত, রাজাধিরাজসেবিত শ্রীবিবেকানন্দ  
স্বামী পূজ্যপাদেষু,

স্বামিন্,

এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথ-  
পুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে  
আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। যে স্থান সেই মহাধর্মবীর আমাদের  
পরম ভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছে,  
সেই ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমা-  
দের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাতে আমরা আপনা-  
দিগকে মহা সোভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছি।

আমাদের সনাতন ও মহান্ ধর্মের প্রকৃত মহত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশের মনীষি-  
গণের চিত্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য আপনি যে চেষ্টা করিয়াছেন,  
তাহা অতীব প্রশংসার্হ এবং ঐ চেষ্টার যে অভূতপূর্ব ফল ফলিয়াছে,  
তাহাতে আমরা অকপট আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিয়াছি। আপনি  
অপূর্ব বাগ্মিত্য সহকারে ও স্পষ্ট অদ্রাস্ত ভাষায় ইউরোপ ও আমেরিকার  
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন ও তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়  
বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মই আদর্শ সার্বভৌমিক ধর্ম এবং  
উহা সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীরই প্রকৃতির উপযোগী। আপনি

মহানিঃসর্গ ভাবের প্রেরণায়, মহোচ্চ উদ্দেশ্য প্রাণে লইয়া ও মহা স্বার্থত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অতুল ঐশ্বর্যাশালী ইউরোপ ও আমেরিকায় সত্য ও শান্তির সংবাদ বহন করিয়াছেন এবং ভারতের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা উড়াইয়াছেন। আপনি উপদেশ ও জীবন—উভয়তঃ সার্বভৌমিক ভ্রাতৃত্বভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যে পরিণতির সম্ভাবনীয়তা দেখাইয়াছেন। সর্বোপরি, আপনার পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারের ফলে গোণভাবে ভারতের উদাসীন পুত্রকন্ডাগণের প্রাণে অনেক পরিমাণে তাহাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম্মের মহত্ত্বের ভাব জাগরিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরম প্রিয় অমূল্য ধর্ম্মের চর্চ্চা ও অনুষ্ঠানে একটা আন্তরিক আগ্রহ জন্মিয়াছে।

এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের জন্ত আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনার প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। আপনার অমুরক্ত শিষ্য আনাদের রাজার প্রতি আপনি যে বরাবরই পরম অমুগ্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, একথা উল্লেখ না করিলে এই অভিনন্দনপত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আপনি অমুগ্ধপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার জন্ত তিনি আপনাকে যেরূপ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন, তাহা তিনি ভাষায় প্রকাশে অসমর্থ।

উপসংহারে আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি, যে, তিনি যেন আপনি যে কল্যাণকর কার্য্য এত সুন্দররূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পরিচালন করিতে আপনাকে দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করেন। আপনার পরম ভক্ত আত্মাবহ শিষ্যগণের প্রীতি ও প্রেমসংকৃত এই অভিনন্দন।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার সমগ্রটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

### রামনাথ অভিনন্দনের উত্তর।

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাত্মা অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগরিত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘটনাক্রম ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন প্রতিগোচর হইতেছে। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের জ্ঞান-

ভক্তিকর্মরূপ হিমালয়ের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ণ রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। বতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থি-মাংসে পর্য্যন্ত যেন প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বাহ্যিক শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না; কুন্তকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে।

হে রাজন্, হে রামনাদবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে দয়া প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের সহিত আমাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ম আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা আমার প্রতি যে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি। কারণ, মুখের ভাষা অপেক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে ভাববিনিময় অতি অপূর্ণ—আত্মা নীরবে অথচ অভ্রান্ত ভাষায় অপর আত্মার সহিত বাকলাপ করেন—তাই আমি আপনাদেব ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি। হে রামনাদাধিপ, আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্ম যদি এই দীনজনের দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীর চিন্তা তাহাদের গৃহেই অজ্ঞাত ও গুপ্তভাবে রক্ষিত অমূল্য রত্নরাশির প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্ম কোন কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, যদি তাহারা অজ্ঞানান্ধতাবশে অপর স্থানের মলিন পয়ঃপ্রণালীর জল পান না করিয়া তাহাদের স্বগৃহ সমীপবর্তী অনন্ত প্রবাহিনী নিরবিচ্ছিন্ন নির্মল জল পান করিতে আহুত হইয়া থাকে, যদি আমাদের স্বদেশবাসীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ম্ম পরায়ণ করিবার জন্ম, রাজনীতি, সমাজসংস্কার বা কুবেরের ঐশ্বর্য্য হইলেও ধর্ম্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম্ম গেলেই যে ভারতের প্রাণও যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্ম যদি কোন কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, হে রামনাদাধিপ, ভারত অথবা ভারতের প্রদেশে যে কিছু কার্য্য হইয়াছে, তাহার সমুদয় প্রশংসার ভাগী আপনি। আপনি যেন অন্তর্দৃষ্টি বলে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া আমাকে বরাবর সাহায্য

কাব্য। আসিযাছেন, কখনই আমাকে উৎসাহ দিতে বিরত হন নাই।  
 ১৮৮৭ আপনি যে আমার সকলভায় প্রথম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন  
 এবং আমি যে ভারতে আসিয়া প্রথম আপনার রজ্যে নামিলাম, ইহা ঠিকই  
 হইয়াছে। হে ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের রাজ্য যেমন পূর্বেই বলিয়াছেন—  
 আমাদিগকে বড় বড় কায করিতে হইবে, অদ্ভুত শক্তির শিক্ষা দেধাইতে  
 হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিখাইতে হইবে। দর্শন,  
 ধর্ম বা নীতিবিজ্ঞানই বল, অথবা তিতিক্ষা, কোমলতা বা মানবজাতির প্রতি  
 অকপট প্রীতিরূপ সদৃশগরাজিই বল, আমাদের এই মাতৃভূমি এই সকলেরই  
 প্রহতি। এখনও ভারতে এইগুলি বিদ্যমান আর আমি পৃথিবীর সম্বন্ধে  
 যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এখন দৃঢ়ভাবে সাহসের

সহিত বলিতে পারি, এখনও ভারত এই সকল বিষয়ে পৃথিবীর  
 ১৮৮৭ ভারতের সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সামান্য আশ্চর্য্য ব্যাপারটী  
 মেকদও রাজ্য লক্ষ্য করিয়া দেখ। গত ৪৫ বর্ষ ধরিয়া জগতে অনেক গুরুতর  
 নীতি বা অশর কিছুর নহে। রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড়

রাজনৈতিক সম্প্রদায় উহার বিভিন্ন প্রদেশের সমাজশরীরকে একেবারে  
 বিপর্যাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছে।  
 আমাদের দেশের লোককে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা এ সকলের কথা কিছু  
 শুনিয়াছে কি না। তাহারা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু চিকাগোয় ধর্ম্মমহাসভা  
 বসিয়াছিল, ভারত হইতে সেই মহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়া  
 সাদবে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি পাশ্চাত্য দেশে কার্য্য করিতে-  
 ছেন, এখানকার অতি দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত তাহা জানে। লোকে বলিয়া  
 থাকে আমাদের দেশের সাধারণ লোক বড় স্থূলবুদ্ধি, তাহারা জনিয়ার কোন  
 প্রকার সংবাদ রাখে না, সংবাদ চাহেও না। পূর্বে আমারও ঐ মতের দিকে  
 ঝোঁক ছিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, আমি অনভিজ্ঞতা বশতঃ ওরূপ মনে  
 করিতাম। কল্লনাগ্রিয় লেখকগণের অথবা এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী ও  
 অরিতদৃষ্টিতে দেশদর্শকগণের পুস্তক পাঠ অপেক্ষা নিজের চোকে দেখিলে  
 অনেক বেশী জ্ঞানলাভ হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই  
 জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে নিরোধও নহে  
 অথবা তাহা এ দেশের সংবাদ লইতে কম ব্যাকুল, তাহাও নহে, জগতের  
 অন্যান্য স্থান মন সংবাদ সংগ্ৰহে আগ্ৰহান্বিত, ইহারাও নহে।

তবে প্রত্যেক জাতিরই এক একটা জীবনোদ্দেশ্য আছে। প্রত্যেক জাতিই প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সকল জাত মিলিয়া যেন এক মহা ঐক্যাতান বাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে— প্রত্যেক জাতিই যেন উহাতে এক একটা পৃথক্ পৃথক্ সুর দিতেছে। উহাই উহার জীবনীশক্তি। উহাই উহার জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র একমাত্র ধর্ম। অপরে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যবলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও উহার প্রচার, বাহ্য স্বাধীনতালাভের অপূর্ণ সুখের কথা বলুক। হিন্দু এ সকল বুঝে না, বুঝিতে চাহেও না। তাহাদের সহিত ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, অনন্ত, মুক্তি—এ সকল সম্বন্ধে কথা কও। আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, অগ্ন্যাচ্ছ দেশের অনেক তথাকথিত দার্শনিক হইতে আমাদের দেশের হীনতম কৃষক পর্য্যন্ত এ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ। তদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, এখনও আমাদের জগৎকে শিক্ষাইবার কিছু আছে। এই কারণেই শত শত বর্ষ অভ্যাচারে ও প্রায় সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসন ও পীড়নেও এই জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত—কারণ, এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করে নাই।

আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও সে ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যারূপ নিরক্ষরিতা বর্তিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবল্লা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অগ্ন্যাচ্ছ জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মতমতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তাহেমনে বাজিতেছে, ভাগ।

কোনটী বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটা প্রধান সুর যেন ভৈরব রাগে সপ্তমে উঠিয়া অপর গুলিকে আর শ্রুতি-বিবরে পঁছছিভে দিতেছে না। তাগের ভৈরব রাগের নিকট অগ্ন্যাচ্ছ রাগরাগিনী যেন লজ্জায় হুঁ লুকাইয়াছে। ‘বিষয়ান্ বিবং ত্যজ’ ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই এই কথা—ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলমন্ত্র স্বরূপ। তুমিয়া হুঁদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন ত ক্ষণিকমাত্র। ইহার পশ্চাতে দূরে অতি দূরে, সেই অনন্ত অপার রাজ্য—যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহা বীর, মনীষিগণের হৃদয়-

জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—তাঁহারা এই তথা-কথিত অনন্ত জগৎকেও একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপমাত্র জ্ঞান করেন—তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়াইয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কাল, অনন্ত কালেরও তথায় অন্তিম নাই—তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে, অতি দূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও সত্তা নাই—তাঁহারা তাহারও পারে বাইতে চাহেন। ইহাই ধর্মের গূঢ়তম রহস্য। ভূতপ্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক, যতই ক্ষতিস্বীকার করিতে হউক, কোনরূপে প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতে মত সেই দেশ-কালাতীত সত্তার দর্শনচেষ্টা—ইহাই আমাদের জাতির প্রকৃতি। তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্বীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি বাহাই বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে, অপর কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে। অতএব জগৎকে তোমাদিগকে এই ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের কিছু শিখিবার আছে কি না। সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদের কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কামে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যদিগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত,—ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ত্যাগ সুখই পরম পুরুষার্ধ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ও সব মিথ্যা। ভ্রান্তি—ভ্রান্তিমাত্র—ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।

তথাপি বাহারা উচ্চতম সত্যের এখনও অধিকারী হয় নাই। আমাদের  
 এরূপ ভ্রাতৃবর্গের পক্ষে এক প্রকার জড়বাদ বাস্তবিক কল্যাণের কারণ  
 হইতে পারে—অবশ্য উহা আমাদের কার্যোপযোগী করিয়া  
 জড়বাদের প্রয়োজনীয় হইতে হইবে। সকল দেশেই, সকল সমাজেই একটী বিষয়  
 যত্ন। ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। আর বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে,  
 ভারতে পূর্বে এই ভ্রম কখনও হয় নাই—কিন্তু কিছুদিন হইতে এখানেও  
 এই ভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সেই ভ্রম এই—অধিকারী বিচার না  
 করিয়া সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা প্রদান। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সকলের  
 এক পথ নহে। তুমি যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, আমারও সেই  
 প্রণালী হইতে পারে না। তোমরা সকলেই জান, সন্ন্যাসাশ্রমই হিন্দু  
 জীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে  
 আদেশ করিতেছেন। যে না করে, সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে  
 হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ  
 করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।  
 বখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে, সংসার অসার, তখন  
 তোমাকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি ইহাই হিন্দুর আদর্শ।  
 বখন বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিবে, সংসারফলের ভিতরটা ভূয়ামাত্র—  
 আম্ভার ছায় উহার আঁট ও চাম্‌ড়াই সংসার, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া  
 যেখান হইতে আসিয়াছ, তথায় ফিরিবার চেষ্টা কর। মন যেন চক্রগতিতে  
 সম্মুখে ইঞ্জিরের দিকে ধাবমান হইতেছে—উহাকে আবার চক্রগতিতে ফিরিয়া  
 পশ্চাতে আসিতে হইবে। প্ররতিমার্গ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর মার্গের আশ্রয় গ্রহণ  
 করিতে হইবে। ইহাই আদর্শ। কিন্তু কতকটা ভোগ না করিলে এই  
 আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না। শিশুকে ত্যাগধর্ম্য শিক্ষা দেওয়া যায় না।  
 সে জন্মিয়া অবধি সোনার স্বপন দেখিতেছে। সে ইন্দ্রিয়গত প্রাণ। তাহার  
 জীবনটা কতকগুলি ইন্দ্রিয় সুখের সমষ্টি মাত্র। সকল সমাজের বালকবৎ  
 অজ্ঞান লোকসকলও এইরূপ। তাহাদিগকে সংসারের অসারতা বুঝিতে  
 হইলে প্রথমে তাহাদিগকে কিছু ভোগ করিতে হইবে—তবেই তাহারা বৈরাগ্য  
 লাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ইহার জ্ঞাত বথেষ্ট ব্যবস্থা  
 রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল সন্ন্যাসীর নিয়ম অন্তসারে সমা-  
 জের আপামর সাধারণ সকলকে পরিচালিত করিবার একটা বিশেষ চেষ্টা

দেখা যাইতেছে। ইহা মহা ভুল। ভারতে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা এই কারণেই হইয়াছে। গরিব লোকের অত শত ধর্মের বাঁধনের কোন আবশ্যক নাই—অথচ তাহাকে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মে বাঁধিবার চেষ্টা। তাহাকে অত বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কার্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া হাত গুটাইয়া লও দেখি। বেচারী একটু সংসারের সুখ ভোগ করিয়া লউক। দেখিবে, সে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে—ক্রমশঃ ত্যাগ তাহার আপনা আপনাই আসিবে। হে ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট ভোগচেষ্টায় কিরূপে সফলতা লাভ করা যায়, তাৎপর্যে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের অস্তিত্ব দুঃখের সহিত বলিতে

প্রাচীন  
পাশ্চাত্য।

অসম্ভব, আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাঁহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের এখন একদিকে প্রাচীন হিন্দু সমাজ, অপর দিকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। যদি আমরা কেহ এই দুইটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, তবে আমি প্রাচীন হিন্দু সমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ, সেকলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরু-দণ্ড হীন—সে চারিদিক্ হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই—সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই—কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না—তাহার মাথা দিন রাত্রি বোঁ বোঁ করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার গুণ কারণ কি শুনিবে? আমাদের হঠাকর্ত্তাবিধাতা ইংরাজ লোকে কিসে তাহার পিট চাপুড়াইয়া ছুটা বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্ব্বকার্য্যের অভিসন্ধির মূল্য। সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথা বিকল্পে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ ঐ সকল আচার সাংস্কারের মত বিকল্প। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ, সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের বাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও।



যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুষ ছিলেন—তাহাদের সকলেরই একটা দৃঢ়তা ছিল—কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট জীবপদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষ বলিব না স্ত্রী বলিব না পশু বিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরুষও আছেন। আপনাদের রাজা একজন এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতে ইহার জ্ঞান নিষ্ঠাবান পুরুষও দেখিতে পাইবে না আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বিষয়েরই সবিশেষ সংবাদ রাখেন, এমন রাজাও এ ভারতে গৃহীত করিতে পারিবে না। ইনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—উভয় জাতির যে টুকু ভাল, তাহাই ইনি গ্রহণ করিয়াছেন।

মহু মহারাজ তৎকৃত সংহিতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি ।

অন্ত্যাদপি পরো ধর্মঃ জীরত্বং হৃক্ষুলাদপি ॥

শ্রদ্ধাপূর্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম অর্থাৎ মুক্তিমार्গের উপদেশ লইবে। নীচকুল হইতেও বিবাহার্থ উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

মহু মহারাজ যাহা বলিয়াছেন, এ ঠিক কথা। আগে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, তার পর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর, যাহা কিছু

পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাছে লাগিবে,  
‘বৈঠিয়ে  
আপনা ঠাম’। তাহা গ্রহণ কর। তবে এইটী মনে রাখিও, তোমরা যখন হিন্দু

তখন তোমরা যাহা কিছু শিক্ষা কর না কেন, সকলই যেন তোমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ ধর্মের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক এক বিশেষ কার্যসাধনোদ্দেশ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাহার অনন্ত পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলে তাহার জীবনের এই নির্দিষ্ট গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। হে রামনাদনিবাসিগণ! তোমরাও প্রত্যেকে এক বিশেষ ব্রতসাধনোদ্দেশ্যে জন্মিয়াছ। মহামহিমাময় হিন্দুজাতির অনন্ত-ভূত জীবনের সমুদয় কর্মসমষ্টি তোমাদের এই জীবনব্রতের নির্দেশক।

সাবধান, তোমাদের লক্ষ লক্ষ পিতৃপুরুষ তোমাদের প্রত্যেক কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ! সেই ব্রত কি, যে ব্রত সাধনোদ্দেশ্যে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের জন্ম ? মহুমহারাজ মহা স্পর্ধার সহিত ব্রাহ্মণের ঘরের যে কার্য নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পড় নাই ?

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিকায়তে ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্ত গুণয়ে ॥

‘ধর্মকোষস্ত গুণয়ে’—ধর্মরূপ ধনভাণ্ডারের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের জন্ম । আমি বলি, এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে কোন নরনারী জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মগ্রহণের কারণ—‘ধর্মকোষস্ত গুণয়ে’ । অত্যাশ্চর্য্যকর বিষয়কেই আমাদের জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্যের অধীন করিতে হইবে । যেমন সঙ্গীতে একটি প্রধান সুর থাকে, অত্যাশ্চর্য্যকর তাহারই অধীন, তাহারই অন্তর্গত হইলে তবে সঙ্গীতে ঠিক লয় হইয়া থাকে এখানেও তাহাই করিতে হইবে । এমন জাতি থাকিতে পারে, বাহাদের মূলমন্ত্র—রাজনৈতিক প্রাধাত্য—ধর্ম ও অত্যাশ্চর্য্যকর বিষয় তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণ অধিকার অবশ্যই করিবে । কিন্তু এই আর এক জাতি রহিয়াছে, বাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম ও বৈরাগ্য—বাহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র এই যে—এ জগৎ জগৎহারাী জন্মাত্র, মিথ্যা—ধর্ম ব্যতীত আর বাহা কিছু—জ্ঞান বিজ্ঞান ভোগ ঐশ্বর্য্য নাম যশ ধন দৌলত—সবই উহার নিম্নে । তোমাদের রাজার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব—তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যা, তাঁহার ধন মান পদমর্যাদা সবই তাঁহার ধর্মের অধীন—ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন—যে ধর্ম যে আধ্যাত্মিকতা, যে পবিত্রতা হিন্দুজাতির, প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের জন্মগত সংস্কাররূপ । সুতরাং পূর্বোক্ত দুই প্রকার লোকের মধ্যে—একজন বাহার মধ্যে হিন্দুজাতির জীবনের মূলশক্তিরূপ আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান, বাহার আর কিছু নাই, অর্থাৎ প্রাচীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়, আর একজন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কতকগুলি নকল হীরা জহরত লইয়া বসিয়া আছে অথচ বাহার ভিতর সেই জীবনপ্রদ শক্তিসংকারী আধ্যাত্মিকতা নাই—এই উত্তর সম্প্রদায়ে যদি ভুলনা করা যায়, তবে আমার বিশ্বাস—সমবেত শ্রোতৃবর্গ লকলেই একমত হইয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়েরই পক্ষপাতী হইবেন—কারণ, এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের উন্নতির কতকটা আশা করিতে পারা যায় । তাহার একটা ধরিবার জিনিষ আছে । জাতীয়

মূলতঃ তাহার প্রাণে জাগিতেছে—সুতরাং তাহার বাঁচিবার আশা আছে—শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কিন্তু মৃত্যু অবশ্যতাবী। যেমন কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে, যদি তাহার মর্মে কোন আঘাত না লাগিয়া থাকে, তাহার মর্মস্থানে যদি অব্যাহত থাকে, তবে অত্র কোন অঙ্গে যতই আঘাত লাগুক না, তাহাকে সাংঘাতিক বলি যাইতে পারে না, সেইরূপ আমাদের জাতির মর্মস্থানে ঘা না লাগিলে তাহার বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটী বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্ব্বম্ব সত্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভগ্ন হইয়া গেল—যে ভিত্তির উপর জাতীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া গেল—সুতরাং ফল দাঁড়াইল—সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইহাই পথ—আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মধন উত্তরাধিকারস্বত্বে পাইয়াছি—তাহাই প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ, যে দেশে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন দুর্গ-নিবাসী পণ্ডিতদিগের সর্ব্বস্বগুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যাঘ্রগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ না করিয়া অরণ্যবাসী অর্জনময় তাপসগণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন? তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, শুন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ। অত্যান্ত দেশে বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ আপনাদিগকে কোন প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, এখানে বড় বড় রাজারা আপনাদিগকে কোন প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণে সচেষ্ট। এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্তে প্রসারিত করিয়া অত্যান্ত জাতির

ভবিষ্যৎ নিকট বাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর—কিন্তু মনে ভারত ।

রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অন্তর্গত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ-ভারত অপূর্ণ মহিমামণ্ডিত হইয়া

আবিস্কৃত হইবে—আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে—  
আমার বিশ্বাস—ভারত কোন কালে বাহা ছিল না, শীঘ্রই সে শ্রেষ্ঠ-  
তার অধিকারী হইবে। প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয়  
হইবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বংশধরগণের এই অভূতপূর্ব  
অভ্যুদয়ে শুধু যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে, আমি নিশ্চিত বলিতেছি,  
তাঁহারা পরলোকে আপন আপন স্থান হইতে তাঁহাদের বংশধরগণকে  
একপ মহিমায়িত, একপ মহত্ত্বশালী দেখিয়া আপনাদিগকে মহা গৌরবান্বিত  
জ্ঞান করিবেন। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম  
করিতে হইবে, ঘুমাইবার আর সময় নাই। আমাদের কার্য-  
কলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারত-  
মাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা  
ছিলেন মাত্র। তাঁহাকে জাগাও আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্য্যাপেক্ষা  
মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহায় অনন্ত সিংহাসনে  
প্রতিষ্ঠিত কর। আর যিনি শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণু, কৰ্ম্ম-  
দিগের কৰ্ম্ম, বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, জৈনদিগের জিন, ঈশাহি ও রাহনীদিগের  
যাভে, মুশলমানদিগের আল্লা, বৈদান্তিকদিগের ব্রহ্ম, যিনি সকল ধর্ম্মের,  
সকল সম্প্রদায়ের প্রভু, সেই সর্বব্যাপী পুরুষ বাঁহার সম্পূর্ণ মহিমা ভার-  
তই কেবল জানিয়াছিল (প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান ভারতই কেবল লাভ করিয়া-  
ছিল, আর কোন জাতিই প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তোমরা  
হয় ত আমার একথায় আশ্চর্য্য হইতেছ, কিন্তু অজ্ঞ কোন শাস্ত্র হইতে প্রকৃত  
ঈশ্বরতত্ত্ব বাহির কর দেখি। অজ্ঞাত জাতীর এক এক জন জাতীয় ঈশ্বর, বা  
জাতীয় দেবতা ছিল—রাহনীদীর ঈশ্বর, আরাবেবের ঈশ্বর ইত্যাদি আর সেই ঈশ্বর  
আবার অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া-  
ময়ত্ব, তিনি যে পরম দয়াময়, তিনি যে আমাদের পিতা, মাতা, সখা, প্রাণের  
প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা—এ তত্ত্ব কেবল ভারতই জানিত) সেই দয়াময় প্রভু  
আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আমাদিগকে সাহায্য করুন, আমাদিগকে  
শক্তি দিন, বাহাতে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ সহনাববতু সহ নো ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবামহৈ।

ওঁ তেজস্বিনাবশীতমস্ত মাবিধিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ।

আমরা বাহা প্রবণ করিলাম, তাহা যেন ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় আমাদের পুষ্টি বিধান করে, আমাদের উহা বলস্বরূপ হউক, উহা আমরা আমাদের এমন বীৰ্য্য উৎপন্ন হউক যে, আমরা যেন অপরের কিছু সাহায্য করিতে পারি। আমরা—আচার্য্য ও শিষ্য যেন কখনও পরস্পর বিবেচনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ।”

সভাভঙ্গের পূর্বে রাজা প্রস্তাব করিলেন, স্বামীজির রামনাদে ওত পদ্যপর্ণের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই স্থান হইতে তাঁহা সংগৃহীত হইয়া মাস্ত্রাজ হৃভিক্ষ ফণ্ডে প্রেরিত হউক।

স্বামীজি যে কয়দিন রামনাদে ছিলেন, অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে আসিত। একদিন তিনি এখানকার খৃষ্টীয়ান স্কুলগৃহে একটা বক্তৃতা দেন। স্বামীজির সম্মানার্থ একদিন রাজপ্রাসাদে দরবার হয়। এখানেও তাঁহাকে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিনন্দন দেওয়া হয়। এখানে স্বামীজি একটা সুন্দর ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দেন—তাহাতে তিনি বলেন, রামনদাধিপ যদিও সাংসারিক পদমর্যাদায় খুব উচ্চ, তথাপি তাঁহার চিন্ত সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত। স্বামীজি এই কারণে তাঁহাকে রাজর্ষি আখ্যা প্রদান করিলেন। এখানে স্বামীজি একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন, উহা ফনোগ্রাফে তোলা হয় তাহাতে তিনি ভারতে শক্তিপূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। রবিবার সন্ধ্যাকালে এই দরবার হয়। ঐ দিনই নিশীথকালে স্বামীজি রামনাদ হইতে যাত্রা করিলেন।

### পরমকুড়ি অভিনন্দন ।

রামনাদ হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া স্বামীজি পরমকুড়ি নামক স্থানে পৌঁছিলেন। তৎস্থান নিবাসিগণ পরম সমারোহ সহকারে স্বামীজির অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা স্বামীজিকে একখানি অভিনন্দন পত্রও প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রে তাঁহারা স্বামীজির পাশ্চাত্য প্রদেশে হিন্দুধর্ম প্রচারের সকলতায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রহিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্মোপদেশ শুধু শুনিয়া ও উহাতে সান্ন দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা তাহাদের জীবনকে পর্য্যন্ত পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।

আপনার অদ্বুত শক্তি দেখিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিগণের কথা স্মৃতিগণে উদ্ভিত হইতেছে, যাঁহারা তপস্যা ও আত্মসংযম্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া মানবজাতির প্রকৃত আচার্য্য ও নেতা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

### পরমকুড়ি অভিনন্দনের উত্তর ।

স্বামীজি এই অভিনন্দনের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইলঃ—

“আপনারা আমাকে যেরূপ বহুসহকারে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে কি তাহার ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহা আমি ধুঁজিয়া পাইতেছি না । তবে যদি আমাকে অনুমতি করেন ত আমি বলিতে চাই, লোকে আমাকে পরম যত্নের সহিত অভ্যর্থনাই করুক অথবা আমাকে দূর দূর করিয়া এখান হইতে তাড়াইয়াই দিক, আমার স্বদেশের প্রতি, বিশেষতঃ আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কিছু ইতরবিশেষ হইবে না, কারণ, আমরা গীতায় পাঠ করিয়াছি—“কর্ম্ম নিকাম ভাবে করা উচিত — আমাদের ভালবাসাও নিকাম হওয়া উচিত” । পাশ্চাত্য দেশে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহা অতি অল্পই—এখানে এমন কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই, যিনি আমাদের শতগুণ কার্য্য করিতে না পারিতেন । আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, যেদিন মহা মনীষী ধর্ম্মবীরগণ অভ্যুত্থিত হইয়া সমগ্র জগতে ভারতের অরণ্যরাজি হইতে সঞ্চিত ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগতত্ত্ব প্রচার করিবেন । মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সব জাতির মধ্যে যেন একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে । তাহারা দেখে,

আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের তরঙ্গগতিতে আবির্ভাব ও বিরোভাব । তাহারা যে কোন মতলব করিতেছে, তাহাই যেন হাত ফস্কিয়া পলাইতেছে, প্রাচীন আচার প্রথাগুলি যেন সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সব আশা তরসা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সবই যেন আল্পা আল্পা হইয়া যাইতেছে । জগতে দুই প্রকার বিভিন্ন

ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এক ধর্ম্মভিত্তির উপর, আর এক সামাজিক প্রয়োজনের উপর । একটীর ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপরটীর জড়বাদ । একটীর ভিত্তি অভীক্ষিয়বাদ, অপরটীর প্রত্যক্ষবাদ । একটী এই ক্ষুদ্র জড় জগতের সীমার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে, এবং এমন কি, অপরটীর সহিত কোন সংশ্লব না রাখিয়া

কেবল আধ্যাত্মিক ভাব লইয়াই জীবন বাপন করিতে সাহসী হয়, অপরটি নিজের চতুর্দশার্ধে বাহ্য দোষিতে পায়, তাহারই উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তৃপ্ত; সে আশা করে, ইহারই উপর সে জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে কৃতকার্য হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে— যেন তরঙ্গবৎ গতিতে একটীর পর আর একটা আসিয়া থাকে। এক দেশেই আবার বিভিন্ন সময়ে এই বিভিন্ন তরঙ্গ দেখিতে পাইবে। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—ঐশ্বর্য সম্পদের উপায় বতই আবিষ্কৃত হয়, ততই জীবনের সমুদয় অংশই যেন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, যে শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, বাহ্যতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্য সম্পদ হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষ্যাভেদও প্রবলীকার ধারণ করে। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই যেন তখনকার যুগধর্ম হইয়া পড়ে। ‘চাচা আপনা বাঁচা’—ইহাই তখন সকলের মূলমন্ত্র স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন লোকে আবার বুঝিতে আরম্ভ করে যে, তাইত কলুম কি, সবই যে রুখা হোল, ধর্ম সহায় না হইলে,—ক্রমশঃ জড়বাদের গভীর আবর্তে মজ্জমান জগতের সাহায্যার্থ ধর্ম অগ্রসর না হইলে,—জগতের ধ্বংস অবশ্যজ্ঞাবী। তখন লোকে নব আশার আশাবিত হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্ত নূতন ভিত্তির গন্তন করে। তখন ধর্মের দ্বার এক বন্ধা আসে।

কালে আবার ইহার অবনতি হয়। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয় \* যাহারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার একচেটিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহার অব্যবহিত ফল,— পুনরায় জড়বাদের দিকে গতি। জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে—বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে, যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নহে, তাহার

\* এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে আমাদের বর্তমান ভারত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। উদ্বোধন ১ম বর্ষ ১৯৬, ৩৩৫ পৃষ্ঠা দেখ। অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশিত বর্তমান ভারতের ১৩-১৮, ৪২ পৃষ্ঠার দেখ। বর্তমান ভারত উদ্বোধন কার্যালয়ে ও প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যায়।

সর্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি অল্পসংখ্যক কয়েকটা ব্যক্তির একচেটিয়া হয়। এই অল্পসংখ্যক লোক সর্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেতন হইতে হয়। তখন জড়বাদ দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। যদি তোমরা আমাদের মাতৃভূমি ভারতভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—এখানেও এক্ষণে সেই ব্যাপার ঘটিতেছে। ইউরোপে তোমাদের ধর্মপ্রচারার্থ একজন গিয়াছিলেন, আজ যে তোমরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছ, ইউরোপীয় জড়বাদ ইহার পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে ইহা অসম্ভব হইত। সুতরাং এক হিসাবে জড়বাদ যথার্থই ভারতের কিছু কল্যাণ সাধন করিয়াছে—উহা সকলেই উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছে—উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকার দূর করিয়া দিয়াছে—অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি হস্তে যে অমূল্য রত্ন গুপ্তভাবে ছিল, এবং তাহারাও বাহার ব্যবহার ছুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সর্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ অমূল্য রত্নের অর্দ্ধভাগ নষ্ট হইয়াছে, অপরাধী এমন সকল লোকের হস্তে রহিয়াছে, বাহারা গরুর জাবপাত্রে শয়ান কুকুরের মত নিজেরাও খাইবে না, অপরকেও খাইতে দিবেনা।

অপর দিকে আবার আমরা ভারতে যে সকল রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, সে সকল ইউরোপে যুগযুগ ধরিয়া রহিয়াছে, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ঐ গুলি পরীক্ষিত হইয়াছে, আর সেগুলি যে সামাজিক প্রয়োজন পরিপূরণে অসমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইউরোপের রাজ-শাস্ত্রাচার্য্য সমা- নৈতিক শাসনসংস্থা সর্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া জের অস- অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে আর এক্ষণে ইউরোপ স্পূর্ণতা। অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে, কি করিবে, কোথায় বাইবে বুকিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদের অত্যাচার অসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন, সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটা ব্যক্তির হস্তে—তাঁহারা নিজেরা কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কায় করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতা বলে তাঁহারা সমগ্র জগৎ রক্তে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম ও আর আর বাহা কিছু, সবই তাঁহাদের পদতলে। তাঁহারাই সর্বসর্বা শাসনকর্তা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন,



সেগুলি বাজে কথা মাত্র । পাশ্চাত্যপ্রদেশ শাইলকগণের অত্যাচারে জর্জরীকৃত, প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে । উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে ।

মনে করিও না, ইহাদের মধ্যে একটা ষারা মাত্র জগতের কল্যাণ হইবে । অপকৃপাতী ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে সকলকেই সম্পূর্ণ সমান করিয়াছেন । অতি অধম অসুন্ন প্রকৃতি মানবের পর্য্যন্ত এমন কিছু গুণ আছে, যাহা একজন মহাসাধুরও নাই । অতি নগণ্য কীটেরও এমন কিছু গুণ থাকিতে পারে, যাহা হয়ত মহাপুরুষেরও নাই । অতি দরিদ্র ভগবান্ সকলকে সমান করিয়াছেন ।

প্রমজীবী, তুমি মনে করিতেছ, যাহার জীবনে ভোগ করিবার কিছু নাই, যাহার তোমার মত বুদ্ধি নাই, যে বেদান্ত দর্শনাদি বুঝিতে পারে না, তাহার শরীর কিন্তু তোমার মত কষ্টে অত কাতর হয় না । তুমি তাহাকে একরূপ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পার, পর দিনেই সে সুস্থ হইয়া উঠিবে । তাহার জীবন ইন্দ্রিয়-গত, কিন্তু সে সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগেই তৃপ্ত । সুতরাং তাহার জীবনে একদিকে যেমন সুখের অভাব, অপর দিকে তেমনি সুখের আধিক্য । সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহার জীবনেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে । অতএব ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক, ভগবান্ সকলকে অপকৃপাতিতা সহ-কারে সম্পূর্ণ সমান সুখ দিয়াছেন । অতএব মনে করিও না, অংমরাই জগতের উদ্ধার কর্তা । আমরা জগৎকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারি নটে, কিন্তু আমরাও জগতের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি । আমরা জগৎকে যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, জগৎ তাহার জ্ঞান এক্ষণে অপেক্ষা করিতেছে । যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে । মানবজাতিকে তরবারি বলে শাসন করিবার চেষ্টা ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ও অনাবশ্যক । তোমরা দেখিবে, যে সকল স্থান হইতে অত্যাধিক্যতা পাশবকলে জগৎ শাসন এই ভাবের উদ্ভব, সেই স্থানগুলিতেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়—সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায় । জড়শক্তির লীলাক্ষেত্রে ইউরোপ যদি নিজের ভিত্তি সরাইয়া আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে ৫০ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপীয় সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । উপনিষদের ধর্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে ।

আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিভিন্ন দর্শনের যতই মতভেদ থাকুক, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমন এক সাধারণ ভিত্তি আছে, যাহা

হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি—আত্মবিশ্বাস। সেই সাধারণ ভিত্তি এই—জীবাত্মার সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস। ভারতের সর্বত্র হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, সকলেই স্বীকার

করিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্বশক্তির আধারস্বরূপ। আর তোমরা বেশ জ্ঞান, ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি, পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ঐগুলি আমাদের জন্মগত সত্ত্ব—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতারূপ আবরণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা, তাহা অনাদি কাল হইতেই পূর্ণ, অচল, অটল স্মেরুবৎ। আত্মসংযম করিতে তোমার বহিঃ সাহায্যের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, তুমি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে অনাদি কাল হইতেই পূর্ণ সংযমী। এই কারণেই অবিদ্যাকেই সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্ ও মানবে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে? কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। ঐ ক্ষুদ্র কীট যে অতি কষ্টে চলিতেছে, তাহার মধ্যে—অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা, এমন কি সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান্ রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে—কারণ, ইহা আর কোথাও নাই। ইহাই আধ্যাত্মিকতা, ইহাই আত্মবিজ্ঞান। মানুষ কি বলে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? বীর্য্য—বীর্য্যই সাধুত্ব—দুর্জলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া, উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে—তবে উহা—অতী। যদি জগৎকে কোন ধর্ম্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই

জীবাত্মার অনন্ত শক্তিমত্তায় বিশ্বাসই সর্বসমস্যার মীমাংসায় সমর্থ। অতী। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই ‘অতী’ এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ

ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই দৃষ্টি, ভয় হইতেই যুক্তি, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে হয়? আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজ্যের রাজা মহারাজা, তুমি তাঁহার

উত্তরাধিকারী। তুমি সেই ঈশ্বরের অংশস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈত-বাদ মতে তুমিই স্বয়ং ব্রহ্ম, তুমি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি—আমরা ভেদ জানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি—আমি তোমা অপেক্ষা বড়, তুমি আমা অপেক্ষা বড়, আমরা কেবল এই করিতেছি। ‘আত্মার মধ্যে সকল শক্তি অন্তর্নিহিত’ ভারত জগৎকে এই মহা শিক্ষা দিবে। হৃদয় এই তত্ত্ব ধারণ করিলে তোমার নিকট জগৎ আর এক ভাবে প্রতিভাত হইবে—পূর্বে তুমি নরনারী ও অজ্ঞাত প্রাণীকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে, তখন অজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিবে। তখন এই পৃথিবী আর হৃদয়ক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হইবে না—তখন আর ইহা বোধ হইবে না যে, এ পৃথিবীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুর্ব্বলের উপর বলবানের জয় লাভের জন্ত নরনারীর জন্ম; তখন বোধ হইবে এ পৃথিবী আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র; স্বয়ং ভগবান্ বালকের ন্যায় এখানে খেলিতেছেন আর আমরা তাঁহার খেলার সঙ্গী, তাঁহার কার্যের সহায়ক। যতই ভয়ানক, যতই বীভৎস বোধ হউক, ইহা খেলামাত্র। আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এই ক্রীড়াকে একটা ভয়ানক ব্যাপার ভাবিতেছি। যখন আমরা আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, তখন অতি দুর্ব্বল, হতভাগ্য, অতি অধম পাপীর হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। শাস্ত্র কেবল বলিতেছেন, নিরাশ হইও না। তুমি যাহাই কর না কেন, তোমার স্বরূপের কখন পরিবর্তন হয় না; তুমি কখন তোমার প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে পার না। প্রকৃতি কখন প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে পারে না। তোমার প্রকৃতি শুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া তোমার এই স্বরূপ অব্যক্তভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু চরমে উহা আপন তেজে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই কারণেই ইহা সকলের নিকট আশার সংবাদ বহন করে, কাহাকেও নিরাশা সাগরে ডুবায় না। বেদান্ত, ভয়ে ধর্ম্ম করিতে বলে না। বেদান্ত বলে না যে, শয়তান সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে তোমার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, যদি তুমি একবার পদস্থলিত হও, অমনি তোমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

বেদান্তে শয়তানের প্রসঙ্গই নাই, বেদান্ত বলেন, তোমার অদৃষ্ট তোমার নিজের হাতে। তোমার নিজের কর্ম্মই তোমার এই শরীর গঠন করিয়াছে, কর্ম্মবাদ। অপর কেহ তোমার হইয়া তোমার শরীরগঠন করে নাই। সেই সর্বব্যাপী ভগবান্ অজ্ঞান বশতঃ অব্যক্ত রহিয়াছেন আর তুমি যে সমস্ত

সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, তাহার জন্ত তুমিই দায়ী। ভাবিও না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি এই জগতে আনীত হইয়া এই ভয়াবহ স্থানে স্থাপিত হইয়াছ। তুমি জান, তুমিই ধীরে ধীরে তোমার জগৎ রচনা করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ। তুমি নিজেই আহাৰ করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া আহাৰ করে না। তুমি যাহা খাও, তাহার সারভাগ তুমিই শরীরে শোষণ করিয়া লও, অপর কেহই তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি ঐ খাদ্য হইতে রক্ত, মাংস, দেহ প্রস্তুত করিয়া থাক, অপর কেহ তোমার হইয়া উহা করে না। তুমি বরাবরই ইহা করিতেছ। একটী দীর্ঘ শৃঙ্খলের এক পাবের গঠন প্রণালী জানিতে পারিলে সমুদয় শৃঙ্খলটিকেই জানিতে পারা যায়। যদি ইহা সত্য হয় যে, এক মুহূর্তও তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, তবে ইহাও সত্য যে, পূর্বেও প্রতি মুহূর্তে তুমি নিজ শরীর গঠন করিয়াছ, পরেও করিবে। আর ভাল মন্দ সবেরই দায়িত্বভার তোমার। ইহাই মহা ভরসার কারণ। আমি যাহা করিয়াছি, আমিই আবার তাহা নাশ করিতে পারি।

যদিও আমাদের শাস্ত্রে এই কঠোর কৰ্ম্মবাদ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের ধৰ্ম্ম ভগবৎরূপা অস্বীকার করে না। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবান্ শুভাশুভ রূপী এই ঘোর সংসার প্রবাহের অপর পারে ভগবৎ রূপা।

রহিয়াছেন। তিনি বন্ধনশূন্য, নিত্যদয়াময়, সৰ্ব্বদাই জগতের ত্রিতাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার সাগরের পরপারে লইয়া যাইবার জন্ত বাহ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। রামায়ণ বলিতেছেন—তাঁহার দয়ার সীমা নাই আর বিগুহচিত্ত ব্যক্তির নিকটই এই দয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

অতএব তোমরা দেখিতেছ, সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিতে তোমাদের ধৰ্ম্ম কিরূপ ভাবে সাহায্য করিতে পারে। যদি আমার অধিক সময় থাকিত, তবে আমি দেখাইতে পারিতাম, পাশ্চাত্য দেশ অদ্বৈতবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত হইতে এখনও কিরূপ শিক্ষা পাইতে পারে। কারণ, এই জড় বিজ্ঞানের দিনে সগুণ ঈশ্বর, দ্বৈতবাদ এ সকলের বড় একটা আদর নাই। তবে যদি কেহ খুব অমার্জিত অনুরক্ত ধৰ্ম্মপ্রণালীতেও বিশ্বাস করে, আমাদের ধৰ্ম্মে তাহাদেরও স্থান আছে। যদি কেহ এত মন্দির ও প্রতিমাদি চায়, বাহাতে জগতের সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে, যদি কেহ সগুণ ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল

বাসিতে চাহে, তবে আমাদের শাস্ত্র তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্যই করিবে । বলিতে কি, সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ উচ্চ ভাব ও তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, জগতের অল্প কোথাও সেরূপ দেখিতে পাইবে না । যদি কেহ আবার খুব যুক্তিবাদী হইতে চাহে, নিজের তর্কবুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহে, তবে আমরা তাহাকেও নিগুণ ব্রহ্মবাদরূপে প্রবল যুক্তিসহ মত শিক্ষা দিতে পারি ।”

বক্তৃতাস্তে স্বামীজি পুনরায় অভিনন্দনদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন ।

### মনমাতুরা অভিনন্দন ।

পরমকুড়ি হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজি মনমাতুরায় গেলেন । মনমাতুরা ও তৎসমীপবর্তী শিবগঙ্গার জমীদার ও অগ্রাচ্ছ অধিবাসিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন । প্রথমে এই স্থানে স্বামীজি আসিতে পারিবেন না, এই মর্মে তার করা হয় । ইহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন, স্বামীজির আগমনে সকলেই পরম পুলকিত হন ও আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন । অভিনন্দন পত্রের একস্থলে তাঁহারা বলেন, “পাশ্চাত্য উদরসর্ষের জড়বাদ যে সময়ে ভারতীয় ধর্মভাবসমূহের উপর তীব্র আক্রমণ করিতেছিল, সেই সময়ে আপনার তায় একজন শক্তিশালী আচার্য্যের অভ্যুদয়ে ধর্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের ধর্ম ও দর্শনরূপ অমূল্য স্বর্ণের উপর যে ধূলিরানি কিছুকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভার মুদ্রায়ত্ত্বের সাহায্যে প্রচলিত মুদ্রারূপে জগতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইবে । আপনি যেরূপ উদারভাবে চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় সমবেত অসংখ্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের স্থির বিশ্বাস,—আমাদের পূজনীয়া—মহারাগীর রাজসভা যেমন সূর্য্য অন্ত যান না, তেমনি আপনারও ধর্মরাজ্য সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইবে” ।

### মনমাতুরা অভিনন্দনের উত্তর ।

আপনারা আমাকে হৃদয়ের সহিত যে অভিনন্দন করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি আপনাদের যে কি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলাম, তাহা ভাষায় প্রকাশে অক্ষম । হৃৎকের বিষয়, আমার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও

আমার শরীরের অবস্থা এখন এমন নহে যে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করি। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধুটি আমার প্রতি অল্পগ্রহপূর্বক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তথাপি আমার একটা স্থূল শরীর আছে—হইতে পারে স্থূল শরীর ধারণ বিড়ম্বনা—কিন্তু উপায় নাই—আর স্থূল শরীর জড়ের নিয়মামুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থূল শরীরের ক্লাস্তি অবসাদ প্রভৃতি সবই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে আমার দ্বারা যে সামান্য কার্য্য হইয়াছে, তাহার জন্ত ভারতের প্রায় সকল স্থানেই লোকে যেরূপ অপূর্ব আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিবার জিনিষ বটে। তবে আমি ঐ আনন্দ ও সহানুভূতি কেবল এই ভাবে গ্রহণ করিতেছি:—আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে ষৎসামান্য কার্য্য হইয়াছে, যদি তাহার জন্ত সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহা দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন। ভারত ধর্ম্মভূমি। হিন্দু, ধর্ম্ম—কেবল ধর্ম্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু

ধর্ম্মই  
হিন্দুর জাতীয়  
জীবনের মূল  
ভিত্তি।

কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, ইহা সত্য। সকলেই দোকানদার হউক, বা স্থূল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে। সম্ভবতঃ আমরা এই জাতীয় ঐক্যতানের আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্ত বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত। আমাদের মহামহিমামণ্ডিত পূর্বপুরুষদের (যাঁহাদের বংশধর বলিয়া যে কোন জাতি গৌরব অনুভব করিতে পারে) নিকট হইতে উত্তরাধিকারহস্তে আমরা যে সকল মহান তত্ত্বরাশি পাইয়াছি, আমরা এখনও তাহা হারাই নাই, ইহাই দেখিয়া আমার মনে পরম আনন্দ হইতেছে। ইহাতে আমাদের জাতির ভারী উন্নতি সম্বন্ধে আমার আশা, শুধু আশা নহে, দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। আমার প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসার জন্ত আবার আনন্দ হয় নাই, আমাদের জাতীয় হৃদয় যে এখনও অটুট রহিয়াছে, ইহাতেই আমার পরমানন্দ। এখনও ভারতের জাতীয় হৃদয় লক্ষ্যশ্রষ্ট হয় নাই।

ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে—কে বলে সে মরিয়াছে? পাশ্চাত্যেরা আমাদের কৰ্ম্মকুশল দেখিতে চায়—কিন্তু ধৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় হৃদয় নিবদ্ধ নয় বলিয়া আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মনের মত কৰ্ম্মকুশলতা দেখাইতে পারি না। যদি কেহ আমাদের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে, আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়ানীল দেখিতে চাই, আমরাও তদ্রূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক, আমরা তাহাদেরই ত্রায় কৰ্ম্মী—আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে আদৌ পূৰ্ব্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতেই আমার বিশ্বাস হয় না।

আমাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি যে অটুট, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তথাপি এখন আমাকে গোটাকতক কড়া কথা বলিতে ভারতের বৰ্গ হইবে। আশা করি, তোমরা উহা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিবে। মান হৃদয়গার জ্ঞান আমরাই এই মাত্র তোমরা অভিযোগ করিলে যে, ইউরোপীয় জড়বাদ দায়ী। আমাদের একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু ইউরোপীয়দের দোষ নহে, প্রধানতঃ দোষ আমাদের। আমরা যখন বৈদান্তিক তখন আমাদের সৰ্ব্বদাই সব বিষয় ভিতরের দিক হইতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি আমরা নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে। যেমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ভারতের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রাচীন কালে বৌদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই খৃষ্টিয়ান প্রায় দশ লক্ষের অধিক হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—“যখন অনন্ত জীবন নির্বাহিণী নিকটেই বহিয়া সমাজের নিয়ন্তরে জানবিজ্ঞা-বাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় রের চেষ্টার অভাবই তাহাদের তৃষ্ণায় মরিবে কেন”? প্রশ্ন এই,—ইহাদের জ্ঞান হিন্দুধৰ্ম্ম পরিত্যাগের কারণ। আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সং বালিকার সম্মুখে শুনিয়াছিলাম—সে

অসং পথে পদার্পণ করিবার—বেস্তাহুতি অবলম্বন করিবার পূর্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাকে উক্ত পথে বাইতে নিবেদন করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, ‘এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহায়ত্ব পাইতে পারি। এখন আমার কেহই সাহায্য করিবে না, কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জ্ঞাত্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না’। আমরা এখন তাহাদের জ্ঞাত্য কীদ্বিধেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের জ্ঞাত্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমরা নিজেরা কি শিখিয়াছি, আর নিজেরা নিজের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া কতদূর উহার আলোক বিস্তারের সহায়তা করিয়াছি। আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ—আমাদেরই কর্ম। কাহারও দোষ দিও না, দোষ দাও আমাদের নিজের দোষকে। যদি তোমরা উহা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান কি খৃষ্টান ধর্ম, অথবা জগতের অন্য কোন বাদ কিছুই এখানে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইত না। যদি দেহ পাপ কুৎসিত ধাত্য, ও নানাবিধ অনিয়মের দ্বারা পূর্ণ হইতেই হীনবীর্য্য না হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার জীবাণু নরদেহ আক্রমণ করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি সর্বপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদ থাকিবে। আমরা ত তাহাদিগকে পূর্বে সাহায্য করি নাই। সুতরাং অপর জাতির উপর সমুদয় দোষ নিক্ষেপের পূর্বে প্রথমেই নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত, আর প্রতীকারের এখনও সময় আছে।

প্রথমেই ঐ যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীন কাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ৬০০৭০০ বৎসর ধরিয়া

আমরা ক্রমশঃ অনাবশ্যক বিষয় সমূহে অভিনিবিষ্ট হইয়া উচ্চ-  
তর প্রয়োজনীয় বিষয় তুলিয়াছি।

কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ। বড় বড় মন্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত যে, এক ঘটি জল খাব ডান হাতে কি বাঁ হাতে, হাত তিনবার ধোব না চারবার, কুলুকুচো করুব পাঁচবার কি ছয়বার। বাহারা সারা জীবন এইরূপ দুর্ব্বল প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় ও এই সকল ভ্রম সম্বন্ধে বড় বড় মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে



ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পার ? আমাদের ধর্মটা রান্নাঘরেই ঢুকিয়া সেই থানেই আশঙ্ক থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদাস্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল ‘ছুঃমার্গী’ আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি আর মন্ত্র ‘আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমি মহাপবিত্র’। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে। মন যখন জীবনের উচ্চতর তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহাকে মস্তিষ্ক দৌর্বল্যের নিশ্চিত লক্ষণ জানিতে হইবে। এই অবস্থায় মৌলিক তত্ত্ব গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় কার্য্যকরী ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়—তাহার বাহিরে সে আর যাইতে পারে না। প্রথমে এইগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মহাবীর্য্যের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ঐগুলি বাদ দিলেও যে ধনভাণ্ডার আমরা পূর্ব্বগুরুবদিগের নিকট উত্তরাধিকার স্বত্রে পাইয়াছি তাহা অক্ষুরন্ত থাকিবে। সমগ্র জগৎ সেই ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। উহা হইতে ধনরাশি বিতরণ না করিলে সমগ্র জগৎ

অনাহারে মরিবে। অতএব বিতরণে আর বিলম্ব করিও না। ব্যাস আমাদের সমগ্র জগৎকে বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম—তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান করিতে ধর্ম্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—বিদ্যাদান তাহার নিম্নে—তার পর হইবে।

প্রাণদান—সর্ব্বনিকৃষ্ট দান অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করিয়াছি—আমাদের ত্রায় দানশীল জাতি আর নাই। ভিক্ষুকের নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত একখানা রুটি থাকিবে, সে তাহার অর্দ্ধেক দান করিবে। এইরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে পাইবে। আমরা যথেষ্ট অন্ন দান করিয়াছি—একপক্ষে আমাদের অপর দুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান। যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ভাবের ঘরে এক বিন্দু চুরী না রাখিয়া কাষে লাগিয়া যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্তার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধমতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ত্রায় উন্নত হইবে।

এখন আমার যে টুকু বলিয়ার ছিল সর্ব-বলিয়ার। আমি আমার সঙ্কলিত কার্যপ্রণালী বলিয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসি না। কি করিতে ইচ্ছা করি না করি, মুখে না বলিয়া কাজে দেখাইতে আমার কার্যপ্রণালী।

আমি ভালবাসি। অবশ্য আমি একটা নির্দিষ্ট কার্য-প্রণালী স্থির করিয়াছি—যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, যদি আমার শরীর থাকে, তবে সঙ্কলিত বিষয়গুলি আমার কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা আছে। জানি না, আমি ক্লতকার্য হইব কি না, তবে একটা মহান আদর্শ লইয়া তাহাতেই মনপ্রাণ নিয়োগ—ইহাই জীবনের এক উচ্চ সার্থকতা। তাহা না হইলে এই ক্ষুদ্র পশুজীবন যাপনে ফল কি? জীবনকে এক মহান আদর্শের অনুবর্তী কবাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। ভারতে এই মহাকাব্য সাধন করিতে হইবে। এই কারণে ভারতের বর্তমান পুনরুজ্জীবনে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যদি বর্তমান শুভ মুহূর্তের সাহায্য আমি না লই, তবে আমি মহামুর্খের স্থায় কার্য করিব”।

### মাদুরা অভিনন্দন।

মন মাদুরা হইতে মাদুরায় আসিয়া স্বামীজি রামনাদের রাজার সুন্দর বাঙ্গালায় অবস্থান করিলেন। অপরাহ্নে একটা মধ্যমলের কেশে করিয়া স্বামীজিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল :—

পরম পূজ্যপাদ স্বামীজি,

মাদুরাবাসী আমরা হিন্দু সাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সহিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীৱন্ত উদাহরণ দেখিতেছি। আপনি সংসারের সমুদয় বন্ধন ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহান পরহিতব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ জীবনেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মের সহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, কেবল উন্নত দার্শনিক ধর্মই ত্রিতাপতাপিত জীবকে শান্তিদানে সমর্থ।

আপনি আমেরিকা ও ইংলণ্ড বাসীকে সেই ধর্ম ও দর্শনকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষাইয়াছেন, যাহা প্রত্যেক মানবকে তাহার নিজের অধিকার ও অবস্থা

অনুযায়ী উপায়ে উন্নতিপথে আরোহণে সাহায্য করে। যদিও গত চার বৎসর আপনি পাশ্চাত্যদেশবাসীকেই শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি এই দেশেও সেই সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কম আগ্রহসহকারে পাঠিত হয় নাই এবং উহা বিদেশাগত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জড়বাদের প্রভাবকেও সঙ্কুচিত করিতে কম সাহায্য করে নাই।

ভারত আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার কারণ, তাহাকে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনরূপ মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। কলি-যুগের অন্তর্কর্তী এই উপযুগের শেষভাগে আপনার আশ্রয় মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমরা নিশ্চিত বুঝিতেছি, শীঘ্রই অনেকানেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ব্রত উদ্‌ঘাপন করিবেন।

প্রাচীন বিদ্যার লীলাভূমি, সুন্দরেশ্বরদেবের প্রিয়, যোগিগণের পবিত্র ষাটশান্তক্ষেত্র এই মাছুরা, আপনি ভারতীয় দর্শনের যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পরমানন্দ প্রকাশে ও সমগ্র মনুষ্যজাতির যে অমূল্য উপকার সাধন করিতেছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহার স্বীকারে ভারতীয় অন্য কোন নগরীর পশ্চাদ্‌গামী নহে জানিবেন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া আপনাকে উদ্যম ও বল প্রদান করুন এবং জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রাখুন।

### মাছুরা অভিনন্দনের উত্তর।

‘আমার খুব ইচ্ছা যে কয়েকদিন আপনাদের নিকট থাকিয়া আপনাদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের আদেশমত আমার পাশ্চাত্যদেশের সমুদয় অভিজ্ঞতা ও বিগত চার বৎসর ধরিয়া আমার প্রচারকার্যে কি ফল হইল, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় বিবৃত করি। ছুঃখের বিষয়, সন্ধ্যাসিগণকেও দেহভার বহন করিতে হয়। বিগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আমি এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অদ্য অপরাহ্নেও বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে আর অন্ত্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্ত রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে ও আর একটু

সাবকাশ পাইলে আমাদের অতীত সমুদয় বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। অদ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। একটা কথা বিশেষভাবে আমার মনে উদয় হইতেছে। আমি এক্ষণে মাদুরায় আপনাদের স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বদেশবাসী উদারচেতা রামনদাধিপের অতিথি। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন, উক্ত রাজাই আমার মাধায় চিকাগো সভায় বাইবার ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং বরাবরই তিনি হৃদয়ের সহিত তাঁহার দ্বারা যতদূর সম্ভব আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং অভিনন্দনপত্রে আমাকে যে সকল প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে, তাহাঙ্গ অধিকাংশ এই দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপুরুষেরই প্রাপ্য। কেবল আমার মনে হয়, তিনি রাজা না হইয়া সন্ন্যাসী হইলেই ভাল ছিল, কারণ, তিনি সন্ন্যাসেরই উপযুক্ত।

যখনই জগতের অংশবিশেষে কোন জিনিষের আবশ্যক হয়, তখনই জগতের অপরাংশ হইতে তাহা গিয়া উহাকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া থাকে। কি ভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক উভয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের আদানপ্রদান।

ধর্মের অভাব হয়, এবং অপর কোথাও সেই ধর্ম থাকে, তবে আমবা জ্ঞাতসারে চেষ্টা করি বা না করি, যেখানে সেই ধর্মের অভাব, তথায় আপনাপনি ধর্মশ্রোত প্রবাহিত হইয়া উভয় স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। মানবজাতির ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একবার নহে, দুইবার নহে, কিন্তু বারবার এই প্রাচীন ভারতকে যেন বিধাতার নিয়মে জগৎকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইয়াছে। দেখিতে পাই, যখনই কোন জাতির দিশিঞ্জয় বা বাণিজ্যপ্রাধাত্তে জগতের বিভিন্ন অংশ একস্থলে গুথিত হইয়াছে এবং যখনই এক জাতির অপর জাতিকে কিছু দিবার সুযোগ হইয়াছে, তখনই প্রত্যেক জাতিই অপর জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক সাহায্য সাহা আছে, তাহাই দিয়াছে। ভারত সমগ্র জগৎকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্বেই ভারত জগৎকে আপন আধ্যাত্মিক সম্পদ প্রদান করিয়াছে। পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আর একবার এই ঘটনা হয়। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়কালে তৃতীয়বার। এই চতুর্থবার আবার ইংরাজের প্রাধাত্তকালে সে আপন বিধাতৃ-নির্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত হইতেছে। যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি,

পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য্যপ্রণালী ও বাহ্য সত্যতার ভাব আমাদের দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যদেশকে বহুয় ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমরাও পাশ্চাত্যদেশীয় জড়বাদপ্রধান সত্যতাপ্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্যসত্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। আমাদের পক্ষে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব শিথিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিথিতে হইবে, তাহা নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যত টুকু সাধ্য ভবিষ্যৎশীঘ্রদিগকে দেওয়া উচিত। এই আদর্শ-জগতের কখন আবির্ভাব হইবে কি না, তাহা আমি জানি না, এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখন আসিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখন আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে আর আমার—কেবল আমার কার্য্যের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে, একমাত্র তাহারই কেবল কায করিবার বাকি আছে, আর যদি সে নিজ কার্য্য সাধন করে, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে,—ভারতে ধর্মের এক প্রবল পুনরুত্থান হইয়াছে। ইহাতে খুব আনন্দের কারণ আছে বটে, কিন্তু আবার বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কারণ, ধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ানক গোঁড়ামিও আসিয়া থাকে। কখন কখন লোকে এত মধ্য পথ অবলম্বনায়। বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে যে, অনেক সময় যাঁহাদের চেষ্টায় এই পুনরুত্থান সাধিত হয়, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারাও উহা আর নিয়মিত করিতে পারেন না। অতএব পূর্বে হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের দুই

পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ, অপর দিকে জড়বাদ, ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার—যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূলভিত্তিতে পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটী হইতেই সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ, আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, স্মরণ উহাদের অনুকরণ রূপ। মনে কর, যদি তোমরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে পার, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অসম্ভব। সময়ের প্রারম্ভ হইতে, মানবজাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটী নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তুমি কি উহাকে উহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ের তুষারময় শৃঙ্গে লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয়গণের পক্ষে যদি কয়েক শতাব্দীর শিক্ষাসংস্কার পরিত্যাগ করা অসম্ভব বোধ কর তবে তোমাদের পক্ষে শত শত শতাব্দীর সংস্কার পরিত্যাগ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ,

ইহাও আমাদেরকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা দেশাচার ও ধর্ম্মের পার্থক্য।

সচরাচর যেগুলিকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কার পূর্ণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ দেশাচার অসংখ্য ও পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোনটী মানিব? কোনটী মানিব না? উদাহরণ স্বরূপ দেখ, দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে এক টুকরা মাংসখণ্ড খাইতে দেখিলে ভয়ে দৃশহাত পিছাইয়া যাইবে—আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত—পূজার জন্ত তিনি শত শত ছাগবলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দেশাচার আছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশাচারই স্থানবিশেষে আবদ্ধমাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তির তাহাদের নিজ নিজ পন্থীতে প্রচলিত আচারকেই আমাদের ধর্ম্মের সার বলিয়া মনে করে, ইহাই তাহাদের মহা ভ্রম।

ইহা ব্যতীত আরো কতকগুলি মুঞ্চিল আছে। আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এক প্রকার সত্য মাহুরার নিত্যস্বরূপ বিষয়ক জৈব, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক। অপর প্রকার কোন

বিশেষ দেশ কাল অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানতঃ আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে, দ্বিতীয় প্রকার সত্য স্মৃতি, সনাতন ও পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে। আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। চিরকালের জ্ঞান বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে বেদ ও স্মৃতি। কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। এক স্মৃতি বলিতেছেন, ইহাই দেশাচার, এই যুগে ইহারই অনুসরণ করিতে হইবে। অপর স্মৃতি আবার অন্যবিধ আচারের সমর্থন করিতেছেন। কোন স্মৃতিতে আবার সত্য প্রভৃতি যুগভেদে বিভিন্ন আচারের সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখ,—তোমাদের শাস্ত্রের এই মতটী কি উদার ও মহান! সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, স্মৃতির কালে কালে সেগুলির পরিবর্তন হয়। এইটী সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন সামান্য সামাজিক প্রথা পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকালই পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল। যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কোন, বড় সন্ন্যাসী বা রাজা বা অন্য কোন বড় লোক আসিলে ছাগ ও গোহত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল; ক্রমশঃ সকলে বুঝিল, আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী স্মৃতির ভাল ভাল ষাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গোহত্যা প্রথা রহিত করা হইল—গোহত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন আচারসকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সেগুলির পরিবর্তে অন্য বিধির প্রবর্তন করিতে হইয়াছে। ঐগুলিরও আবার পরিবর্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটীই বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু

স্বতির প্রাধাত্য যুগ পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্বতির প্রামাণ্য লোপ হইবে, আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন, সেই যুগের পক্ষে বাহা অত্যাশঙ্কীয়, বাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য ও পথ সমাজকে দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে আমরাদিগকে এই উভয় বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, আর আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একদিকে যেমন উহার ভাব—হৃদয়ের প্রশস্ততা আসিবে, অপরদিকে তেমনি দৃঢ়নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকিবে, তাহা হইলেই তোমরা আমার কথার মর্ম্ম বুঝিবে—তবেই বুঝিবে, আমার উদ্দেশ্য সকলকেই আপনাতর করিয়া লওয়া—কাহাকেও ত্যাগ করা নহে। আমি চাই—গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু, তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমরাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের চিরসঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে—হিন্দুই কেবল প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সাদা কথায় বলি, সব বিষয়ই আমরাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জ্ঞাত—গৌণ তত্ত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্তে অল্প প্রথাসকল প্রবর্তন না করা হয়, তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচার পদ্ধতি সমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে—অতিশয় প্রাচীন প্রথার কুৎসিৎ আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুই নিন্দা করিও না। করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীত কালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিবার সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না। বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ যে মহৎ কার্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জ্ঞাত তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আমরাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন সেনাপতি বা রাজা কোনকালে আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন না—ঋষিগণই চিরকাল আমাদের সমাজের নেতা। ঋষি



কাহারো ? তিনিই ঋষি যিনি ধর্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যাঁহার নিকট ঋষি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞা, বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্ক যুক্তি নহে,—  
 ঋষি হিন্দুসমাজের সাক্ষাৎ উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয়সত্যের সাক্ষাৎকার। উপনিষদ্  
 নেতা। বলিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সাধারণ মানবতুল্য নহে—মন্ত্রদ্রষ্টা—  
 ইহাই ঋষিত্ব। আর এই ঋষিত্বলাভ কোনরূপ দেশ কাল জাতি বা সম্প্রদায়ের  
 উপর নির্ভর করে না। বাৎসায়ন ঋষি বলিয়াছেন,—সত্যের সাক্ষাৎকার  
 করিতে হইবে আর আমাদেরকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাকে আমাকে  
 আমাদের সকলকেই ঋষি হইতে হইবে—অগাধ আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন হইতে  
 হইবে—আমরাই সমগ্র জগতে শক্তিসঞ্চার করিব—কারণ, সব শক্তি আমার  
 ভিতরে রহিয়াছে। আমাদেরকে ধর্ম সাক্ষাৎ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে  
 হইবে—তবেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। তখন ঋষিত্বের  
 উজ্জ্বল জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষ পদবী লাভ করিব।  
 তখন আমাদের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হইবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ ও  
 শক্তিসম্পন্ন। তখন আমাদের সম্মুখ হইতে মন্দ যাহা কিছু, তাহা আপনিই  
 পলায়ন করিবে—আমাদেরকে আর কাহাকেও নিন্দা বা অভিসম্পাত করিতে  
 হইবে না অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে না। এখানে আজ  
 যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তাঁহার নিজের ও অপরের মুক্তির  
 জন্ত ঋষিত্ব পদবী লাভ করিতে ভগবান্ সাহায্য করুন।’

### কুন্তকোণমের পথে—ত্রিচিনপল্লী ও তাজোর।

মাদুরায় অবস্থিতিকালে স্বামীজি একদিন এখানকার সুবিখ্যাত মন্দির  
 দর্শন করিতে গিয়াছিলেন—এই মন্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের  
 অন্যতম। ইহার স্থাপত্যকার্য্য অতি সুন্দর। মাদুরা হইতে স্বামীজি সন্ধ্যার  
 ট্রেনে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলযোগে কুন্তকোণম্ যাত্রা করিলেন। যে যে ষ্টেশনে  
 গাড়ী থামিতে লাগিল, তথায়ই দেখা গেল, শত শত ব্যক্তি স্বামীজিকে  
 দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। তাঁর ৪টার সময় গাড়ীখন ত্রিচিনপল্লীতে  
 পৌঁছিল, তখন দেখা গেল, প্রায় হাজার লোক ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে—  
 গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র তাহারা স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান  
 করিল। অভিনন্দনে তাহারা বলিল যে, আমরা আশা করিয়াছিলাম, আপনি  
 অন্ততঃ একদিন এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদেরকে কৃতার্থ করিবেন—

যাহা হউক, মাজাজবাসীরা যে আপনাকে শীঘ্রই পাইবে, ইহাই ভাবিয়া আমরা পরম আনন্দ বোধ করিতেছি। ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি এবং ছাত্রবৃন্দও স্বামীজিকে স্বতন্ত্র অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজিকে অবশ্য খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তাঞ্জোর ষ্টেশনেও স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত অনেক লোকের সমাগম হয়।

### কুন্তকোণম্ অভিনন্দন ।

কুন্তকোণমে পহঁছিয়া স্বামীজি তথায় তিন দিন রহিলেন। এখানে স্বামীজিকে দুইটী অভিনন্দন দেওয়া হয়। একটী কুন্তকোণম্নিবাসী সমগ্র হিন্দুর পক্ষ হইতে ও দ্বিতীয়টী উক্তস্থানের হিন্দু ছাত্রগণের পক্ষ হইতে। প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

‘পূজনীয় স্বামীজি,

পাশ্চাত্যপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহুমন্দিরশোভিত ও বিখ্যাত সাধুগণের নামের সহিত বিজড়িত এই পবিত্র ভূমিতে আপনার শুভাগমনে এই প্রাচীন ও ধর্মের জন্ত প্রসিদ্ধ কুন্তকোণম্ নগরের সমগ্র হিন্দু অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। আমেরিকা ও ইউরোপে আপনি আপনার ধর্মপ্রচারব্রতে, অদ্ভুতরূপে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। ঈশ্বর আপনাকে চিকাগোয় সমবেত জগতের প্রধান ধর্মসমূহের বাছা বাছা প্রতিনিধিগণের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে সমর্থ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম ও দর্শন উভয়ই এত উদার ও যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বর ও ধর্মসম্বন্ধে লোকের যত প্রকার আদর্শ হইতে পারে সমুদয়ের সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ। আমরা এই কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সহস্র বর্ষ ধরিয়৷ আমরা প্রাণের সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, সেই জগতের প্রাণ ও আত্মাস্বরূপ ভগবানের রূপায় সত্যেরই চিরকাল জয় হইয়া থাকে। আর আজ যে আমরা খ্রীষ্টিয়ানদের দেশে আপনার পবিত্র ধর্মপ্রচারব্রতের সফলতায় আনন্দিত হইতেছি, তাহার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা পরম ধর্মপরায়ণ হিন্দুজাতি যে অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পত্তি জগতের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ভারত ও ভারতেতর প্রদেশের লোকেরা তাহার সংবাদ পাইতেছে। আপনার প্রচারকার্য্যে সফলতায়

আপনার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা গুরুদেবের নাম আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—  
সভ্যজগতের সমক্ষে আমাদেরকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা  
ইহা দ্বারা আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি যে, অতীতকালে আমাদের  
পূর্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সমগ্র জাতি তাহার জন্য  
আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারি। আমরা যে গায়ে পড়িয়া  
অপরকে আক্রমণ করিতে যাই না, ইহা আমাদের সভ্যতার হীনতাহচক  
নহে। আমাদের মধ্যে যখন আপনার ঞ্চয় স্থিরবুদ্ধি, একনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ  
নিঃস্বার্থ কর্মী সকল রহিয়াছেন, তখন হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল  
ও আশাপ্রদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র জগতের ঈশ্বর, যিনি সকল  
জাতিরও ঈশ্বর, তিনি আপনাকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন। তিনি হিন্দুধর্ম  
ও দর্শনের আচার্য্যরূপে আপনার মহান্ ব্রত সাধনের জন্য আপনাকে দিন  
দিন সবল করুন—প্রতিদিন আপনার হৃদয়ে নূতন নূতন জ্ঞানের স্রোত  
প্রবাহিত করুন।’

স্বামীজি ইহার উত্তরে বেদান্ত সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা  
করেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

### কুন্তকোণম্ বক্তৃতা ।

গীতাকার বলিয়াছেন,—‘স্বল্পমপ্যস্ত ধর্মস্তা ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।’  
অল্পমাত্র কোন ধর্মকর্ম করিলে তাহাতে অতি মহৎ ফললাভ হয়—  
যদি এই বাক্যের সমর্থনের জন্য কোন উদাহরণের আবশ্যক হয়, তবে  
আমি বলিতে পারি, আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিপদে এই মহাবাক্যের  
উপলব্ধি করিতেছি। হে কুন্তকোণম্নিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ আমি কার্য্য  
অতি সামান্য করিয়াছি, কিন্তু কলঙ্কোয় নামিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে  
স্থানে আসিয়াছি, তথায়ই যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, তাহা  
আমার স্বপ্নের অতীত। সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে, হিন্দুজাতির পূর্বাগত  
সংস্কার ও ভাবের ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ, হিন্দু জাতির প্রকৃত  
জীবনীশক্তি, হিন্দুজাতির মূলমন্ত্রই ধর্ম।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঘুরিয়াছি—জগতের সম্বন্ধে  
আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক  
একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ।

রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও  
 ধর্মই আমাদের কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার  
 জাতীয় জীবনের মানসিক উন্নতিবিধান। কাহারও বা অল্প কিছু জাতীয়  
 মেরুদণ্ড। জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয়  
 জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমা-  
 দের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ  
 প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।

তোমাদের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, মাদ্রাজবাসীরা  
 অল্পগ্রহপূর্বক আমাকে আমেরিকায় যে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার  
 উত্তরে আমি একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্য  
 দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা ভারতের কৃষকগণ ধর্মবিষয়ে অধিক  
 শিক্ষিত। আজ আমি সেই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি—ঐ বিষয়ে  
 এখন আমার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন সময় ছিল, যখন ভারতের  
 সাধারণ লোকের মধ্যে জগতের সংবাদ জ্ঞানের এবং ঐ সংবাদসংগ্রহে  
 আগ্রহেরও অভাব দেখিয়া আমার দুঃখ হইত। এখন আমি উহার রহস্য বুঝি-  
 য়াছি। আমাদের দেশের লোকেও সংবাদ সংগ্রহে খুব ব্যাকুল তবে অবশ্য  
 যে বিষয়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ, সেই বিষয়ের সংবাদই সে চাহিয়া থাকে—  
 এ বিষয়ে বরং অত্যন্ত দেশের—যে সকল দেশ আমি দেখিয়াছি বা পর্যটন  
 করিয়াছি—সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহাদের আগ্রহ বেশী। আমাদের  
 কৃষকগণকে ইউরোপের গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন সকলের সংবাদ  
 জিজ্ঞাসা কর, ইউরোপীয় সমাজে যে সকল গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে,  
 তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তাহারা সে সকল বিষয়ের কিছুই জানে না,  
 জানিতে চাহেও না। কিন্তু সিংহলবাসী সেই কৃষককুল—(যে সিংহল একে-  
 বারে ভারতবর্ষভূত—ভারতের স্বার্থের সহিত যাহার বিশেষ সংস্রব নাই,)  
 দেখিলাম, তাহারাও জানিয়াছে যে, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা বসিয়াছিল,  
 তাহাদেরই একজন সেখানে গিয়াছিলেন, আর তিনি কিছু পরিমাণে  
 কৃতকার্যও হইয়াছেন! সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ে তাহাদের  
 হৃদয় আসক্ত, সেই বিষয়ে তাহারা জগতের অত্যন্ত জাতিসমূহের ত্রায়ী  
 সংবাদসংগ্রহে ব্যাকুল। আর ধর্মই ভারতবাসীর একমাত্র প্রাণের বস্তু—  
 আগ্রহের বস্তু।

ধর্ম জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি হওয়া উচিত অথবা রাজনীতি, এ বিষয়ে এখন আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভালই হউক মন্দই হউক, ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্থাপিত। তুমি কখন ইহার পরিবর্তন করিতে পার না। একটা জিনিষ নষ্ট করিয়া তাহার বদলে অপর জিনিষ বসাইতে পার না। একটা বৃহৎ বৃক্ষকে এক স্থান হইতে উপড়াইয়া অপর স্থানে তৎক্ষণাৎ পুঁতিয়া দিলে উহা যে তথায় জীবিত অবস্থায় থাকিবে, তাহা তুমি কখনই আশা করিতে পার না। ভালই হউক, মন্দই হউক, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বায়ু ধর্মের মহান আদর্শ সমূহে পূর্ণ রহিয়াছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, আমরা ধর্মের এই সকল আদর্শের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছি—ঐ ধর্মভাব এক্ষণে আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রাতি রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনী-শক্তিরূপ দাঁড়াইয়াছে। মহাতেজের বিকাশ না করিয়া, সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের ধাত রচনা করিয়াছে, তাহাকে না বুজাইয়া তোমরা কি সেই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পার? তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তি-স্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন পথে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কার্য্য করিতে পার—ধর্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ। এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।

অগ্ৰাভ্য দেশে অগ্ৰাভ্য পাঁচ রকম আবশ্যকীয় জিনিষের মধ্যে ধর্ম একটা। একটা চলিত উদাহরণ দিই—আমি সচরাচর এই দৃষ্টান্তটি দিয়া থাকি। অমুক সম্ভ্রান্ত মহিলার ঘরে নানা জিনিষ আছে—এখনকার ফ্যাশন—একটা জাপানী পাত্র (Vase) ঘরে রাখা—না রাখিলে ভাল দেখায় না—সুতরাং তাহাকে একটা জাপানী ভাস্ম রাখিতেই হইবে। এইরূপ আমাদের কর্তার বা গিন্নির অনেক কাজ, তার মধ্যে একটু ধর্মও চাই, তবেই সর্কার সম্পূর্ণ

হইল। এই কারণেই তাঁহাদের একটু আধটু ধর্ম করা চাই। জগতের অধিকাংশ লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির চেষ্টা—এক কথায় সংসার। ঈশ্বর ও ধর্ম তাহাদের নিকট সংসারেরই একটু সুখবিধানের জন্ত। তাহাদের নিকট ঈশ্বরের এইটুকু মাত্র প্রয়োজন। তোমরা কি শুন নাই, বিগত দুইশত বর্ষ হইতে কতকগুলি অজ্ঞ অধচ পণ্ডিতম্ভ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভারতীয় ধর্মের হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধে এই মাত্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে যে, উহা সাংসারিক সুখ নহে। দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের সুবিধা হয় না, উহার দ্বারা কাঞ্চন লাভ হয় না, উহাতে সমগ্র জাতিকে দস্যুতে পরিণত করে না, উহাতে বলবানকে গরিবের ঘাড়ে পড়িয়া তাহার রক্তপান করায় না। সত্যি আমাদের ধর্ম একরূপ করে না। ইহাতে অগ্ন্যান্ত জাতির সর্ব্বম লুণ্ঠন ও সর্ব্বনাশ সাধনের জন্ত পদতরে ভূকম্পকারী সৈন্তপ্রেরণের ব্যবস্থা নাই। অতএব তাঁহারা বলেন, এ ধর্মে আছে কি? উহা দ্বারা মিল চালান যায় না, অথবা উহা দ্বারা গায়ের জোরও হয় না। অতএব এ ধর্মে আছে কি? তাহারা স্পষ্টভাবে না যে, ঐ যুক্তির দ্বারাই আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়,—আমাদের ধর্মে সাংসারিক সুখ হয় না, সুতরাং আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। আমাদের ধর্ম এই একমাত্র সত্য ধর্ম, কারণ, আমাদের ধর্ম এই তিন দিনের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জগৎকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলে না। এই কয়েক হস্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই আমাদের ধর্মের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের ধর্ম এই জগতের সীমার বাহিরে—দূরে অতি দূরে দৃষ্টিান্বেষণ করে—সে রাজ্য অতীন্দ্রিয়—তথায় দেশ নাই, কাল নাই, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে অতি দূরে—সেখানে গেলে আর সংসারের সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না—তখন সমগ্র জগৎই সেই মহিমাময় ভূমা আত্মারূপ মহাসমুদ্রে বিন্দুতুল্য হইয়া যায়। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ, উহা ব্রহ্ম সত্য জগন্নিষ্ঠা এই উপদেশ দিয়া থাকে—আমাদের ধর্ম বলে কাঞ্চন লোষ্ট্র বা ধূলির তুল্য—যতই ক্ষমতা লাভ কর না কেন—সবই ক্ষণিক—এমন কি, জীবনধারণই অনেক সময় বিভ্রম্ভনামাত্র—এই হেতুই আমাদের ধর্ম সত্য। আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম, কারণ, সর্বোপরি উহা ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকে। শত শত যুগের সঞ্চিত জ্ঞানবলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের মহাজ্ঞানী প্রাচীন পুরুষগণের তুলনায়

যাহারা কালকের শিশুমাঝ, সেই সকল জাতির সমক্ষে স্মৃদু অথচ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া থাকে, “বালক, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস—কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভোগ অস্থায়ী—বিনাশই উহার পরিণাম; এই তিনদিনের ক্ষণস্থায়ী বিলাসের ফল—সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয় স্রুথের বাসনা ত্যাগ কর—ইহাই ধর্মলাভের উপায়।” ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তির সোপান, ভোগ নহে। এই হেতু আমাদের ধর্মই সত্য ধর্ম। বিশ্বের বিষয়, এক জাতির পর আর এক জাতি সংসার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মহাতেজের সহিত নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিয়াছে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের মৃত্যু ঘটয়াছে। কালসমুদ্রে তাহারা একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গও উৎপাদন করিতে পারে নাই—নিজেদের কিছু চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আমরা কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া কাক ভূষণীর মত বাঁচিয়া আছি আমাদের যে কখন মৃত্যু হইবে, তাহার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না।

আজকাল লোকে ‘যোগাত্মের উজ্জীবন’ বিষয়ক নূতন মতবাদ লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, যার গায়ের জোব যত

যোগাত্মকে? বেশী, সেই অধিক দিন জীবিত থাকিবে। যদি তাহাই প্রাচ্য না পাশ্চাত্য? সত্য হইত, তবে প্রাচীনকালের যে সকল জাতি কেবল

অগ্নাজ জাতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইয়াছে, তাহারা ই মহাগৌরবের সহিত আজও জীবিত থাকিত এবং আমরা—এই দুর্বল হিন্দুজাতি (জনৈক ইংরাজ যুবতী আমায় এক সময় বলেন, হিন্দুরা কি করিয়াছে? তাহারা একটা কোন জাতিকেও জয় করিতে পারে নাই!) সেই জাতি—যাহারা কখন অপর একটা জাতিকেও জয় করে নাই, তাহারা এখনও ত্রিশকোটি প্রাণী জীবিত রহিয়াছে। আর ইহাও সত্য নহে যে, উহার সমুদয় শক্তিই ক্ষয় হইয়াছে, ইহাও সত্য নহে যে, এই জাতির শরীরের সমুদয় অংশ জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহা কখনই সত্য নহে। এই জাতির এখনও যথেষ্ট জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যখনই উপযুক্ত সময় হয়, যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই এই জীবনীশক্তি মহাবতার ণায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমরা যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র জগৎকে এক মহাসমস্তাপূরণে আহ্বান করিয়াছি। পাশ্চাত্যদেশে সকলে এই চেষ্টা করিতেছে যে, সে কিসে জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী হইবে, আমরা এখানে এই সমস্তার

শ্রীমাংসায় নিযুক্ত যে, কত সামান্তের উপর আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারি। উভয় জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষ ও প্রভেদ এখনও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিবে। কিন্তু ইতিহাসে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, যদি বর্তমান চিত্রসূহ দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করা বিমুখমাত্র সম্ভব হয়, তবে দেখা যাইবে যে, যাহারা খুব অল্পের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও উত্তমরূপে আত্মসংযম করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আত্মে যুদ্ধে জয়ী হইবে। আর যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকেই ধাবমান, তাহারা আপাততঃ যতই তেজস্বী ও বীর্যবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মহুম্মাজীবনে, এমন কি, জাতীয়জীবনে সময়ে সময়ে একরূপ সংসারের উপর বিতুষা ভয়ানক প্রবল হইয়া থাকে। বোধ পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচারের সময় হয়, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ একটা সংসারে বিরক্তির ভাব আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের মহা মহা মনীষিগণ এখন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই

ঐশ্বর্য্যসম্পদের জগৎ প্রাণপণ চেষ্টা—এ সমুদয়ই বুঝা। তথাকার অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারীই তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রধান সভ্যতার এই প্রতিযোগিতা, এই সংঘর্ষে এই পাশবভাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আশা করিতেছেন, এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার আবির্ভূত হইবে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের এখনও দৃঢ় ধারণা—রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ইউরোপের সমুদয় অন্তরের একমাত্র প্রতীকারের উপায়। কিন্তু তাঁহাদের বড় বড় চিন্তাশীল লোকদের ভিতর অল্প আদর্শ আসিতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনৈতিক বা সামাজিক যতই পরিবর্তন কর না কেন, মহুম্মাজীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। যতই শক্তিপ্রয়োগ কর না কেন, শাসন-প্রণালীর যতই পরিবর্তন কর না কেন, আইনের যতই কড়াকড়ি কর না কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল জাতীয় অসৎ প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া তাহাকে সংপথে পরিচালনা করিতে পারে। তাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম—যদিও তাঁহারা উহার মর্ম্ম ভালরূপ বুঝেন না এবং যদিও উহা অনেক বিষয়ে মহৎ, তথাপি তাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে এতদিন যে ভাবে দেখিতেন, তাহা



তঁাহাদের নিকট এখন আর পর্যাপ্ত বোধ হইতেছে না। পুঁচাত্যদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের প্রাচীন দর্শনসমূহে, বিশেষতঃ বেদান্তেই তাঁহারা এতদিন যাহা খুঁজিতেছিলেন, সেই চিন্তাপ্রবাহ সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যপানীয় পাইতেছেন। আর ইহা কিছু বিশ্বয়ের বিষয় নহে।

জগতে যত প্রকার ধর্ম আছে, তাহার প্রত্যেকটিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ

তদ্ব্যবলম্বিগণ নানাবিধ অপূর্ণ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বেদান্তই একমাত্র ধাকেন। আমি তাহা শুনিয়া শুনিয়া ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত সার্বভৌমিক ধর্ম। হইয়া পড়িয়াছি। অতি অল্পদিনের কথা, আমার বিশেষ

বন্ধু ব্যারোজ সাহেব খ্রীষ্টধর্মই যে একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম, ইহা প্রতিপাদন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। আপনারা তাহাও নিশ্চিত শুনিয়াছেন। এখন বাস্তবিক সার্বভৌমিক ধর্ম কোন্টী হইতে পারে, সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাক। আমার ধারণা—বেদান্ত—কেবল বেদান্তই সার্বভৌমিক ধর্ম হইতে পারে, আর কোন ধর্মই নহে। আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিশ্বাসের যুক্তিপরিম্পরা বিবৃত করিব। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্মগুলিই তাহাদের প্রবর্তক বা প্রবর্তকগণের জীবনের সহিত জড়িত। সেই সকল ধর্মের যাবতীয় মত, শিক্ষা, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ। তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেই মতাদির প্রামাণ্য, তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই সেইগুলির সত্যতা—তাঁহাদের বাক্য বলিয়াই ঐ উপদেশগুলি লোকের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, সেই প্রবর্তকের জীবনের ঐতিহাসিকতার উপর যেন সেই কারণ, অগাধ ধর্ম সার্বভৌমিক ধর্ম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, বেদান্তের মূল সনাতন তত্ত্ব।

একবার ভাবিয়া দেওয়া যায়, তবে সমুদয় ধর্ম প্রাসাদটীই একেবারে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া যায়, আর উহার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। বাস্তবিকই বর্তমানকালে তথাকথিত প্রায় সকল ধর্ম প্রবর্তকের জীবনের সম্বন্ধেই তাই ঘটিয়াছে। আমরা জানি, তাঁহাদের জীবনের অর্ধেক ঘটনা লোকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে না, আর বাকি অর্ধেকের উপর বিশেষ সন্দেহ। আমাদের ধর্ম ব্যতীত জগতের অগাধ সকল

যড় বড় ধর্মই এইরূপ ঐতিহাসিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের ধর্ম কিন্তু কতকগুলি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন নরনারীই বেদের প্রণেতা বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। বেদে সনাতন তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঋষিগণ উহার আবিষ্কর্তা মাত্র। স্থানে স্থানে এই ঋষিগণের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু নামমাত্র। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, তাহাও আমরা জানি না। অনেকস্থলে তাঁহাদের পিতা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না আর প্রায় সকলেরই জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক এই ঋষিগণ নামের আকাজক্ষা করিতেন না। তাঁহারা সনাতন তত্ত্ব সমূহের প্রচারক ছিলেন এবং নিজেরা জীবনে সেই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজেরা আদর্শ জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন।

আবার যেমন আমাদের ঈশ্বর নিগুণ অথচ সগুণ, সেইরূপ আমাদের ধর্মও সম্পূর্ণ নিগুণ অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর আমাদের ধর্ম নির্ভর

কবে না, অথচ ইহাতে অনন্ত অবতার ও  
অথচ বেদান্তে অসংখ্য মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। আমাদের ধর্ম  
অবতারাদির স্থান আছে। যত অবতার, মহাপুরুষ, ঋষি প্রভৃতি আছেন, আর

কোন ধর্মের এত গুণ তাহাই নহে, আমাদের ধর্ম বলে—বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আরও অনেক মহাপুরুষ অবতারাদির অভ্যুদয় হইবে। ভাগবতে আছে—‘অবতারা হসংখ্যয়া’। স্মৃতরাং তোমাদের ধর্মের নুতন নুতন ধর্মপ্রবর্তক, অবতার ইত্যাদিকে গ্রহণ করিবার কোন বাধা নাই। এই হেতু ভারতের ধর্মঐতিহাসে যে সকল অবতার ও মহাপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ঐতিহাসিক নহেন, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম বিন্দুমাত্র আঘাত পাইবে না, উহা পূর্বের তায়ই দৃঢ় থাকিবে, কারণ, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নহে—সনাতন সত্যসমূহের উপর ইহা স্থাপিত। জগতের সকল লোককে জোর করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে মানাইবার চেষ্টা বৃথা। সনাতন ও সার্বভৌমিক তত্ত্বসমূহ লইয়াও অনেককে একমতাবলম্বী করা কঠিন। তবে যদি কখন জগতের অধিকাংশ লোককে ধর্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করা সম্ভব হয়, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে মানাইতে চেষ্টা করিলে তাহা হইবে না, বরং সনাতন তত্ত্ব সমূহে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে একমতাবলম্বী হওয়া সম্ভব। অথচ আমাদের ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের কথার

প্রামাণ্য ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকে—এ বিষয় আমি পূর্বেই বলিয়াছি ।

‘ইষ্টনিষ্ঠা’ রূপ যে অপূর্ণ মত আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে এই সকল অবতারণণের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা আদর্শ করিতে তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে । তুমি যে কোন অবতারকে তোমার জীবনের আদর্শ স্বরূপ ও বিশেষ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে পার, এমন কি, তুমি তাঁহাকে সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সনাতন তত্ত্বসমূহই যেন তোমার ধর্মস্বাধনের মূলভিত্তি হয় । এই বিষয়টী বিশেষ লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, যে অবতারই ইউন না কেন, বৈদিক সনাতন তত্ত্বসমূহের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াই আমাদের নিকট তাঁহারা মাত্ৰ ! শ্রীকৃষ্ণের ইহাই মাহাত্ম্য যে, তিনি এই তত্ত্বাত্মক সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক এবং বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাতা ।

জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ কথিত হইল :—বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম । দ্বিতীয় কারণ এই,

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহার বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত ।

উপদেশাবলির সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে । অতি প্রাচীনকালে দুইটি সমপ্রকৃতিক বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পথে জগতের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ।—আমি প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি । শেথোক্ত জাতি বাহ্য জগতের বিশ্লেষণ করিয়া সেই চরম লক্ষ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । প্রথমোক্ত জাতি অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন । আর তাঁহাদের এই বিশ্লেষণের ইতিহাসের নানা অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই দুই বিভিন্ন প্রকার চিন্তাপ্রণালী সেই অনন্ত লক্ষ্যের দিকে একই প্রকার প্রতিধ্বনি করিয়াছে । ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল বেদান্তীই—স্বাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে,—নিজ ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করিতে পারে । ইহা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে । আমাদের নিকট এবং যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন,

তাঁহাদের নিকট ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন, বেদান্ত অনেক শতাব্দী পূর্বেই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কেবল আধুনিক বিজ্ঞানে সেগুলি জড়শক্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিগণের পক্ষে বেদান্তের আলোচনার এই দ্বিতীয় হেতু—ইহার অদ্ভুত বিচারমহত্ব । আমাকে পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাল ভাল বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ । আমার সহিত ইহাঁদের একজনের বিশেষ পরিচয় আছে । তাঁহার এদিকে খাইবার বা যজ্ঞাগার হইতে বাহিরে যাইবার সাবকাশ নাই । এদিকে তিনি ঘণ্টাভর ধরিয়া আমার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতেছেন । ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, বেদান্তের উপদেশগুলি এতদূর বিজ্ঞানসম্মত বর্তমান যুগের অভাব আকাঙ্ক্ষা একরূপ সুন্দরভাবে উহা পূরণ করিয়া থাকে, আর আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে, তাহার সহিত উহার একরূপ সামঞ্জস্য যে; আমি উহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না ।

ধর্মসমূহ তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমরা তাহা হইতে যে দুইটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হই, তাহাদের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি । প্রথম তত্ত্বটি এই যে—সকল ধর্মই সত্য । দ্বিতীয় তত্ত্বটি এই :—জগতের সকল বস্তু আপাততঃ বিভিন্ন বোধ হইলেও সকলই এক বস্তুর বিকাশমাত্র । বাবিলোনিয়ান ও য়াহুদীদের ধর্মোতিহাস আলোচনা করিলে আমরা একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি । আমরা দেখিতে পাই, বাবিলোনিয় ও য়াহুদী জাতির মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দেবতা ছিল । এই সমুদয় পৃথক পৃথক দেবতার আবার

এক সাধারণ নাম ছিল । বাবিলোনিয়দিগের সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল—বাল । তন্মধ্যে উৎপত্তির ইতিহাস ।

বাল মেরোদক প্রধান । কালে এই একটা শাখা-জাতি সেই জাতির অন্তর্গত অত্যান্ত শাখাজাতিগুলিকে জয় করিয়া তাহাদিগকে আপনার সহিত মিশাইয়া লয় । তাহার স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, বিজ্ঞেতা জাতির দেবতা অত্যান্ত শাখাজাতির দেবতাগুলির শীর্ষস্থান অধিকার করে । সেমাইট জাতি যে তথাকথিত একেশ্বরবাদ লইয়া গৌরব করিয়া থাকে,

তাহা এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। যাহাদীর্ঘজাতির সমুদয় দেবতার সাধারণ নাম ছিল আলক। ইহাদের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির দেবতার নাম ছিল মোলক-রাতা। এই ইস্রায়েল জাতি ক্রমশঃ উহার সমশ্রেণীস্থ অন্যান্য কতকগুলি জাতিকে জয় করিয়া নিজেদের মোলককে অন্যান্য মোলকগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান মোলক বলিয়া ঘোষণা করিল। এইরূপ ধর্মযুদ্ধে যে পরিমাণ রক্তপাত, অত্যাচার প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন। পরবর্তীকালে বাবিলোনিয়েরা মোলকরাতার এই প্রাধান্য লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।

আমার বোধ হয়, ধর্মবিষয়ে পৃথক পৃথক জাতির প্রাধান্য লাভের চেষ্টা ভারতের সীমান্ত প্রদেশেও ঘটিয়াছিল। এখানেও আৰ্য্য জাতির বিভিন্ন

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| ভারত ও অন্যান্য দেশে         | শাখা সম্ভবতঃ পরস্পরের পৃথক পৃথক দেবতার           |
| বিভিন্ন জাতির দেবতার         | প্রাধান্য খ্যাপনে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু বিধির |
| প্রাধান্য লাভের চেষ্টার পৃথক | বিধানে ভারতের ইতিহাস যাহাদীদের ইতিহাসের          |
| পৃথক ফল—‘একং সদ্ধিপ্রা       | ভায় হইল না। বিধাতা যেন অন্যান্য দেশোপেক্ষা      |
| বহুধা বদন্তি।’               | ভারতকে পরধর্ম্যে বিধেবশুণ্ড ও ধর্মসাধনায় গরিষ্ঠ |

ভূমি করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কারণেই এখানে ঐ সকল বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। সেই ইতিহাসের অধিকার বহির্ভূত সুদূর অতীত যুগে, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনাককার ভেদে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতে একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়—জগতে এরূপ মহাপুরুষ সকলের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীনকালেই এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করেন—‘একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ ‘বাস্তবিক জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাতাবে বর্ণনা করেন।’ এরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখন উচ্চারিত হয় নাই, এরূপ মহান সত্য আর কখন আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্য আমাদের হিন্দুজাতির—জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—‘একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি’ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, যেন সর্বাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ মহত্তম সত্যটিকে সর্বাংশে ভালবাসি—তাই আমাদের দেশ পরধর্ম্যে

দেবরাহিত্যের দৃষ্টান্তরূপ মহিমাময় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে, কেবল এখানেই লোকে তাহাদের ধর্ম্মে ঘোরতর বিশ্বাসসম্পন্ন অপর ধর্ম্মাবলীর জন্তও মন্দির গির্জাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই পরধর্ম্মে দেবরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের বাহিরে এখনও কি ভয়ানক পরধর্ম্মব্ধে বর্ত্তমান, তাহা আপনারা কিছুই জানেন না। পরধর্ম্মব্ধে অনেক স্থানে এরূপ প্রবল যে,

পাশ্চাত্য দেশে  
পরধর্ম্মব্ধেবের প্রাধান্য।

অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে যে, হয়ত আমাকে বিদেশে হাড় কথানা দিয়া বাইতে হইবে।

ধর্ম্মের জন্ত একজনকে মারিয়া ফেলা—এ ত

তুচ্ছ কথা। আজ না হউক, এই মহাদৃষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলেই কালই এরূপ ব্যাপার অল্পশ্রুতি হইতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিলে সেই পাশ্চাত্য দেশবাসীকে সমাজচ্যুতি ও তাহার আত্মবিক্ষিপ্ত যত প্রকার গুরুতর নির্যাতন সম্ভব, সব সহ করিতে হয়। এখানে তাহারা খুব সহজে ফড় ফড় করিয়া আমাদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে। আমি যেমন পাশ্চাত্য দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলাম, আপনারাও যদি সেইরূপ তথায় গিয়া কিছুদিন বাস করেন, তবে জানিতে পারিবেন, সেখানকার বড় বড় অধ্যাপক পর্য্যন্ত (যাহাদের কথা আপনারা এখানে শুনিতে পান) ঘোরতর কাপুরুষমাত্র এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, সাধারণের সমালোচনার ভয়ে তাহার শতাংশের একাংশও মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না।

এই কারণেই জগৎকে এই পরধর্ম্মে দেবরাহিত্যরূপ মহান সত্য শিক্ষা করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার ভিতরে এই ভাব প্রবেশ করিলে উহার

আমাদিগকে জগৎকে ধর্ম্মে  
উদারতা শিক্ষা দিতে হইবে।

বিশেষ কল্যাণ হইবে। বাস্তবিকই এই ভাব

প্রবেশ না করিলে কোন সভ্যতাই অধিক দিন

স্থায়ী হইতে পারে না। গোঁড়ামি, রক্তপাত,

পাশব অত্যাচার এ সকল যত দিন না বন্ধ হয়, ততদিন সভ্যতার বিকাশই

হইতে পারে না। যতদিন না আমরা পরস্পরের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হই,

ততদিন কোনরূপ সভ্যতাই মাধা তুলিতে পারে না আর এই মৈত্রীভাব

বিকাশের প্রথম সোপান এই :—পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সহানুভূতি

প্রকাশ করা। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত

করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শুধু মৈত্রীভাবাপন্ন হইলেই চলিবে না—  
পরস্পরের ধর্মমত ও বিশ্বাস যতই পৃথক্ হউক, পরস্পরকে সকল বিষয়ে  
বিশেষভাবে সাহায্য করিতে হইবে। আমরা ভারতে ঠিক তাই করিয়া  
থাকি—এইমাত্র আপনাদিগকে আমি তাহা বলিয়াছি। এই ভারতেই কেবল  
হিন্দুরা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্ত চার্চ ও মুসলমানদের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে  
ও এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে। তাহারা যতই আমাদের  
ঘৃণা করুক, তাহারা যতই পাশব ভাব প্রকাশ করুক, তাহারা যতই নির্ভরতা  
প্রকাশ ও অত্যাচার করুক, তাহারা সচরাচর যেমন করিয়া থাকে, সেইরূপ  
আমাদের প্রতি যতই কুৎসিত ভাষার প্রয়োগ করুক, আমরা ঐ খ্রীষ্টিয়ানদের  
জন্ত গির্জা ও মুসলমানদের জন্ত মসজিদ নির্মাণ করিতে ছাড়িব না, যত দিন  
পর্যন্ত না প্রেমবলে উহাদিগকে জয় করিতে পারি, যতদিন পর্যন্ত না আমরা  
জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিতে পারি যে, ঘৃণা ও বিবেচনাপরায়ণ জাতি কখন  
দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না, ভালবাসার বলেই জাতীয় জীবন স্থায়ী  
হইতে পারে। কেবল পণ্ডিত ও শারীরিক শক্তি কখন জয়লাভ করিতে পারে  
না, ক্ষমা ও কোমলতাই সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে।

আমাদিগকে জগৎকে—ইউরোপ এবং সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তি  
গণকে—আর এক মহানু তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক  
আমাদিগকে জগৎকে আর এক একত্বরূপ এই সনাতন মহানু তত্ত্ব সম্ভবতঃ উচ্চজাতি  
তত্ত্ব শিখাইতে হইবে—সমগ্র অপেক্ষা নিয়মজাতির, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা  
জগৎ বহু প্রতীয়মান হইলেও সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের, বলবান্ অপেক্ষা দুর্বলের  
বাস্তবিক এক। পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। হে মাদ্রাজ বিখ-

বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, আপনাদিগের নিকট আর বিস্তারিত ভাবে  
বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ইউরোপের আধুনিক অনুসন্ধানপ্রণালী কিরূপে  
ভৌতিক হিসাবে সমগ্র জগতের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে, ভৌতিক দৃষ্টিতেই  
তুমি, আমি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি সবই অনন্ত জড়সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ  
স্বরূপ। আবার শত শত শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের  
জ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, শরীর ও মন উভয়ই জড়সমুদ্রে বা সমষ্টির মধ্যে  
কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজ্যমাত্র। আবার আর  
এক পদ অগ্রসর হইয়া বেদান্তে দেখান হইয়াছে, এই আপাত প্রতীয়মান  
জগতের একত্ব ভাবেরও পশ্চাতে যে স্বার্থ আত্মা রহিয়াছেন, তিনিও একমাত্র।

জগৎপ্রাণ্ডে একমাত্র আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন, সবই সেই এক সত্তামাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বাস্তবিক যে এই একত্ব রহিয়াছে, এই মহান্ তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন—অত্যাচ্ছ দেশের কথা দূরে থাকুক এদেশেও অনেকে এই অদ্বৈতবাদে ভয় পাইয়া থাকেন। এখনও এতদন্ততালম্বী অপেক্ষা এই মতের বিরোধীর সংখ্যাই অধিক। তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, জগৎকে আমাদের যদি কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মুক্ত জনসাধারণের উন্নতি। বানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যিক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।

যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যজাতি নিজেদের সমুদয় দর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ—তিনি যতই বা ঈশ্বর-অদ্বৈতবাদই নীতিবিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

তুল্য ব্যক্তি হউন না কেন তিনি যখন কাল জন্মগ্রহণ করিয়া আজই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন তাঁহার অনুমোদিত বলিয়াই কোন দর্শন বা নীতিবিজ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। দর্শন বা নীতির প্রামাণ্যের এই মাত্র কারণ নির্দেশ করিলে তাহা কখন জগতের উচ্চশ্রেণীস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাঁহারা কোন মনুষ্যের অনুমোদিত বলিয়া উহার প্রামাণ্য না মানিয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত দেখিতে চাহেন। নীতিবিজ্ঞানের এই সনাতন ভিত্তি সনাতন আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে—যে একমাত্র অনন্ত সত্য তোমাতে, আমাতে, আমাদের সকলের আত্মায় বর্তমান রহিয়াছেন। আত্মার অনন্ত একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূল ভিত্তিস্বরূপ—তোমাতে আমাতে শুধু ভাই ভাই সম্বন্ধ নহে—সাহিত্যে পর্যন্ত মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা অভিব্যক্ত—এবং বালকেরাও তোমাদের নিকট উহার প্রচার করিয়াছে—বাস্তবিকপক্ষে তুমি আমি এক। ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই এই একত্ব।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা যেমন এই মতের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, ইউরোপের পক্ষেও তদ্রূপ ইহার প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষেও ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় আজকাল যেদ্রুপ ভাবে রাজনৈতিক ও



সামাজিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝ হয়, অজ্ঞাতসারে এখনই তাহারা এই মহান্ তত্ত্বকেই ঐ সকলের মূলভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতেছে। আর হে বন্ধুগণ, আপনারা পাশ্চাত্যদেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সমূহের লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যের মধ্যে যেখানে মূলভিত্তি অদ্বৈতবাদ, যদিও মাহুষের স্বাধীনতা, অনন্ত স্বাধীনতার চেষ্টা অভি- সংস্কারকগণ অনেক ব্যক্ত, সেখানেই ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শসমূহও তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ। পরিস্ফুট। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকগণ তাঁহাদের

প্রচারিত ভাবসমূহের মূলভিত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কোন কোন স্থলে তাঁহারা আপনাদিগকে মৌলিক গবেষণাশীল বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ আবার নির্ভয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে কোন্ মূল হইতে তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে উহার নিকট স্বীকী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিল।

বন্ধুগণ, যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম, তখন আমি অদ্বৈতবাদই অধিক প্রচার করিতেছি, দ্বৈতবাদ বড় করিতেছি না, এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাইতাম। দ্বৈতবাদের প্রেম ভক্তি উগাসনার আমার মুখ্যভাবে অদ্বৈতবাদ যে কি অসীম অপূর্ণ পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা প্রচারের কারণ। আমি জানি, উহার অপূর্ণ মহিমা আমি সম্পূর্ণ

অবগত। কিন্তু বন্ধুগণ, এখন আমাদের আনন্দে ক্রন্দন করিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমরা যথেষ্ট কাঁদিয়াছি। এখন আর আমাদের কোমল ভাব অবলম্বন করিবার সময় নহে। এইরূপ কোমলতার সাধন করিতে করিতে আমরা এখন জীবন্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমরা তুলারালির স্রায় কোমল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া। এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্য সাধনে সমুদ্রের অভল তলে বাইতে হয়, যদিও সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক, আর অদ্বৈতবাদের মহান্ আদর্শ ধারণা করিয়া উহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই ঐ ভাবের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন কল্পা বাইতে পারে।

বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি  
 বিশ্বাসবিশ্বাসই সর্ববিধ দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে সকল  
 উন্নতির মূল। দেবতার আমদানি করিয়াছে, সেই সকল গুলিতেই

বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও, সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীৰ্য্যবান হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক। আমরা এই ত্রিশ কোটি লোক সহস্রবর্ষ ধরিয়া যে কোন মুষ্টিমেয় বিদেশী লোক আমাদের ভুলুঠিত দেহকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাদেরই পদানত হইয়াছি কেন? কারণ, উহাদের নিজেকে উপর বিশ্বাস আছে, আমাদের নাই। আমি পাশ্চাত্যদেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়সকল যে, মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই সকল বাজে কথায় না ভুলিয়া উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম? ইউরোপ ও আমেরিকা উভয়ই জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরদেশে তাহাদের মহান আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরাজ বালক তোমাকে বলিবে—‘আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।’ আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইউরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ কি এই কথা বলিতে পারে? কখনই নহে, বালকগণ কেন, বালকগণের পিতারা পর্য্যন্ত একথা বলিতে পারেন না। আমরা নিজেকে প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই কারণেই বেদান্তের অদ্বৈত ভাব প্রচার করা আবশ্যক—বাহাতে লোকের হৃদয় জাগরিত হয়, বাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই কারণেই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি আর আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে উহা প্রচার করি না, সার্বভৌমিক ও সর্বসাধারণের গ্রাহ্য হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আমি উহার প্রচার করিয়া থাকি।

এই অদ্বৈতবাদ এমন ভাবে প্রচার করা যাইতে পারে, বাহাতে দ্বৈতবাদী  
 অদ্বৈতবাদের সহিত অসঙ্গ  
 ষাধনও বড় কঠিন নহে। ভারতে এমন কোল  
 ধর্মপ্রণালী নাই, বাহাতে বলে না যে, ভগবান্ সকলের ভিতরে রহিয়াছেন।

আমাদের বেদান্তমতাবলম্বী বিভিন্ন বাদিগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মায় পূর্ণ হইতেই পূর্ণ পাত্রিতা, বীৰ্য্য ও পূর্ণত্ব অন্তর্নিহিত। তবে কাহারও কাহারও মতে এই পূর্ণত্ব যেন কখন কখন সঙ্কুচিত হইয়া যায় আবার অন্য সময়ে উহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও সেই পূর্ণত্ব আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদমতে উহা সঙ্কুচিতও হয় না, বিকাশপ্রাপ্তও হয় না, তবে উহা সময়ে সময়ে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে মাত্র। তাহা হইলেই কার্য্যতঃ দ্বৈতবাদের সহিত একরূপই দাঁড়াইল। একটী মত অপরটী অপেক্ষা অধিকতর ত্রাণ ও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু উভয় মতই কার্য্যতঃ প্রায় একই দাঁড়ায়। আর এই মূল তত্ত্বটির প্রচার জগতের পক্ষে অত্যাৱশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর আমাদের এই মাতৃভূমিতে ইহার যতদূর অভাব, আর কোথাও তত নহে।

বঙ্গুগণ, আমি তোমাদিগকে গোটাকতক কড়া কথা শুনাইতে চাই :—  
সংবাদপত্রে পড়া যায়—আমাদের একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন ইংরাজ খুন  
করিয়াছে অথবা তাহার প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার  
আমাদের দুর্দশার জন্ত  
করিয়াছে। অমনি সমগ্র দেশে হৈ চৈ পড়িয়া  
আমরাই দায়ী।

গেল—সংবাদপত্রে এই সংবাদ পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন  
করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল,—এ সকলের  
জন্ত দায়ী কে ? যখন আমি একজন বেদান্তবাদী, তখন আমি নিজেকে এ  
প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুজাতি অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ, সে নিজের  
মধ্যেই সকল বিষয়ের কারণানুসন্ধান করে। আমি যখনই আমার মনকে এ  
বিষয় জিজ্ঞাসা করি, কে ইহার জন্ত দায়ী, তখন প্রত্যেক বারই আমি এই  
উত্তর পাইয়া থাকি, ইহার জন্ত ইংরাজ দায়ী নহে, আমরাই আমাদের  
সর্বপ্রকার দুর্দশা, অবনতি ও দুঃখকষ্টের জন্ত দায়ী—আমরাই একমাত্র দায়ী।

আমাদের অভিজাত পূর্বপুরুষগণ আমাদের দেশের সাধারণ লোককে  
পদদলিত করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া  
পড়িল, এই অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ—  
আমরাই আমাদের দেশের  
নীচ জাতিকে নীচ করিয়াছি। তাহারা যে মলুষ্য, তাহাও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল।  
শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল  
কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস  
দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা গোলাম হইয়া জন্মিয়াছে—কাঠ কাটবার ও জল

তুলিবার জগুই তাহাদের জন্ম । আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়াপ্রকাশক ছ একটা কথা বলিতে যায়, তবে আমি দেখিতে পাই, আধুনিক কালের শিক্ষিতাভিমাত্রী আমাদের স্বজাতিগণ এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনরূপ কর্তব্য কর্ণে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ।

শুধু তাহাই নহে, আমি আরো দেখিতে পাই, উহারা পশ্চাত্য দেশের বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ ও তথাবিধ অন্যান্য কতকগুলি অকিঞ্চিংকর

বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ  
Hereditary transmission

মত কি সম্পূর্ণ সত্য ?

মতসহায়ে এমন সকল পণ্ড ও অস্মরোচিত হেতুবাদ  
সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহাতে দরিদ্রগণের  
উপর অত্যাচার করিবার ও উহাদিগকে আরও পণ্ড  
প্রকৃতিক করিয়া ফেলিবার অধিকতর সুবিধা হয় ।

আমেরিকার ধর্ম্মমেলায় অত্যাচারিত ব্যক্তিদের সহিত একজন নিগ্ৰো যুবকও আসিয়াছিল—সে খাঁটি আফ্রিকার নিগ্ৰো—সে একটা সুন্দর বক্তৃতা দিল । আমার ঐ যুবকটির সম্বন্ধে কৌতুহল হইল, আমি তাহার সহিত মধ্যো মধ্যো কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না । কিছুদিন পরে ইংলণ্ডে কয়েকটা আমেরিকানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা আমাকে ঐ যুবকটির এইরূপ ইতিহাস প্রদান করিল—  
‘এই যুবক আফ্রিকার মধ্যভাগস্থ জর্নৈক নিগ্ৰো দলপতির পুত্র ; কোন কারণে অপর একজন দলপতি ইহার পিতার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে এবং তাহাদের মাংস রন্ধন করিয়া খাইয়া ফেলে—  
সে এই বালকটিকেও হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিল ।  
বালকটি কেন ক্রমে পায়ন করিয়া অনেক কষ্ট সহ করিয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়—সেখান হইতে একটা আমেরিকান জাহাজে করিয়া সে আমেরিকায় আসিয়াছে ।’ সেই বালকটি এমন সুন্দর বক্তৃতা করিল ! এইরূপ ঘটনা দেখিয়া বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ মতে আর কিরূপে আস্থা থাকিতে পারে ?

হে ব্রাহ্মগণ, যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যা শিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থব্যয় কর । দুর্বলকে অগ্রে সাহায্য কর, কারণ, দুর্বলের সাহায্য করাই অগ্রে আবশ্যক । যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ

করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক, তাহাদিগেরই জ্ঞান শিক্ষক-ব্রাহ্মণ্যপেক্ষা শূদ্রের শিক্ষায় সমৃদ্ধ কর।  
সমৃদ্ধ নিযুক্ত করিতে থাক। আমার ত ইহাই জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। জাতিবর্ণ-নির্কিংশে, সবলতা দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকাকে গুনাও ও শিক্ষাও যে, সবল দুর্বল উচ্চনীচ নির্কিংশে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈশ্বরে বল—‘উত্তীর্ণত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরানু নিবোধত।’ উঠ, জাগো—

‘উত্তীর্ণত জাগ্রত’

যত দিন না চরম লক্ষ্যে পঁহছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ, জাগো—আপনাদিগকে দুর্বল ভাবিয়া তোমরা কে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ—উহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃত পক্ষে দুর্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর, তোমার ভিতর যে ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না। আমাদের জাতির ভিতর বোর আলম্ব, দুর্বলতা ও মোহ আসিয়া পড়িয়াছে। হে আধুনিক হিন্দুগণ, মোহজাল কাটাইয়া ফেল। ইহার উপায় তোমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে। তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর ও সর্বসাধারণকে উহা উপদেশ কর। ধোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শক্তি আসিবে, মহিমা আসিবে, সাধুত্ব আসিবে, পবিত্রতা আসিবে, যাহা কিছু ভাল সকলই আসিবে। যদি গীতার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগে, তবে তাহা এই দুইটী শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারস্বরূপ—মহাবলপ্রদ—

সমং সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যাৎশ্ববিনশ্রন্তং যঃ পশ্যাতি স পশ্যাতি ॥

সমং পশ্যান্ হি সর্কজ্জ সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যাশ্বনাস্থানং ততো যাতি পরাং গতিং ।

বিনাশশীল সর্কভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই ষথার্থ দর্শন করেন। কারণ ঈশ্বরকে সর্কজ্জ সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন।

স্মৃত্যং দেখা যাইতেছে, বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা এদেশে ও অন্তর্গত দেশেও যথেষ্ট লোকহিতকর কার্যের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এদেশে এবং অন্তর্গত সমগ্র মনুষ্যজাতির দুঃখমোচন ও জ্ঞানার্জন্য সর্বব্যাপিত ও সর্বভূতে উন্নতিবিধানের জন্ত পরমাত্মার সর্বব্যাপিতা ও সমভাবে অবস্থিত—এই সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতিরূপ অপূর্ব তত্ত্বের প্রচার করিতে হইবে। যেখানেই অন্তায় দেখা যায়, যেখানেই অজ্ঞান দেখা যায়, আমি আমার অভি-  
জ্ঞতা হইতে বুদ্ধিমান হই এবং আমাদের শাস্ত্রেও সে কথা বলিয়া থাকেন যে, ভেদবুদ্ধি হইতেই সমুদয় অশুভ এবং অভেদবুদ্ধি হইলে—সকল বিভিন্নতার মধ্যে বাস্তবিক এক সত্তা রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে—সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ।

তবে সকল বিষয়েই শুধু একটা আদর্শে বিশ্বাস এক কথা, আর দৈনিক জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় সেই আদর্শানুযায়ী পরিচালনা করা আর এক কথা। একটা উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া বেশ কথা—কিন্তু ঐ আদর্শে পঁহুঁছবার কার্যকর উপায় কৈ? এখানেই সমস্যা হইতেছে—সেই কঠিন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়—যাহা আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সর্বসাধারণের মনে বিশেষ ভাবে জাগিতেছে—সেই প্রশ্ন আর কিছুই নহে—জাতিভেদ ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ক সেই পুরাতন সমস্যা। আমি সমাজসংস্কারক নহি—সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট খুলিয়া বলিতে চাই যে, বিশ্বজনীন প্রেমের প্রচারক। আমি একজন জাতিভেদলোপকারী অথবা কেবল-মাত্র সমাজসংস্কারক নহি। জাতিভেদ বা সমাজসংস্কার বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই। তুমি যে কোন জাতি হও, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না। আমি কেবল সর্বভূতে প্রেম কর—এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি এবং সেই বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও সমত্বরূপ বেদান্তের মহানু তত্ত্বের উপর আমার এই উপদেশ প্রতিষ্ঠিত।

প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজসংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সংস্কারকগণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। ইহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য খুব ভাল এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি

প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন সংস্কারকগণের অকৃতকার্যতার কার্য—বিজাতীয় অমুকরণ স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বহুতাম্বল হইতে সহস্র বর্তমান সমাজের উপর তাঁর সহস্র বহুতাম্বল হইয়া গিয়াছে—হিন্দুজাতি ও হিন্দু গালিবর্ষণ। সত্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিযোপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বাস্তবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ বাহির করা বড় কঠিন নহে। এই নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণই ইহার কারণ। প্রথমতঃ, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি, অপর জাতিদের নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অমুকরণ মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কখনই কার্য্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার আন্দোলনসমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাহারও কল্যাণসাধন করিতে হইলে নিন্দা বা গালিবর্ষণের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। আমাদের সমাজে যে অনেক দোষ আছে, সামান্য বালকেও তাহা দেখিতে পাইতে পারে, আর কোন সমাজেই বা দোষ নাই? হে আমার পদদেশবাসিগণ, এই অবসরে তোমাদিগকে বলিয়া রাখি যে, আমি যে সকল জাতি দেখিয়াছি, জগতের সেই বিভিন্ন জাতি সমূহের তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের জাতিই মোটের উপর অত্যাশ্চর্য্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক এবং আমাদের সামাজিক বিধানগুলিই, তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিচার করিলে, মানবজাতিকে সুখী করিবার সর্বোপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। এই কারণে আমি কোনরূপ সংস্কার চাহি না।

উপায়—জাতীয় ভাবে আমার আদর্শ—জাতীয় পথে সমাজের উন্নতি, সমাজগঠন। বিস্তৃতি ও পরিণতি। যখন আমি আমার দেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তখন সমগ্র জগতে আমি এমন দেশ দেখিতে পাই না যাহা মানবমনের উন্নতিবিধানের জন্য এত করিয়াছে। এই কারণে আমি আমার জাতিকে কোনরূপ নিন্দা বা গালি দিই না। আমি আমার জাতিকে বলি,—‘যাহা করিয়াছ, বেশ হইয়াছে আরও ভাল করিবার চেষ্টা কর।’ এদেশে প্রাচীন কালে অনেক বড় বড় কায

হইয়াছে—মহত্তর কার্য্য করিবার এখন যথেষ্ট সময় ও অবকাশ রহিয়াছে ।

নিশ্চয়ই তোমরা জান আমরা একস্থানে চুপ  
'এগিয়ে যাও ।'  
করিয়া থাকিতে পারি না । যদি একস্থানে

বসিয়া থাকি তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য । হয় আমাদের সন্মুখে  
নয় পশ্চাতে যাইতে হইবে । হয় আমাদের উন্নতি করিতে হইবে  
নতুবা আমাদের অবনতি হইবে । আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীনকালে বড় বড়  
কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবনের  
বিকাশ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর কর্ম্মের দিকে অগ্রসর  
হইতে হইবে । এখন পশ্চাতে হটিয়া গিয়া অবনত হওয়া—ইহা কিরূপে হইতে  
পারে ? তাহা হইতে পারে না ; তাহা কখনই হইতে দেওয়া হইবে না ।  
পশ্চাতে হটিলে জাতির অধঃপতন ও মৃত্যু হইবে । অতএব অগ্রসর হও এবং  
মহত্তর কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর । ইহাই তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য ।

আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি । আমি সমাজের  
দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা  
অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতিবিধানের,  
জ্ঞা যে সর্ব্বদুঃসুখের প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই  
প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত কর ।  
আমার তোমাদিগকে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির

একত্ব ও মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরত্বভাব রূপ বৈদা-  
গামাদের পূর্বপুরুষগণের দ্বারা স্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে  
প্রবর্তিত সামাজিক বিধান- থাক । যদি আমার সময় থাকিত, তবে আমি  
সকলের চরম পরিণতিতেই তোমাদিগকে আনন্দের সহিত দেখাইয়া দিতাম যে,  
সমাজের সার্ব্বস্বত্ব উন্নতি ।

এক্ষণে আমাদের যাহা যাহা করিতে হইবে,  
তাহার প্রত্যেকটী আমাদের প্রাচীন স্বত্বিকারের সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বেই  
বলিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণে আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারে যে সকল  
পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এখনও ঘটবে, তাহা তাঁহারা বাস্তবিকই বুঝিতে  
পারিয়াছিলেন । তাঁহারাও জাতিভেদলোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিক-  
দিগের তায় নহে । তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে বুঝিতেন না যে, সহরের  
সব লোক মিলে একত্র মদ্যমাংস খাও অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলে  
যখন যেখানে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক আর দেশটাকে একটা পাগল গায়দে



পরিণত করুক অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যাভূসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে। এরূপ উন্নতজাতি ত আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণরূপ আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইউরোপে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত নিজ পূর্বপুরুষগণ যে হিন্দুশাস্ত্রের আদর্শ ব্রাহ্মণ। উচ্চবংশীয়, ইহা প্রমাণ করিতে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, আর বতকণ না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিতেছেন যে, পূর্বত নিবাসী, পথিকের সর্ব্বদলুপ্তনকারী কোন মহাঅত্যাচারী ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্বপুরুষ, ততকণ তাঁহারা কিছুতেই শাস্তি পাইতেছেন না। অপর দিকে আবার, ভারতের বড় বড় রাজবংশধরগণ কোপীনধারী, অরণ্যানিবাসী, ফল-মুলাহারী, বেদপাঠী কোন প্রাচীন ঋষি হইতে তদীয় বংশের উৎপত্তি—ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এখানে যদি তুমি কোন প্রাচীন ঋষিকে তোমার পূর্বপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই তুমি উচ্চজাতীয় হইলে—নতুবা নহে। সুতরাং আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অত্যাচ্ছন্ন জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন ও মহাত্ম্যগামী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। ব্রাহ্মণ আদর্শ আমি কি অর্থে বুঝিতেছি? আদর্শ ব্রাহ্মণই তাহাই, বাহ্যতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ। তোমরা কি শুন নাই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন আইন নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাহার বধদণ্ড নাই? একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ইহা যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ভাবে অবশ্য ইহা বুঝিও না, প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিক ভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁহারা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ ও উহাদের বিস্তারেই নিযুক্ত, যে দেশ কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা—সংস্কার ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর দ্বারা অধুষিত, সে দেশ যে সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে, এ আর কি আশ্চর্য্য কথা? এবম্বিধ জনগণের শাসনের জন্ত আর সৈন্তসামন্ত পুলিশ প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহাদের কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবার কি প্রয়োজন?

তাঁহারা সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা—তাঁহারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গরূপ—আর  
 আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, সত্যযুগে এই  
 সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহা-  
 জাতিই ছিলেন। ভারতে দেখিতে পাই, প্রথমে পৃথিবীর সকলেই  
 ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা  
 বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন—আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্য  
 যুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলে ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র  
 ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এবিষয়ে  
 আকর্ষণ করিতেছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন  
 আবার সকল জাতিকে করিয়া, আহারবিহারে যথেষ্টাচারিত। অবলম্বন  
 ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের  
 মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসা হইবে না, কিন্তু আমাদের  
 মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নিদেশ পালন করে, প্রত্যেকেই  
 যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই  
 এই জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসা হইবে। তোমরা আর্য্য, অনার্য্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ  
 অথবা অতি নীচ জাতি—যাহাই হও; ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি  
 তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের  
 প্রতিই এই এক আদেশ—এই আদেশ এই—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে  
 না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম  
 পরিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।  
 বেদান্তের এই আদর্শ সূত্র যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই  
 আদর্শসুত্রবায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের  
 ইহাই লক্ষ্য—ইহার উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ  
 ধার্মিক অর্থাৎ স্মৃতি, শৌচ, শাস্তি, উপাসনা  
 শুধু ভারত নহে, সমগ্র ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন  
 জগৎকে এই আদর্শসুত্রবায়ী করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসায়ুজ্য লাভ  
 গঠন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে পারে।  
 হইবে।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কি? আমি তোমাদিগকে  
 আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ, নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা  
 কোন সদ্‌দেশ্য সাধন হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া ত ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে

কিন্তু তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফল প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। কি উপায়ে এই মহান্ উদ্দেশ্য কার্যো পরিণত করা যাইতে পারে, ইহা একটা গুরুত্বর সমস্যা—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি বাহা বাহা করিতে চাই ও ঐ বিষয়ে দিন দিন আমার মনে যে সকল নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা সমুদয় বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে আমাকে একাধিক বক্তৃতা দিতে হইবে। অতএব অদ্য আমি এই স্থলে বক্তৃতার উপসংহার করিব—কেবল হে হিন্দুগণ, তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতীয় মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটা ছিদ্র হইয়াছে, হয়ত উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সন্তানসকলেরই প্রাণপণে এই ছিদ্র সকল বন্ধ করিবার ও পোতের জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা আবশ্যিক। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এ দিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত হইয়া নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া ইতিকর্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। মনে কর, লোকে আমার কথা অগ্রাহ্য করিল, তথাপি আমি তাহাদিগকে গালি বা অভিশাপ দিব না। আমাদের জাতি অতীত কালে মহৎ কৰ্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমরা মহত্তর কার্য্য না করিতে পারি, তবে একত্রে শাস্তিতে ডুবিয়া মরিব—ইহাতেই আমরা সাঙ্ঘনা লাভ করিব যে, আমরা একত্র মিলিয়া মরিয়াছি। স্বদেশহিতৈষী হও; যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্ত এত বড় বড় কাষ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়।—তোমরা শুদ্ধ শান্ত সংস্খভাব। আর তোমরাই চিরকাল অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছ—এই মায়াময় জড়জগতের ইহাই মহা প্রহেলিকা। তা হউক, তোমরা উহা গ্রাহ্য করিও না—আত্মের আধ্যাত্মিকতার জয় হইবেই হইবে। এতদবসরে আমাদের কার্য্য করিতে হইবে—আমাদের দেশের নিন্দা করিলে চলিবে না—এই আমাদের পরম পবিত্র মাতৃভূমির বাত্যাহত, কৰ্ম্ম-

জীর্ণ আচার ও প্রথাসকলের নিন্দা করিও না। অতি কুসংস্কারপূর্ণ ও অর্থোক্তিক প্রথাসকলের বিরুদ্ধেও একটা নিন্দাসূচক কথা বলিও না—কারণ, সেগুলি দ্বারাও অতীতে আমাদের কিছু না কিছু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি কিন্তু এখানে উহার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অল্প কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা, সাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর। তোমাদের মুখ বন্ধ হউক, হৃদয় খুলিয়া যাক। এই দেশ এবং সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধন কর—তোমাদের প্রত্যেককেই ভাবিতে হইবে যে, সমুদয় ভার তোমারই উপর। বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক—প্রত্যেক জীবাত্মায় গৃহভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগাও। তাহা হইলেই, তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে, যে, তুমি মহাকাৰ্য্যের জন্ত জীবনযাপন করিয়াছ ও মহাকাৰ্য্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, এই মহাকাৰ্য্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

কুন্তকোণম্ হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে পূর্বের গ্রাম প্রায় সকল ষ্টেশনেই স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত সমবেত জনতা দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ মায়াবরম্ নামক ষ্টেশনে লোকসংখ্যা অতিশয় অধিক হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে ষ্টেশন প্লাটফরমে এক অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। স্বামীজি উহার উত্তরে বলিলেন, তিনি এমন কিছু বড় কাৰ্য্য করেন নাই—অপর যে কেহ তাঁহা অপেক্ষা ভাল কাৰ্য্য করিতে পারিতেন। তথাপি তাঁহারা যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র কাৰ্য্যেরও কৃতজ্ঞতাসহকারে অনুমোদন করিতেছেন, তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, অল্প কোন সময়ে তিনি মায়াবরমে আসিবার চেষ্টা করিবেন। মহা উৎসাহধ্বনির মধ্যে ট্রেন চলিয়া গেল।

## মান্দাজ ।

মায়াবরন্ হইতে স্বামীজি মান্দাজে পঁহছিলেন। যখন ট্রেন মান্দাজে পঁহ-  
ছিল, তখন দেখা গেল, অনেক সহস্র ব্যক্তি স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার  
জন্ত সমবেত হইয়াছে। এই সকল লোক স্বামীজিকে লইয়া তাঁহার গাড়ীর  
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল—রাস্তায় তাঁহার সম্মানার্থ স্থানে স্থানে প্রায় ১৭টী রুহং  
রুহং গেট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খানিকটা আসিয়া গাড়ীর ঘোড়া থুলিয়া  
দেওয়া হইল। লোকেরাই গাড়ী টানিয়া স্বামীজিকে কার্গান ক্যাসল নামক  
রুহং প্রাসাদে লইয়া গেল। এই স্থানেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীজি মান্দাজে যে দিন পঁহছিলেন, তাহার পরবর্তী রবিবারে মান্দাজ  
অভ্যর্থনা সমিতি স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করিলেন। উহার সমগ্র-  
টীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

### মান্দাজ অভিনন্দন ।

পূজ্যপাদ স্বামীজি,

আমরা আপনার মান্দাজবাসী সমধর্মাবলম্বী হিন্দুগণের পক্ষ হইতে  
পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের পর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আপনাকে  
হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। অভিনন্দন করিতে হয় বলিয়া অথবা  
অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করিতেছি না। ঈশ্বরকৃপায়  
ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া  
আপনি যে সত্যপ্রচাররূপ মহান্ কার্যের বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ  
হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা  
প্রকাশের জন্তই আমাদের এই চেষ্টা। চিকাগোয় যখন ধর্মমহাসভার  
আয়োজন হইল, তখন আমাদের কতকগুলি স্বদেশবাসীর স্বভাবতই এই  
আগ্রহ হইল যে, উক্ত মহাসভায় আমাদের এই মহান্ ও প্রাচীন ধর্মও যেন  
উপযুক্তরূপে আলোচিত হয়—যেন মার্কিন জাতির ও তাহাদের সাহায্যে সমগ্র  
পাশ্চাত্য জাতির নিকট আমাদের ধর্ম যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঠিক এই  
সময়ে আপনার সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমরা তখনই  
সকল জাতির ইতিহাসে চিরকাল ধরিয়া যে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ

সময় হইলেই উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা আবার উপলব্ধি করিলাম। যখন আপনি উক্ত ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে স্বীকার পাইলেন, তখন আপনার অপূর্ণ শক্তিসকলের পরিচয় পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত চিরস্থায়ী ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি অতি দক্ষতার সহিত উহার সমর্থন করিবেন। আপনি যেক্ষণ স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধভাবে হিন্দুধর্মের সনাতন মত সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু উক্ত মহাসভার সভ্যগণের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য নরনারী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধর্মনির্ধারণকারী অমরত্ব ও প্রেমরূপ সলিল পান করিলে আমরা লভ্য হইতে পারি ও সমগ্র মানবসমাজ পূর্ণাঙ্গ অধিকতর, পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর উন্নতির ভাগী হইতে পারে, যাহা জগতে আর কখনও ঘটে নাই। ধর্মসম্বন্ধে হিন্দুধর্মের বিশেষজ্ঞাপক মতটীর প্রতি জগতের অন্তান্ত মহান ধর্মসমূহের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রকৃত শিক্ষিত ও সত্যানু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে এখন আর এরূপ বলা সম্ভব নহে যে, সত্য ও পবিত্রতা কোন বিশেষ স্থানে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিম্বা উহা কোন বিশেষ মত বা সাধন প্রণালীর একচেটিয়া অধিকার অথবা কোন বিশেষ মত বা দর্শন অথবা সকল গুলিকে নিরাস ও বিনাশ করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ভগবদগীতার অন্তর্নিহিত মধুর সম্বন্ধভাব সম্যক্রূপে প্রকাশ করিয়া আপনার অনন্তকরণীয় মধুর ভাষায় বলিয়াছেন--‘সমগ্র ধর্মজগৎ বিভিন্ন প্রকৃতি নরনারীর, বিভিন্ন অবস্থাচক্রের মধ্য দিয়া এক লক্ষ্যের দিকে গতি যাত্রা।’ আপনার উপর অর্পিত এই পবিত্র ও মহান কার্যভার সমাপন করিয়াই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও আপনার স্বধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ আনন্দ ও ধন্যবাদ সহকারে আপনার কার্যের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যদেশে গিয়া ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রাচীন উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতির নিকট জ্ঞানালোক ও শান্তির সুসমাচার বহন করিয়াছেন। সেদাস্ত ধর্ম যে বিশেষভাবে যুক্তিসহ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আপনি আমাদের ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য স্থায়ী বিভিন্ন শাখাবিশিষ্ট একটা কর্মপ্রধান ‘মিশন’ প্রতিষ্ঠারূপে যে গুরুতর

কার্যভার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে আমাদের বিশেষ আনন্দ বোধ হইতেছে। আপনি যে ধার্মিক আচার্যাগণের পবিত্র পথের অনুসরণ করিতেছেন, এবং যে মহান্ আচার্য্য আপনার জীবনে শক্তিসঞ্চার করিয়া উহার উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, আপনিও সেই উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই মহান্ কার্য্যে আপনার সমগ্রশক্তি নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আশা করি, যেন ঈশ্বরকৃপায় আমরাও এই মহান্ কার্য্যে আপনার সহযোগী হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারি। আমরা সেই সর্ব-শক্তিমান্ ও পরম দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও পূর্ণ শক্তি প্রদান করেন আর আপনার কার্য্যকে যেন সনাতন সত্যের শিরোভূষণের উপযুক্ত গৌরব ও সিদ্ধির মুকুট দানে আশীর্বাদ করেন।

খেতড়ি মহারাজ প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র ।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার নিরাপদে ভারতে আগমন ও মাল্ভাজে আপনার অভ্যর্থনার সংবাদ পাইয়া আমি যত অগ্রে সম্ভব, আপনার অভিনন্দন করিব, এই ইচ্ছা-বশতঃ এই অবকাশে আপনার নিরাপদে আগমনে আমার পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। পাশ্চাত্যদেশের মনীষিগণ এই বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান যে সকল স্থলে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়া আর তাহাকে সেই সকল স্থল হইতে হঠাইতে পারে নাই (যদিও বিজ্ঞান কখন প্রকৃত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই)। সেই পাশ্চাত্য দেশে আপনার নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে যে মহতী সফলতা লব্ধ হইয়াছে, তজ্জন্ত এই অবকাশে আমি আমার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি পরম সৌভাগ্যবশতঃই চিকাগোর ধর্ম্ম মহাসভায় পাঠাইবার জন্ত আপনার ত্রায় একজন মহাপুরুষকে উপযুক্ত প্রতিনিধিরূপে পাইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যদেশ

\* রাজপুতনার অন্তর্গত, জয়পুর হইতে ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী, খেতড়ি নামক স্থানের রাজা অজিৎসিং স্বামীজির আমেরিকা যাত্রার পূর্বেই তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। স্বামীজির মাল্ভাজে আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুল্লি জগমোহন লালকে স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্ত এই অভিনন্দন পত্র সহ মাল্ভাজে পাঠাইয়া দেন।

যে জানিতে পারিয়াছে যে, এখনও ভারতে আধ্যাত্মিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, আপনার অসীম জ্ঞান এবং অপার উদ্যোগ ও উৎসাহই তাহার একমাত্র কারণ । আপনার কার্যের ফলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদান্তের সাংগৌলমিক আশ্রয়ে জগতের বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্মমত সমূহের সামঞ্জস্য সাধন হইতে পারে আর ইহাও আপনি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জগৎসী সকলেরই এই তত্ত্বগুলি বুঝা এবং বুঝিয়া কার্যে পরিণত করা আবশ্যিক যে, বহুদে একত্বই জগৎজনায় প্রকৃতির নিয়ম এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় ও ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পর সহানুভূতি ও সহায়তা দ্বারা মনুষ্যজাতির জীবনত্রয় উদ্ভাপিত ও চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । আপনার জ্ঞান বিশুদ্ধতাব্য মহাপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে এবং আপনার মহান উপদেশাবলির জীবনপ্রদ শক্তিতে বর্তমানযুগের লোক আমরা জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় দেখিয়া ধন্ত হইয়াছি । আশা করি, এ যুগে গোঁড়ামী, ঘৃণা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকিবে না ; উহাদের পরিবর্তে শান্তি, সহানুভূতি ও প্রেম মনুষ্যসমাজে রাজত্ব করিবে । আমি, আমার প্রজাবর্গের সহিত একযোগে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার ও আপনার কার্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ধিত হইতে থাকুক ।”

অভিনন্দনপত্রগুলি পাঠ হইবার পর স্বামীজি হল হইতে উঠিয়া গিয়া পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত একখানি গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিলেন । অন্ততঃ দশ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে সকলে স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে না পাইয়া গাড়ীর দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল । স্মরণীয় রীতিমত সভা হইবার কোন সম্ভাবনাই রহিল না । যাহা হউক, স্বামীজি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ভবিষ্যতে তাহার অত্যাশ্চর্য বক্তব্য ভাল করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল ।

### মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর ।

ভক্তমহোদয়গণ,

একটা কথা আছে,—মানুষ নানাবিধ সংকল্প করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে যাহা ঘটবার ঘটিয়া থাকে । ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, অভ্যর্থনা ইংরাজী ধরণে হইবে । কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বিধান কার্য হইতেছে—গীতার ধরণে আমি রথ হইতে ইতস্ততোবিচক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছি ।



অতএব এরূপ যে ঘটিল, তজ্জগৎ আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে বক্তৃতার জোর হইবে, আমি তোমাদিগকে বাহা বলিতে যাইতেছি, সেই কথাগুলির ভিতর একটা শক্তি আসিবে। আমি জানি না, আমার স্বর তোমাদের সকলের নিকট পৌঁছাইবে কি না। তবে আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। ইহার পূর্বে আর কখন আমার খোলা ময়দানে বড় সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ হয় নাই। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত লোকে আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ণ সদয় ব্যবহার করিয়াছে, যেরূপ পরম আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীই যেরূপ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি কল্পনায়ও এরূপ অভ্যর্থনা পাইবার আশা করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কেবল আনন্দই হইতেছে, কারণ, ইহা দ্বারা পূর্বে বার বার আমার দ্বারা উক্ত দেই কথারই সত্যতা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রত্যেক জাতিরই জীবনীশক্তি এক এক বিশেষ বিশেষ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক জাতিই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে।

আর ধর্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। পৃথিবীর অগ্ৰাঙ্ক স্থানে অগ্ৰাঙ্ক অনেক কাষের মধ্যে ধর্ম একটা; প্রকৃত পক্ষে উহা জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। যথা,—ইংলণ্ডে ধর্ম তাহাদের রাজনীতির অংশ বিশেষ মাত্র। ইংলিশ চার্চ ইংলণ্ডের রাজবংশের অধিকারভুক্ত, সুতরাং ইংরাজেরা উহাতে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উহা তাহাদের চার্চ মনে করিয়া তাহারা উহার পোষকতা ও ব্যয়নির্বাহাদি করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারই উক্ত চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যিক। উহা ভদ্রতার পরিচায়ক। অগ্ৰাঙ্ক দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যেখানেই কোন প্রবল জাতীয় শক্তি দেখা যায়,—উহা হয় রাজনীতি বা কোনরূপ বিদ্যাচর্চা বা সমরনীতি বা বাণিজ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সেই স্থলেই সেই সেই জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। সেইটাই তাহার মুখ্য জিনিষ—এতদ্ব্যতীত তাহাদের অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ আছে—ধর্ম তাহাদের মধ্যে অগ্রতম। এখানে, এই ভারতে ধর্মই জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থলী। ঐ ভিত্তির উপরই জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব, এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাও এখানে গৌণ মাত্র—ধর্মই সুতরাং এখানকার একমাত্র কাব্য—একমাত্র চিন্তা। ভারতীয় জনসাধারণ জগতের কোন সংবাদ রাখে না, শত শত বার আমি এ কথা শুনিয়াছি,—কথা সত্য।

কলঙ্ঘায় যখন নামিলাম, তখন দেখিলাম, ইউরোপে যে সকল গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে মন্ত্রিসভার পতন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ লোক কোন সংবাদ রাখে না। তাহাদের মধ্যে একজনও সোশিয়ালিজম ( Socialism ) এনার্কিজম ( Anarchism ) \* প্রভৃতি শব্দের এবং ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেই সেই পরিবর্তনজ্ঞাপক শব্দগুলির অর্থ কি, তাহারা ভাষা জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চিকাগোর ধর্মমহাসভায় একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, একথা সিংহলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা শুনিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের বা সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহের অভাব নাই, তবে সেই সংবাদ তাহাদের উপযোগী হওয়া চাই, তাহাদের জীবনযাত্রায় যে সকল বিষয় অত্যাৱশ্যক, তদনুযায়ী কিছু হওয়া চাই। রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখন ভারতীয় জীবনের অত্যাৱশ্যক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় নাই—ধর্ম অবলম্বনেই কেবল ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে এবং উহার সহায়তায়ই ভবিষ্যতে উহা জীবনধারণ করিবে।

জগতের সকল জাতি দুইটা বড় বড় সমস্তার সমাধানে নিযুক্ত। ভারত

উহার মধ্যে একটীর মীমাংসায় এবং জগতের

ত্যাগ না ভোগ ?

অন্যত্র সকল জাতি অপরটীর মীমাংসায় নিযুক্ত।

এখন প্রশ্ন এই—এই দুই পথের মধ্যে কোনটা জয়ী হইবে ? কিসে জাতি-বিশেষ দীর্ঘজীবন লাভ করে, কিসেই বা অপর জাতি অতিশীঘ্র বিনাশপাপ্ত হয় ? জীবনসংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে ? ভোগের জয় হইবে, না, ত্যাগের জয় হইবে ? জড় জয়ী হইবে, না, চৈতন্য জয়ী হইবে ? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকযুগের, অনেক পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেক্রপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিম্বদন্তীও যে অতীতের ঘনাককার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আগাদের মহিমাময় পূর্বপুরুষগণ এই সমস্তাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাহারা

\* এনার্কিজম—এই মতটী সোশিয়ালিজমেরই বিশিষ্ট বিকাশ। সকল বিষয়েই কোন বাহ্য শাসনাধীনে না থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন এই সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র। যে কোন উপায়েই হউক, ক্ষমতাস্বামী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন এবং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার লাভ ইহাদের লক্ষ্য।

জগতের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া যাহা কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই—ত্যাগ প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদের কাছে জানাইতেছে—শূণ্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জ্ঞান পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূণ্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান জাতি—অনেক দূরদৃষ্টি, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও (যাহা জগতের অপর কোন জাতির মস্তকে পড়ে নাই,) এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ, এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—আর ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম কি করিয়া থাকিতে পারে?

ইউরোপ এই সমস্তার অপর দিক্ মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে—মন্টুস্কি কতদূর ভোগ করিতে পারে—কোন উপায়ে—  
প্রতিযোগিতা ও ভালমন্দ যে কোন উপায়ে—মানুষ কত অধিক  
বর্ণাশ্রমধর্ম। ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন,

সহানুভূতিশূন্য প্রতিযোগিতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। আমরা কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম দ্বারা এই সমস্তার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—এই বর্ণাশ্রমধর্মের দ্বাৰাই প্রতিযোগিতার নাশ হয়, উহাই উহার শক্তিকে ধ্বংস করে, উহাই উহার নিষ্ঠুরতা হ্রাস করায়, উহা দ্বাৰাই এই রহস্যময় জীবনের মধ্য দিয়া মানবাত্মার গমনপথ সরল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

এই সময়ে এমন গোলযোগ হইতে লাগিল যে, কেহ আর স্বামীজির কথা শুনিতে পায় না। সুতরাং তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন :—

‘বন্ধুগণ, আমি তোমাদের অদ্ভুত উৎসাহ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে করিও না, আমি তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র স্থায়ী উৎসাহের প্রয়োজন। অসন্তুষ্ট হইতেছি। বরং তোমাদের উৎসাহ প্রকাশে আমি বড়ই সুখী হইতেছি। ইহাই চাই—প্রবল উৎসাহ। তবে ইহাকে স্থায়ী করিতে হইবে—সময়ে ইহা রক্ষা করিতে হইবে। যেন এই উৎসাহান্বিত কখন নিবিয়া না যায়। আমাদের কাছে ভারতে বড় বড় কাৰ্য্য করিতে হইবে। তাহার জ্ঞান আমি তোমাদের সাহায্য চাই। এইরূপ উৎসাহ আবশ্যক। আর সভার কার্য্য চলা অসম্ভব। তোমাদের

সদয় ব্যবহার ও সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্ত আমি তোমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা অল্প সময় ধীরে সুস্থিরে পরস্পর আমাদের চিন্তাবিনিময় করিব। বন্ধুগণ, এক্ষণে বিদায়।

সকলদিকে তোমরা যাহাতে শুনিতে পাও, এইরূপভাবে বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অল্প অপরাহ্নে আমাকে দেখিয়াই তোমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। বক্তৃতা সুবিধামত অল্প সময়ে ভবিষ্যতে হইবে। তোমাদের সোৎসাহ অভ্যর্থনার জন্ত আবার তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।’

স্বামীজি মাল্লাজে আর পাঁচটী বক্তৃতা দেন—সকলগুলিরই একে একে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :—

### আমার সমরায়োজন ।

সেদিন অতিরিক্ত ভিড়ের দরুন বক্তৃতা সমাপ্ত করিতে পারি নাই, সুতরাং আজ এই অবসরে আমি মাল্লাজবাসিগণের নিকট বরাবর যে সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। অভিনন্দন পত্রসমূহে আমার প্রতি যে সকল সুন্দর সুন্দর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি কক্রূপে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা জানি না, তবে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে উহাদের যোগ্য করেন আর আমি যেন আমার সারা জীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে পারি আর প্রভু যেন আমাকে এই কার্যের যোগ্য করেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, আমার সকল দোষ সত্ত্বেও আমার ক্রিষ্ণ সাহস আছে। ভারত হইতে পাশ্চাত্য-আমার ‘বার্তা’ বহন। দেশে আমার কিছু বার্তা বহন করিবার ছিল—আমি নির্ভীকচিত্তে মার্কিন ও ইংরাজ জাতির নিকট সেই বার্তা বহন করিয়াছি। অন্ধকার বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি তোমাদের সকলের নিকট সাহস-পূর্বক গোটাকতক কথা বলিতে চাই। কিছুদিন হইতে কতকগুলি ব্যাপার এমন দাঁড়াইতেছে, যাহাতে আমার কার্যের উন্নতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে; এমন কি, সম্ভব হইলে আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিয়া আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ, এই সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে—আর এইরূপ চেষ্টা চিরদিনই বিফল হইয়া থাকে। কিন্তু গত তিন বর্ষ হইতে দেখিতেছি, কতকগুলি ব্যক্তির আমার ও আমার কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে। যত দিন আমি বিদেশে ছিলাম, ততদিন আমি চুপ করিয়াছিলাম, এমন কি, একটা কথাও বলি নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মাতৃভূমিতে দাঁড়াইয়া আমার এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ কথাগুলির কি ফল হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না; এ কথাগুলি বলার দরুন তোমাদের দ্বারা কি ভাবের উদ্রেক হইবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি লোকের মতামত কখনই গ্রাহ্য করিয়া থাকি। ৪ বৎসর পূর্বে আমি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে সন্ন্যাসিবশে তোমাদের সহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম—আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি—সারা দুনিয়া আমার সামনে এখনও পড়িয়া আছে।

আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই—আমি এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিব। প্রথমতঃ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) সম্বন্ধে আমার গুটি-থিওজফিক্যাল সোসাইটি। কতক কথা বলিবার আছে। ইহা বলাই বাহুল্য যে, থিওজফিক্যাল সোসাইটি দ্বারা ভারতে কিছু পরিমাণে ভাল কায হইয়াছে। ইহার জন্ম প্রত্যেক হিন্দুই ইহাদের নিকট, বিশেষতঃ মিসেস বেসান্তের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। মিসেস বেসান্ত সম্বন্ধে যদিও আমার অল্পই জানা আছে, তথাপি আমি যতটুকু জানি, তাহাতেই আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে, তিনি আমাদের মাতৃভূমির একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষী আর তিনি সাধারনসারে প্রাণপণে আমাদের দেশের উন্নতিবিধানের জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্ম প্রত্যেক যথার্থ ভারতসন্তান তাঁহার প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ—এবং তাঁহার ও তৎসম্পর্কীয় সকলের উপরই ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হউক। কিন্তু এ এক কথা আর থিওজফিষ্টদের সমিতিতে যোগ দেওয়া আর এক কথা। ভক্তিশ্রদ্ধা ভালবাসা এক কথা আর কোন ব্যক্তি যাহা কিছু বলিবে সমুদয় তর্কযুক্তি না করিয়া, বিচার না করিয়া, বিনা-বিশ্লেষণে গিলিয়া ফেলা আর এক কথা। আর এক কথা চারি দিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে—আমি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যে সামান্য কার্য্য করিয়াছি, থিওজফিষ্টগণ তাহাতে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা

এই জগতে—উদার ভাব এবং মতভেদ সত্ত্বেও সহানুভূতি সম্বন্ধে অনেক লক্ষ্য লক্ষ্য কথা শুনিতে পাই। বেশ কথা, কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সব কথায় বিশ্বাস করে, ততক্ষণই সেই ব্যক্তি তাহার সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকে। যখনই সে তাহার সহিত কোন বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইতে সাহসী হয়, তখনই সেই সহানুভূতি চলিয়া যায়, ভালবাসা উড়িয়া যায়।

আর কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহাদের নিজেদের এক একটা স্বার্থ আছে। যদি কোন দেশে এমন কিছু ব্যাপার হয়, যাহাতে তাহাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তবে তাহাদের ভিতর যতদূর সম্ভব, ঈর্ষ্যা ও ঘৃণার আবির্ভাব হয় ; তাহারা 'তখন কি করিবে, কিছুই তাবিয়া পায় ব্রাহ্মসমাজ ও মিশনারি।

না। হিন্দুরা নিজেদের ঘর নিজেরা সাফ করিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণের কি ক্ষতি? হিন্দুরা প্রাণপণে নিজেদের সংস্কারসাধনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্তান্ত সংস্কার সভাসমূহের কি অনিষ্ট হইবে? হিন্দুদের সংস্কারচেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহারা কেন হইবেন? ইহারা কেন এই সকল আন্দোলনের প্রবলতম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন? কেন? আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। আমার বোধ হয়, তাহাদের ঘৃণা ও ঈর্ষ্যার পরিমাণ এত অধিক যে, এ বিষয়ে তাহাদের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আর এক কথা। আমি সমাজসংস্কারকগণের মুখপাত্র পড়িলাম যে,— তাহারা বলিতেছেন—আমি শূদ্র আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই— আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর—যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্মরাজ্য চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন আর যাঁহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্রিয়।

শূদ্র ও সন্ন্যাস।

যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্তান্ত কার্য্য ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালা দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ

ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল। আমাদের তিন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার। আমার এ কথাগুলি বলিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল এইটুকু দেখান যে, আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিবার আছে। আমাকে শূদ্র বলিলে আমার কোন দুঃখ নাই। আমার পূর্বপুরুষগণ দরিদ্রের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ স্বরূপ হইবে।

যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ, আমি যাহার শিষ্য—তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক নীচ জাতির গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? ব্রাহ্মণ আবার সন্ন্যাসী—তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন—ইহাতে কি সে কখন সম্মত হইতে পারে?

সুতরাং ইনি গভীর রাত্রে অজ্ঞাতভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পাইখানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন। দিনের পর দিন তিনি এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি আপনাকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুরা এইরূপেই সর্বসাধারণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা ইহাতে বৈদেশিক ভাবের কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। বিশ বৎসর

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এমন চরিত্র খাটি হিন্দু ও সংস্কারক।

গঠিত হইয়াছে যে, বন্ধুর কিছু লোকমাগ্ন হইয়াছে বলিয়া, সে তাহার অর্ধোপাঙ্গনের বিঘ্নস্বরূপ দাড়াইবে মনে করিয়া বিদেশে তাহাকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। আর খাটি পুরাণো, দিশী হিন্দুধর্মের অনুসরণে লোকের কি অবস্থা হয়, অপরটি তাহার উদাহরণ। আমাদের সংস্কারকগণের মধ্যে কেহ সেই জীবন দেখান, নীচজাতির পাইখানা সাফ ও চুল দিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হউন। তবেই আমি তাঁহার

পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব, কিন্তু তাহার পূর্বে নহে। হাজার হাজার লক্ষ্য কথার চেয়ে এতটুকু কাণের দাম ঢের বেশী।

এক্ষণে আমি মাদ্রাজের সংস্কার সভাসমূহের কথা বলিব। তাঁহারা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আমার প্রতি অনেক মাদ্রাজের সংস্কার সমিতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশের এবং মাদ্রাজের সংস্কারকগণের মধ্যে যে

সমূহ। একটা প্রভেদ আছে, সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন আর আমি এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত। তোমাদের মধ্যে অনেকের নিশ্চিত স্মরণ আছে যে, তোমাদিগকে আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, মাদ্রাজের এক্ষণে বড় সুন্দর অবস্থা। বাঙ্গালায় যেমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে এখানে তদ্রূপ হয় নাই। অনেক স্থলে এবং কতক পরিমাণে বাঙ্গালা দেশে পুনরুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাদ্রাজে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে উন্নতি হইতেছে। সুতরাং এখানকার সংস্কারকগণ যে উভয় জাতির প্রভেদ দেখাইতেছেন, সেই বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদের এক বিষয়ে প্রভেদ আছে—গেটি তাঁহারা বুঝেন না। আমার আশঙ্কা হয়, কতকগুলি সংস্কার সমিতি আমাকে ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া অনাহার-মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, যে ব্যক্তির এতদিন ধরিয়া কাল কি খাইবে, কোথায় গুইবে, তাহার কিছু ঠিক ছিল না, তাহাকে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি একরূপ বিনা আচ্ছাদনে তাপমান যন্ত্রের শূণ্য ডিগ্রির ৩০ ডিগ্রি নীচের শীতে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিল, যাহার সেখানেও কাল কি খাইবে তাহার ঠিক ছিল না, তাহাকে ভারতে এত সহজে ভয় দেখান যাইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগকে প্রথমেই বলিতে চাই যে, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, আমার নিজের একটু দৃঢ়তা আছে। আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে— আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যতের জন্ত কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্তা বহন করিব।

সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড়



সংস্কারক । তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই—আমুন্স সংস্কার । আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কারের  
আমাদের সংস্কারপ্রণালী— প্রণালীতে । তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া  
বিনাশ নহে, সংগঠন । ফেলা, আমার—সংগঠন । আমি সংস্কারে বিশ্বাসী  
নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী । আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে  
বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ও দিকে নয়' বলিয়া  
আদেশ করিতে সাহস করি না । আমি কেবল সেই কাঠবিড়ালের মত  
হইতে চাই, যে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় তাহার যথাসাধ্য এক অঞ্জলি  
বালাকা বহন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল । ইহাই আমার  
ভাব । এই অদ্ভুত জাতীয় যন্ত্র শত শত শতাব্দী ধরিয়া কার্য্য করিয়া  
আসিতেছে । এই অদ্ভুত জাতীয় জীবননদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত  
হইতেছে । কে জানে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে, এ ভাল কি মন্দ বা  
কিভাবে ইহার গতি নিয়মিত হওয়া উচিত । সহস্র সহস্র ঘটনাক্রমে  
ইহাকে এক বিশিষ্টরূপ বেগবিশিষ্ট করিয়াছে—তাই সময়ে সময়ে উহা মুহু  
ও সময়ে সময়ে দ্রুত গতিবিশিষ্ট হইতেছে । কে ইহার গতি নিয়মিত করিতে  
সাহসী হইতে পারে ? গীতার উপদেশানুসারে আমরাদিগকে কেবল কার্য্য  
করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া  
শান্তচিত্তে অবস্থান করিতে হইবে । উহার পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যিক, তাহা  
উহাকে দিয়া যাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অধুষায়ী আপনার দেহ গঠন  
করিয়া লইবে ; কাহারও সাধ্য নাই যে, এইরূপে তোমার দেহগঠন কর  
বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে পারে ।

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে । অত্যাচার সমাজেও তদ্রূপ যথেষ্ট  
দোষ আছে । এখানে বিধবার অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া  
থাকে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের বায়ু—হনুড়া  
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ কুমারীগণের দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে বিষাক্ত হইয়া  
উভয়েই দোষগুণ বিদ্যমান । আছে । এখানে জীবন দারিদ্র্য-বিষে জর্জরিত,  
তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মতপ্রায় ; এখানে লোকে না  
ধাইতে পাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, তথায় আহার্য্যভব্যের অতিরিক্ত  
প্রাচুর্য্যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে । দোষ সর্বত্র বর্তমান । ইহা  
পুরাতন বাতরোগের মত । পা হইতে বাত দূর করিলে, মাথায় বাত ধরিল ;

মাথা হইতে উহা তাড়াইলে, তখন আবার উহা অগ্ৰ আশ্রয় লইল।

কেবল এখান হইতে ওখানে তাড়াইয়া লইয়া  
 শুভাশুভ নিত্যসংযুক্ত।

বেড়ান মাত্র—এই পর্য্যন্ত করা যায়। হে বালকগণ,  
 অনিষ্টের মূলোচ্ছেদই প্রকৃত উপায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বলে, ভালমন্দ  
 নিত্য সংযুক্ত, এক জিনিষেরই এপিট ওপিট। একটা লইলে আর একটিকে  
 লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে, কোথাও না কোথাও  
 জল ঝানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—সমুদয় জীবনই চুঃখময়।  
 কাগকেও না কাহাকেও হত্যা না করিয়া নিঃশাস প্রাণাস গ্রহণ পর্য্যন্ত অসম্ভব;  
 এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেও কাহাকেও না কাগকেও বঞ্চিত করিতে  
 হয়। ইহাট প্রকৃতির অকাট্য বিধান—ইহাট খাঁটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

এই কারণে আমাদের একটুকু বুঝিতে হইবে যে, সামাজিক ব্যাধির

সামাজিক ব্যাধির প্রতী-  
 কাঃরোপায়—শিক্ষা, বল-  
 সূর্যক সংস্কার চেষ্টা নহে।

প্রতীকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের  
 উপর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা  
 যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে  
 হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে

প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা উহার  
 চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই  
 তত্ত্বটা বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে  
 হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত গরম হইতে দেওয়া হইবে না—আমাদিগকে  
 উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। আর জগতের ইতিহাসও আমাদিগকে শিক্ষা  
 দিতেছে যে, যেখানেই এইরূপ উত্তেজনার সহায়তায় কোন রূপ সংস্কার  
 করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার এই মাত্র ফল হইয়াছে যে, যে উদ্দেশ্যে  
 সংস্কার-চেষ্টা, সেই উদ্দেশ্যই বিফল হইয়াছে। আমেরিকার দাসব্যবসায় রহিত  
 করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তদপেক্ষা মনুষ্যের অধিকার ও স্বাধীনতা  
 রক্ষার জন্য ঘোরতর আন্দোলন কল্পনা করা বাইতে পারে না—তোমাদের  
 সকলেরই ঐ সম্বন্ধে জানা আছে। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? দাস-  
 ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে তাহাদের যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা তাহাদের  
 অবস্থা শতগুণ মন্দ হইয়াছে। দাস ব্যবসায় রহিত হইবার পূর্বে এই হত-  
 ভাগ্য নিগ্রোগণ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল—নিজ সম্পত্তির  
 স্থানি আশঙ্কায় বাহাতে তাহারা দুর্বল ও অকর্ম্মণ্য না হইয়া পড়ে, অধিকারি-

গণকে তাহা দেখিতে হইত। কিন্তু এখন তাহারা কাহারও সম্পত্তি নহে। তাহাদের জীবনের এখন কিছুমাত্র মূল্য নাই। এখন তাহাদিগকে সামান্য ছুতা করিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয় - কিন্তু তাহাদের হত্যাকারীদের জন্ত কোন আইন নাই। কারণ, তাহারা নিগার, তাহারা মালুম নহে, এমন কি, তাহারা পশুনাংমেরও যোগ্য নহে। আইনের দ্বারা অথবা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোন সামাজিক দোষের প্রতীকার চেষ্টার ফল এই।

কোনরূপ কল্যাণ সাধনের জন্তও এইরূপ উত্তেজনাপ্রসূত আন্দোলনের বরুদ্ধে ইতিহাসের এই সাফল্য বিদ্যমান। আমি দোষ দেখাইয়া দিবার লোক ইহা দেখিয়াছি। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক প্রতীকার করিবার লোক কই? আমি ইহা শিখিয়াছি। এই কারণেই আমি এই রূপ দোষারোপকারী কোন সমিতির সহিত যোগ দিতে পারি না। দোষারোপ বা নিন্দাবাদের কি প্রয়োজন? সকল সমাজেই দোষ আছে। সকলেই তাহা জানে। আজকালকার ছোট ছেলে পর্যন্ত তাহা জানে। সে প্রাটফর্মে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের গুরুতর দোষসমূহ সম্বন্ধে আমাদিগকে রীতিমত বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে পারে। যে কোন অশিক্ষিত বৈদেশিক ব্যক্তি এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করেন, তিনিই তাড়াতাড়ি করিয়া রেলগাড়ী চাপিয়া ভারত-বর্ষের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়া ভারতের ভয়াবহ অনিষ্টকর প্রথা বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। আমবা তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া থাকি। সকলেই দোষ দেখাইয়া দিতে পারে; কিন্তু তিনিই মানবজাতির ষথার্থ বন্ধু, যিনি এই সমস্ত হইতে উজ্জীর্ণ হইবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। সেই জলময় বালক ও দার্শনিকের গল্পে দার্শনিক বখন বালককে গভীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন সেই বালক যেমন বলিয়াছিল, ‘অগ্রে আমাকে জল হইতে তুলুন, পরে আপনার উপদেশ শুনিব’, সেইরূপ এখন আমাদের দেশের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ‘আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথেষ্ট সমাজ ঘুরিয়াছি, ডের কাগজ পড়িয়াছি, এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া এই মহাপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদিগকে ষথার্থ ভালবাসেন? এমন লোক

কোথা, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ?' এইরূপ লোক চাই। এই ধানেই আমার এই সকল সংস্কার আন্দোলন সমূহের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু তদ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যবিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে ? ঈশ্বরচ্ছায়া ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ষড়সাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের তীর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। শেষে প্রাচীন সমাজ তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিল খাইয়া ইহারা পার্টকেল মারিয়াছেন আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র জাতির, সমগ্র দেশের লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহাই কি সংস্কার ? ইহাই কি সমগ্র জাতির গৌরবের পথ ? ইহা কান্নার দোষ ?

তার পর, আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এখানে,

আমাদের এখন ব্যবস্থা—  
প্রণেতা ষড়ঋষিবল্লী রাজা  
নাই, এখন লোকশক্তি  
গঠন আবশ্যক।

ভারতে, আমরা চিরকাল রাজশাসনাধীন হইয়া  
কাটাইয়াছি—রাজারাই আমাদের জ্ঞান চিবদিন  
বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। এখন সেই রাজা  
নাই, এখন আর এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া পথ  
দেখাইবার কেহ নাই। গতবর্ষে গঠন ভরসা কবেন

না। গতবর্ষে সাধারণের মতামতের গতি দেখিয়া নিজ কার্যপ্রণালী  
স্থির করিতে হয়। কিন্তু নিজ সমগ্রা পূরণে সমর্থ, সাধারণের কল্যাণকর,  
প্রবল সাধারণ মত গঠিত হইতে সময় লাগে—খুব দীর্ঘ সময় লাগে। এই  
মত গঠিত হইবার পূর্বে পর্য্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং  
সমুদয় সমাজ সংস্কার সমগ্রাটী এই ভাবে দাঁড়ায়—সংস্কার যাহারা চায় তাহারা  
কোথা ? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই ? অল্প  
সংখ্যক কয়েকটা লোকের কোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অসংখ্য  
ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝে নাই। এখন এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জোর  
করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা  
করেন, ইহার দ্বারা প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েকজন  
লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্রজাতির ক্ষয়কে  
স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন ? প্রথমে সমগ্র জাতিকে  
শিক্ষা দাও, ব্যবস্থাপ্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর ; বিধান আপনা

আপনিই আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, বাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের প্রথম পদার্থ—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্ত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরণের। এই সংস্কারচেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অল্প বর্ণকেই নাহ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে শতকরা ৭০ জন ভারতীয় রমণীর কোন স্বার্থই নাই। আর এতদ্বিধ সকল আন্দোলনই সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া (এটা লক্ষ্য করিও) যে সকল ভারতীয় উচ্চশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্ত। তাঁহারা নিজেদের ঘর সাফ করিতে এবং বৈদেশিকগণের নিকট আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইতে কিছুমাত্র চেষ্টার উদ্দেশ্য করেন নাই। ইহাকে ত সংস্কার বলা বাইতে পারে না। সংস্কার কাবতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত বাইতে হইবে। ইহাকেই আমি আমূল সংস্কার, প্রকৃত সংস্কার নাম দিয়া থাকি। মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক—একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।

আর সমস্তা বড় সহজও নহে। ইহা অতি গুরুতর সমস্তা; সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আর এটাও জানিয়া রাখিও যে, গত কয়েক শতাব্দী হইতেই এই সমস্তা সম্বন্ধে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ জ্ঞাত ছিলেন। আজকাল, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, বৌদ্ধধর্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে আলোচন একটি প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তাহারা অগ্নেও কখন ভাবে না যে, আমাদের সমাজে যে সকল বিশেষ দোষ রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম কৃত। বৌদ্ধধর্ম আসিয়া আমাদের উত্তরাধিকার স্বরূপ এই অবনতির ভাগী করিয়াছে। তাহারা বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও আনন্দের ইতিহাস কখনও পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত পুস্তকে তোমরা পাঠ করিয়া থাক যে, গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত অপূর্ণ নীতি ও তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রগুণে বৌদ্ধধর্ম এরূপ

বিস্তার লাভ করিয়াছিল । ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি-  
শ্রদ্ধা আছে । কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—বৌদ্ধধর্মের  
বিস্তার ততটা উহার মত বা উক্ত মহাপুরুষের চারিত্র্যগুণে হয় নাই—বৌদ্ধগণ  
যে সকল মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,  
সমগ্র জাতির সমক্ষে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ ধরিয়াছিলেন তাহার  
দকন যতটা হইয়াছিল । এইরূপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে । এই সকল  
বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের নিকট নিজ নিজ গৃহে  
প্রতিষ্ঠিত হোমার্ঘ অগ্নিস্থান সমূহ দাঁড়াইতে পারিল না । পরিশেষে ঐ  
সকল ক্রিয়াকলাপ অমুষ্ঠান অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল । উহা  
এরূপ ঘৃণিত ভাব ধারণ করিল যে, শ্রোতৃবর্গের নিকট আমি তাহা বলিতে  
অক্ষম । যাঁহারা ইহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার  
কারুকার্যপূর্ণ দাক্ষিণাত্যে বড় বড় মন্দির দেখিয়া আসিবেন ।

আমরা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে ইহাই মাত্র দায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ।  
শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি তৎপরে সেই মহান সংস্কারক শঙ্করাচার্য্য ও তদনু-  
প্রাচীন আচার্য্যগণের সংস্কার বর্ত্তিগণের অভ্যুদয় হইল আর এই শত শত বর্ষ  
চেষ্টা ; তদানীন্তন সমাজ ধরিয়া, তাঁহার অভ্যুদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের  
সকলকে ধীরে ধীরে বৈদ্য- সর্বসাধারণকে ধীরে ধীরে সেই মৌলিক বিপুল  
ভিত্তিক ধর্মের অমুখর্ত্তী করি- বৈদ্যান্তিক ধর্মে লইয়া আসিবার চেষ্টা হইতেছে ।  
বার প্রয়াস । এই সংস্কারকগণ সমাজে যে যে দোষ ছিল, তৎ-  
সম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সমাজকে নিন্দা করেন  
নাই । তাঁহারা একথা বলেন নাই, তোমাদের যা আছে, সব ভুল ; তোমা-  
দিগকে সব ফেলিয়া দিতে হইবে । তাহা কখনই হইতে পারিত না । আমি  
সম্প্রতি পড়িতেছিলাম—আমার বন্ধু ব্যারোজ সাহেব বলিতেছেন, ৩০০ বৎসরে  
খ্রীষ্টধর্ম রোমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাবকে একেবারে উল্টাইয়া দিয়াছিল ।  
যিনি ইউরোপ, গ্রীক ও রোম দেখিয়াছেন, তিনি কখন এ কথা বলিতে  
পারেন না । রোমক ও গ্রীক ধর্মের প্রভাব, এমন কি, প্রোটেষ্ট্যান্ট দেশ  
সমূহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রহিয়াছে । কেবল নাম বদলাইয়াছে মাত্র—প্রাচীন  
দেবগণই নূতন বেশে বিদ্যমান । কেবল নাম বদলান । দেবীগণ হইয়া-  
ছেন মেরি, দেবগণ হইয়াছেন সাধুগণ (saints) এবং নূতন নূতন  
অমুষ্ঠান পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে । এমন কি, প্রাচীন উপাধি পট্টকেন্দ্র

ম্যাক্সমাস\* পর্য্যন্ত রহিয়াছে। স্মৃতরাং একেবারে পরিবর্তন হইতেই পারে না।  
এরূপ পরিবর্তন বড় সহজ নহে—আর শঙ্করাচার্য্য ইহা জানিতেন। রামানুজও  
জানিতেন। এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।  
একেবারে পরিবর্তন অসম্ভব। স্মৃতরাং তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মকে ধীরে ধীরে উচ্চ-  
তম আদর্শের অমুর্ভর্তী করা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন পথ ছিল না। যদি  
তাঁহারা অপর প্রণালী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা  
একেবারে সব উন্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কপট  
হইতে হইত; কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রধান মতই ক্রমোন্নতিবাদ—এই  
সকল নানাবিধ সোপানের মধ্য দিয়া আত্মা তাঁহার উচ্চতম লক্ষ্যে পঁহছি-  
বেন—ইহাই তাঁহাদের মূল মত। স্মৃতরাং এই সমুদয় সোপানগুলিই আবশ্যিক  
ও আমাদের সহায়ক। আর কে এই সোপানগুলিকে নিন্দা করিতে  
সাহসী হইবে?

আগ্ৰকাল ইহা একটা চলিত কথা দাঁড়াইয়াছে আর সকলেই বিনা আপ-  
ত্তিতে এটা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা দোষ। আমিও  
এক সময়ে এইরূপ ভাবিতাম আর ইহার শাস্তি  
পুতুল পূজা।  
স্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া  
শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুলপূজা হইতেই সব পাইয়া-  
ছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুল-  
পূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস সকলের অভ্যুদয় হয়, তবে  
তোমরা কি চাও—সংস্কারকগণের ধর্ম্ম চাও, না পুতুলপূজা চাও? আমি  
ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপূজা দ্বারা এইরূপ রামকৃষ্ণ পরম-  
হংস সকল সৃষ্টি করিতে পার, তবে আরও হাজার হাজার পুতুলের পূজা  
কর। যে কোন উপায়ে হউক, এইরূপ মহাত্মা সমূহের সৃষ্টি কর। আর  
পুতুলপূজাকে লোকে গাল দেয়! কেন? তাহা কেহই জানে না।  
কারণ, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্বে কোন যাহ্নদীবংশসম্মত ব্যক্তি পুতুলপূজাকে  
নিন্দা করিয়াছিলেন! অর্থাৎ তিনি নিজের পুতুল ছাড়া আর সকলের  
পুতুলকে নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই যাহ্নদী বলিয়াছিলেন, যদি

\* রোমকদিগের পুরোহিত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যক্ষ এই নামে অভিহিত হইতেন। এই  
বাক্যের অর্থ প্রধান পুরোহিত। এখন পোপ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কোন বিশেষ ভাব প্রকাশক বা পরমসুন্দর মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা ভয়ানক দোষ, উহা পাপ । কিন্তু যদি একটা সিন্দূকের ছধারে দুইজন দেবদূত এবং উপরে মেঘ এইরূপে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা মহা পবিত্র । যদি ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা মহা পবিত্র, কিন্তু যদি তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়া আসেন তবে তাহা হিন্দুদের কুসংস্কার ! উহা অধঃপাতে যাক্ ।

ছনিয়ার ভাবই এই । সেই জন্তই কবি বলিয়াছেন, ‘আমরা মর্ত্যগণ কি নির্দোষ !’ এইজন্তই পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষে আমরা কি নির্দোষ : দেখা ও বিচার করা মহা কঠিন ব্যাপার । আর ইহাই মনুষ্য সমাজের উদ্ভূতির এক মহান অন্তরায় স্বরূপ । ইহাই ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা, এবং বিবাদ ও স্বন্দেহ মূল । বালকগণ, অকালপক্ক শিশুগণ, তোমরা মাদ্রাজের বাহিরে কখন যাও নাই ; তোমরা সহস্র সহস্র প্রাচীন সংস্কার নিয়ন্ত্রিত ত্রিশ কোটি লোকের উপর আইন চালাইতে চাও । তোমাদের কি লজ্জা হয় না ? এরূপ বিষম দোষ হইতে বিরত হও এবং অগ্রে আপনারা শিক্ষা কর । শ্রদ্ধা-হীন বালকগণ, তোমরা কেবল কাগজে গোটা কতক লাইন আঁচড়াইতে পার আর কোন আহম্মকে ধরিয়া উহা ছাপাইয়া দিতে পার বলিয়া আপনাদিগকে জগতের শিক্ষক, আপনাদিগকে ভারতের মুখপাত্র বলিয়া মনে করিতেছ ? তাই না কি ?

এই কারণে আমি মাদ্রাজের সমাজ সংস্কারকগণকে এই টুকু বলিতে চাই যে, আমার তাঁহাদের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সংস্কারকগণকে নূতন প্রণালী আছে । তাঁহাদের বিশাল হৃদয়, তাঁহাদের স্বদেশ-অবলম্বন করিতে হইবে । প্রীতি, দরিদ্র ও অত্যাচারপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসার জন্ত আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি । কিন্তু তাই যেমন ভাইকে ভালবাসে অথচ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ ভাবে আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি—তাঁহাদের কার্যপ্রণালী ঠিক নহে । শতবর্ষ ধরিয়া এই প্রণালীতে কার্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই । এক্ষণে আমরা দিগকে অথচ কোন নূতন উপায়ে কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এইটুকুই আমার বক্তব্য ।

ভারতে কি কখন সংস্কারকের অভাব হইয়াছিল ? তোমরা ভারতের ইতিহাস পড়িয়াছ ত ? রামানুজ কি ছিলেন ? শঙ্কর ? নানক ? চৈতন্য ?



কবীর? দাহু? এই যে মহান্ ধর্মপ্রচারকগণ ভারতগগনে অত্যাঙ্কন  
 নক্ষত্রপ্রায় একে একে উদ্ভিত হইয়া আবার অন্ত  
 প্রাচীন ও আধুনিক  
 সংস্কারকে প্রভেদ ।  
 গিয়াছেন, ইহারা কি ছিলেন? রামায়ণের হৃদয়  
 কি নীচ জাতির দ্রুত কঁাদে নাই? তিনি কি

সারাজীবন এমন কি পরিয়াদিগকে \* পর্য্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ  
 করিতে চেষ্টা করেন নাই? তিনি কি মুসলমানকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে  
 চেষ্টা করেন নাই? নানক কি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সহিত  
 সমানভাবে পরামর্শ ও সমাজের নূতন অবস্থা আনয়নে চেষ্টা করেন নাই?  
 তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কার্য এখনও চলিতেছে ।  
 তবে প্রভেদ এই;—তাঁহারা আধুনিক সংস্কারগণের স্তায় চীৎকার ও  
 বাহ্যভঙ্গ্য করিতেন না। আধুনিক সংস্কারকগণের স্তায় তাঁহাদের মুখ  
 হইতে কখন অভিশাপ উচ্চারিত হইত না, তাঁহাদের মুখ হইতে কেবল  
 আলীকাদ বর্ষিত হইত। তাঁহারা কখন সমাজের উপর দোষারোপ করেন  
 নাই। তাঁহারা লোকদিগকে বলিতেন, সমগ্র জাতি চিরদিনই পুষ্টাবয়ব হইতে  
 থাকিবে। তাঁহারা অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেন, হিন্দুগণ,  
 তোমরা এতদিন বাহা করিয়াছ, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ,  
 আমরাদিগকে আরও ভাল কায করিতে হইবে। তাঁহারা একথা বলেন  
 নাই যে, তোমরা এতদিন অসৎ ছিলে, এক্ষণে তোমাдиগকে ভাল হইতে  
 হইবে। তাঁহারা বলিতেন তোমরা ভালই ছিলে, কিন্তু এক্ষণে তোমা-  
 দিগকে আরও ভাল হইতে হইবে। এই দুই প্রকার কথার তিতর বিশেষ  
 পার্থক্য আছে। আমরাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা

করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজ সকল আমা-  
 জাতীয়ভাবে সমাজসংস্কার। দিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত  
 করিবার চেষ্টা করিতেছে তদনুযায়ী কার্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা  
 অসম্ভব। আমরাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির স্তায় গড়িতে পারা  
 অসম্ভব, তজ্জন্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জাতির সামাজিক প্রধার  
 নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে  
 নহে। তাহাদের পক্ষে বাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে  
 পারে। প্রথমে এইটাই শিক্ষা করিতে হইবে। অপরবিধ বিজ্ঞান, অন্য-

\* দাক্ষিণাত্যবাসী চণ্ডালবৎ নীচ জাতিবিশেষ ।

বিধ পরম্পরাগত সংস্কার ও অশুভবিধ আচারে পঠিত হওয়াতে তাহাদের আধুনিক সামাজিক প্রথা সকল একরূপ দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পশ্চাতে অবার অশুভবিধ পরম্পরাগত সংস্কার এবং সহস্র সহস্র বর্ষের কর্ম রহিয়াছে। সুতরাং আমরা স্বভাবতঃই আমাদের সংস্কারাভ্যাসী চলিতে পারি—আর আমাদেরকে সেইরূপই করিতে হইবে।

তবে আমি কি প্রণালীতে কার্য করিব ? আমি প্রাচীন মহান্ আচার্য্য-পণের উপদেশ অনুসরণ করিতে চাই। আমি আমার কার্য্যপ্রণালী দেশ-কালোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া প্রাচীন আচার্য্যগণের কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি ও তাঁহারা কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছিলেন, জ্ঞপ্তিরেচ্ছায় তাহা আবিস্কার করিয়াছি। সেই মহাপুরুষগণ সমাজসমূহ সংগঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাতে বিশেষ ভাবে শক্তি, পবিত্রতা ও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি অল্পত কার্য্য করিয়াছিলেন। আমাদেরকেও অল্পত অল্পত কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে অবস্থ্যচক্রের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। তজ্জন্ত কার্য্যপ্রণালীর অতি সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে মাত্র। আর কিছু নয়।

আমি দেখিতেছি, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন, প্রত্যেক জাতিরও তেমন এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর; অন্ত্যন্ত সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐক্যতান উৎপাদন করিতেছে। ভারতের অল্প দেশের ঘণা ইংলণ্ডের জীবনীশক্তি রাজনৈতিক অধিকার। কলাবিদ্যার উন্নতিই হয়ত অপর কোন জাতির জীবনের মূল লক্ষ্য। ভারতে কিন্তু ধর্ম্মজীবনই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ, উহাই যেন জাতীয় জীবনরূপ সঙ্গীতের প্রধান সুর। আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া উহার যে দিকে বিশেষ গতি হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং যদি তোমরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে উৎসাহে বসাও, তবে তাহার

ফল এই হইবে যে, তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্ত তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তি স্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রী তোমাদের ধর্ম রূপ মেরুদণ্ডে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া তাহাদের সুর বাজাইতে থাকুক।

আমি দেখিয়াছি, সামাজিক জীবনের উপর কিরূপ কার্য্য করিবে, ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্ম প্রচার বিভিন্ন জাতির জাতীয় মূল উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য-প্রণালীর তারতম্য।

ইহা না দেখাইয়া আমি আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করিতে পারিতাম না। বেদান্তের দ্বারা কিরূপ অদ্বৈত রাজনৈতিক পরিবর্তন হইবে, উহা না দেখাইয়া আমি ইংলণ্ডে ধর্মপ্রচার করিতে পারিতাম না। এইরূপে ভারতে সমাজ সংস্কার প্রচার করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, সেই নূতন সমাজের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার কি বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজনীতি প্রচার করিতে হইলেও দেখাইতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি তদ্বারা কতদূর পরিমাণে অধিক সিদ্ধ হইবে।

প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক জাতিও তদ্রূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে ধর্মকে আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড নির্বাচন করি মনে হইয়াছে? আপনাদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে। আর আমাদের নির্বাচনকে বিশেষ মন্দ বলিতে পারা যায় না। জড়ের পরিবর্তে চৈতন্য, মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বর চিন্তা করাকে কি বিশেষ অসৎ পথ বলিতে পার? তোমাদের মধ্যে সেই পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস, ইহলোকের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান। কই, ইহা ত্যাগ কর দেখি। তোমরা কখনই ইহা ত্যাগ করিতে পার না। তোমরা জড়বাদী হইয়া, কিছুদিন জড়বাদের কথা বলিয়া আমায় ধোঁকা লাগাইবার চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের স্বভাব জানি। বাই তোমাদিগকে ধর্মসম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব, অমনি তোমরা পরম আন্তরিক হইবে। স্বভাব বদলাইবে কিরূপে? তোমরা ধর্মগতপ্রাণ।

এই কারণে ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজ-

নৈতিক ভাবের বজায় আসাইতে গেলে প্রথমে এ দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বজায় আসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটী করা আবশ্যক। প্রথমতঃই

প্রথম কার্য—ভারতে  
ধর্ম প্রচার।

আমাদিগকে এই কার্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অজ্ঞাত শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে,—যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে, কারণ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নির্দিধ্যাসন করা কর্তব্য। প্রথমে লোকে শাস্ত্রবাক্য সকল শুনুক আর যে কোন ব্যক্তি লোককে তাহাদের নিজ শাস্ত্রের মহান সত্য সকল শুনাইতে সাহায্য করে, সে আজ এমন এক কৰ্ম করিতেছে, অজ্ঞ কোন কৰ্ম বাহার সদৃশ হইতে পারে না। আমাদের ব্যাস বলিয়াছেন, ‘এই কলিযুগে একটী কৰ্ম মানুষের করিবার আছে। আজকাল আর বজ্র ও

কঠোর তপস্যায় কোন ফল হয় না। এখন দানই ‘দানমেকং কলৌ যুগে।’

একমাত্র কৰ্ম \*।’ দানের মধ্যে ধর্মদান, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। এই অপূর্ব দানশীল হিন্দুজাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই দরিদ্র, অতি দরিদ্রদেশে লোকে কি পরিমাণ দান করে, লক্ষ্য কর। এখানে লোকে এরূপ আতিথেয় যে, যে কোন ব্যক্তি বিনাসম্বলে ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। লোকে পরমাত্মীয়কে যেমন যত্নের সহিত নানা উপচারের দ্বারা সেবা করে, তদ্রূপ তিনি যেখানেই যাইবেন, লোকে সেই স্থানের সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। এখানে কোথাও যতকণ এক টুকরাও রুটি থাকিবে, ততকণ কোন ভিক্ষুককেই না খাইয়া শরিতে হয় না।

\* ভগঃ পরং কৃতং যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহঃ দানমেকং কলৌ যুগে ॥

মহুসংহিতা—১ম অঃ, ৮৬ শ্লোক ।

এই দানশীল দেশে আমাদের প্রথম দুই প্রকার দানে সাহসপূর্বক অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমতঃ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিস্তার। শুধু আবার এই জ্ঞানদান ভারতেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না—সমগ্র জগতে উহার বিস্তার করিতে হইবে। ইহাই বরাবর হইয়া আসিয়াছে। যাহারা তোমাদিগকে বলেন, ভারতীয় চিন্তারাশি কখন ভারতের বাহিরে যায় নাই, যাহারা তোমাদিগকে বলেন, ভারতের দেশে ধর্মপ্রচারের জন্ত আমিই প্রথম সন্ন্যাসী গিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ জাতির ভারতের দেশে ধর্মপ্রচার।

ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহেন। এই ব্যাপার অনেকবার ঘটয়াছে। যখনই জগতের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই আধ্যাত্মিকতার চিরপ্রস্রবণ হইতে বহু যাইয়া জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। অগণ্য সৈন্যদল লইয়া উচ্চরবে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে রাজনৈতিক জ্ঞান-বিস্তার করা যাইতে পারে। লৌকিক জ্ঞান বা সামাজিক জ্ঞান বিস্তার করিতে হইলেও তরবারি বা কামানের সাহায্যে উহা হইতে পারে; কিন্তু শিশির যেমন অশ্রুত ও অদৃশ্য ভাবে পড়িলেও রাশি রাশি গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, তরুণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান নীরবেই, সকলের অজ্ঞাতভাবে হওয়াই সম্ভব। ভারত বার বার জগৎকে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ উপহার দান করিয়াছে। যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যখনই তাহারা রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সুগম করিয়া দিয়াছে, অমনি ভারত উঠিয়া সমগ্রজগতের উন্নতি কল্পে তাহার যাহা দিবার আছে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়াছে। বুদ্ধদেব জন্মাইবার অনেক দিন পূর্ব হইতেই ইহা ঘটয়াছে। চীন, এসিয়া মাইনর ও মালয়দ্বীপপুঞ্জের মধ্য-ভাগে এখনও তাহার 'চিহ্ন' বর্তমান। যখন সেই প্রবল গ্রীক দিগ্বিজয়ী তদানীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিয়াছিলেন, তখনও এই ব্যাপার ঘটয়াছিল—তখনও ভারতীয় ধর্ম সেই সকল স্থানে ছুটিয়াছিল। আর পাশ্চাত্যপ্রদেশ যে সভ্যতা লইয়া এখন গর্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবল্লভ অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র। এক্ষণে আবার সেই সুযোগ উপস্থিত। ইংলণ্ডের শক্তিতে সমগ্র জগতের জাতিসমূহ একত্র গ্রথিত হইয়াছে, এরূপ আর পূর্বে কখন হয় নাই। ইংরাজদের রাস্তা ও অগাধ যাতায়াতের উপায় সকল জগতের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আজ ইংরাজ প্রতিভায় জগৎ অপূর্ব্ণ ভাবে একস্থানে গ্রথিত হইয়াছে। আজকাল যেরূপ বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যক্ষেত্র সমূহ স্থাপিত হইয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে পূর্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সুতরাং এই সুযোগে ভারত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিকতার উপহার দান করিয়াছে। এখন এই সকল পথ অবলম্বন করিয়া এই ভারতীয় ভাবরাশি সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইতে থাকিবে। আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমাদের ইচ্ছায় হয় নাই। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনিই এইরূপ শতশত ব্যক্তিকে জগতের সকল জাতির নিকট প্রেরণ করিবেন। পার্শ্ববর্ত্ত কোন শক্তিই উহার প্রতিরোধে সমর্থ নহে। সুতরাং তোমাদিগকে ভারতের দেশে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যেও যাইতে হইবে। তোমাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, জগতের সকল জাতির নিকট, সকল ব্যক্তির নিকট উহা প্রচার করিতে হইবে। প্রথমেই এই ধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক।

ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অজ্ঞাত বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক, আপনা আপনিই আসিবে। কিন্তু যদি ধর্ম্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বিন্যাদান। স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা

হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি, এত বড় যে বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহাও কতকটা এই কারণেই এখানে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যদি ইহা ফলপ্রসবে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তুমি আমি কি করিতে পারি ?

হে বন্ধুগণ, এই হেতু আমার সঙ্কল্প এই যে—ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বাহির্ভূত প্রদেশে আমাদের শাস্ত্রনিহিত সত্য

আচার্য্যশিক্ষালয়। সকলের প্রচারকার্য্যে শিক্ষিত হইবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীৰ্য্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবশ্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অজ্ঞাত সকল জিনিষের অপেক্ষা

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির সময়ে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে, কারণ, ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিগুহ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর। জগৎ এই সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

শত শত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শিখান হইয়াছে; তাহাদিগকে শিখান হইয়াছে যে, তাহারা কিছুই নহে।

আত্মতত্ত্ব শ্রবণে হীনবক্তির সমগ্র জগতের সর্বসাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে যে, তোমরা মানুষ নও। শত শত মধ্যে শক্তির বিকাশ হইবে।

শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখান হইয়াছে—ক্রমশঃ তাহারা সত্যসত্যই পশুপদবীতে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে কখন আত্মতত্ত্ব গুণিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তাহারা জাম্বুক যে, তাহাদের মধ্যে অতি নিম্নতম ব্যক্তির ভিতর পর্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন—যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, যাহাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, ঘনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী।

তাহারা নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হউক। ইংরাজ জাতি ও তোমাদের মধ্যে কিসে এত প্রভেদ? তাহারা তাহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রবল কর্তব্য-জ্ঞান ইত্যাদি যাহাই বলুক না কেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, কোন্ বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ। প্রভেদ এই, ইংরাজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা নহ। সে বিশ্বাস করে, সে যখন ইংরাজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এই বিশ্বাসবলে তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, সে তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই তোমরা অকর্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছ। অতএব আপনাতে বিশ্বাসী হও।

আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুড়েকাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান সত্য থাকিতে পারে,

আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুড়েকাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান সত্য থাকিতে পারে,

কিন্তু উহাতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের আবশ্যক—লোহ ও বজ্র-দৃঢ় পেশী ও ন্যাসুসম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সকল মতবাদের আবশ্যক—যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাদ্ধসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আর, কোন বিষয় সত্য কিনা জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই,—যাহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন করিবে, তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখন সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ। সত্যই পবিত্রতাবিধায়ক, সত্যই জ্ঞানরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, উহাতে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, উহাতে হৃদয়ে তেজ আনয়ন করে। এই সকল রহস্যময় গুহ্যমতসমূহে কিছু সত্য থাকিলেও সাধারণতঃ উহাতে মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিয়াছি। আমি ভারতের প্রায় সর্বস্থলেই ভ্রমণ করিয়াছি, এখানকার প্রায় সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, হিমালয়েও বাস করিয়াছি। এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা সারা জীবন সেথায় বাস করিতেছে। আমি ঐ সকল গুহ্যমতসমূহ সম্বন্ধে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ওগুলি মানুষকে দুর্বল করে মাত্র। আর আমি আমার স্বজাতিকে ভালবাসি; তোমরা ত এখনই যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ—তোমাদিগকে আর দুর্বলতর, হীনতর হইতে দেখিতে পারি না। অতএব তোমাদের কল্যাণের জন্ত এবং সত্যের জন্ত আমার স্বজাতির যাহাতে আর অবনতি না হয়, তজ্জন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি—আর না। অবনতির পথে আর অগ্রসর হইও না—মতদূর গিয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে।

এখন বীৰ্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষৎ, সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদরূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য সকল অতি সহজবোধ্য।



যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদেব এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্যসকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া বলপ্রদ উপনিষৎ অবলম্বন কার্যে পরিণত কর। তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

আর এক কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে। লোকে স্বদেশ-হিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎকার্য্য করিতে হইলে তিনটা জিনিষের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটিকোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অন্ধাশ্রমে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের ক্লেশমেষ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া ভুলিয়াছে? দেশের হৃদহার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম বশ, ক্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

তোমরা অনেকেই জান, আমি আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া তথ্য যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা প্রতীকারের জন্ত আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধর্ম্মা সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু কার্য্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্তই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিত, তাহারা অবশ্য একথা জান। ধর্ম্মমহাসভা ফলা হল না হল কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাদের খবর নেয় কে? ইহাই স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপান।

মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ— কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল রথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পাব কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্ত তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ত্তপ্রায় বিশ্ববাসীকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্বীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধনমান সন যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন,—“নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে এক বিন্দুও বিচলিত না হন” \* সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি

নিন্দিত নীতিনিপুণ যদি বা স্তবস্ত

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্ ।

অদৌব বা মরণমস্ত যুগান্তরে বা

স্ত্রাঘ্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীবাঃ ॥

নীতিশতক, ৭৪ ।

এরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ণ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্রতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্রতপ্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়ত শতশত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া যুদ্ধাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।

আর এক কথা। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমাদের বিলম্ব হইতেছে। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষলক্ষ মানবাত্মাকে জীবন জাতীয় অর্ণবপোত।

নদীতে পারাপার করিতেছে। ইহার সহায়তায় প্রায় বিংশ শতাব্দী ধরিয়া লক্ষলক্ষ মানব জীবননদীর অপর পারে অন্ততঃ নীত হইয়াছে। আজ হয়ত তোমাদের নিজ দোষেই উহাতে দু'একটা ছিদ্র হইয়াছে, উহা একটু খারাপও হইয়া গিয়াছে। তোমরা কি এখন উহার নিন্দা করিবে? জগতের সকল জিনিষ অপেক্ষা যে জিনিষ আমাদের অধিক কাষে আসিয়াছে, এখন কি তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা উচিত? যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে ছিদ্র হইয়া থাকে, আমরা ত এই সমাজেরই সন্তান। আমরাগকেই গিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে। যদি আমরা তাহা করিতে না পারি, তবে আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও উহার চেষ্টা করিতে হইবে, অথবা মরিতে হইবে। আমরা আমাদের মস্তিষ্ক রূপ কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দ্বারা ঐ অর্ণবপোতের ছিদ্রসকল বন্ধ করিব, কিন্তু উহাকে কখনই নিন্দা করিব না। এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না। আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি। আমি তোমাদের সকলকে ভালবাসি, কারণ, তোমরা দেবগণের বংশধর, তোমরা মহামহিমাবিশিষ্ট পূর্বপুরুষগণের সন্তান। তোমাদের সর্ব প্রকারে কল্যাণ হউক। তোমাগকে নিন্দা করিব বা গালি দিব? কখনই নয়। হে আমার সন্তানগণ, আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বলিতে

আসিয়াছি। যদি তোমরা শুন, আমি তোমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি না শুন, এমন কি, আমাকে পদাঘাত করিয়া ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা সকলে ডুবিতেছি। এই কারণেই আমি তোমাদের ভিতর তোমাদেরই একজন হইয়া তোমাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি। আর যদি আমাদেরকে ডুবিতে হয়, তবে আমরা সকলে যেন একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারও প্রতি যেন কটুক্তি প্রয়োগ না করি।

### ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যকারিতা ।

আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের অভিধান স্বরূপ একটি শব্দ খুব চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ‘হিন্দু’ শব্দটী লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। বেদান্তধর্ম্ম বলিতে আমি কি লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাহা হিন্দু কে ? বুঝাইবার জন্ত উক্ত শব্দটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। প্রাচীন পারসীকগণ সিদ্ধনদকে হিন্দু বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় যেখানে ‘স’ আছে, প্রাচীন পারসীক ভাষায় তাহাই ‘হ’ রূপে পরিণত হইয়াছে। আর তোমরা সকলেই জান, গ্রীকগণ ‘হ’ উচ্চারণ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা একেবারে ‘হ’ টাকে উড়াইয়া দিল—এইরূপে আমরা ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত হইলাম। এক্ষণে কথা এই, প্রাচীনকালে এ শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক, উহা সিদ্ধনদের পরপারবাসিগণকেই বুঝাক বা যাহাই হউক, বর্ত্তমান কালে উক্ত শব্দের আর কোন সার্থকতা নাই; কারণ, এখন আর সিদ্ধনদের পরপারবাসী সকলে একধর্ম্মাবলম্বী মনে। এখানে এখন আসল হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খৃষ্টিয়ান, এবং অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈনও বাস করিতেছেন। হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইহাদের সকলকেই হিন্দু বলিতে হয়, কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে ইহাদের সকলকে হিন্দু বলা চলে না। আর আমাদের ধর্ম্ম যেন নানা ধর্ম্ম, নানা ভাব এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিস্বরূপ—এই সব একসঙ্গে রহিয়াছে কিন্তু ইহাদের একটা সাধারণ নাম নাই, একটা বিধিবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী নাই, ইহার একটা চার্জ নাই। এই কারণে আমাদের ধর্ম্মের একটা সাধারণ বা সর্ব্ববাদিসম্মত নাম দেওয়া বড় কঠিন। বোধ হয়, এই একটা মাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত যে, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র-বেদে বিশ্বাসী। এটী

বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই ।

তোমরা সকলেই জান, এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । কর্মকাণ্ডে নানাবিধ যাগযজ্ঞ ও অমুষ্ঠানপদ্ধতি আছে—উহাদের মধ্যে অধিকাংশই আজকাল চলিত নাই । হিন্দু ও বৈদান্তিক ।

জ্ঞানকাণ্ডে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ—উহা উপনিষদ বা বেদান্ত নামে পরিচিত । আর দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল আচার্য্য ও দার্শনিকগণই উহাকেই উচ্চতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । ভারতীয় সকল দর্শন ও সকল সম্প্রদায়কেই উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে । যদি কেহ না করেন, তবে সেই দর্শন বা সম্প্রদায় শিষ্টাচারবিহীন বলিয়া পরিগণিত হইবে । সুতরাং বর্তমান কালে সমগ্র ভারতের হিন্দুকে যদি কোন সাধারণ নামে পরিচিত করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে সম্ভবতঃ বৈদান্তিক বা বৈদিক, এই দুইটির মধ্যে যাহা তোমাদের ইচ্ছা বলিলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয় । আর আমি বৈদান্তিক ধর্ম ও বেদান্ত শব্দদ্বয় ঐ অর্থেই সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি ।

আমি আর একটু স্পষ্ট করিয়া এইটী বুঝাইতে চাই ; কারণ, ইদানীং অনেকে বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত ব্যাখ্যাকেই বেদান্ত শব্দের সহিত সমানার্থক রূপে প্রয়োগ করিতেছেন । আমরা সকলেই বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী কি জানি, উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া যে সকল বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাহার অগ্রতম

মাত্র । অদ্বৈতবাদীদের উপনিষদের উপর যতটা শ্রদ্ধাভক্তি আছে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদেরও ততটা আছে এবং অদ্বৈতবাদীদের দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও বেদান্তকেই মূল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । দ্বৈতবাদী এবং ভারতীয় অগ্রাগ্র সম্প্রদায় সকলও এইরূপ করিয়া থাকেন । ইহা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের মনে বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী সমানার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহার কিছু বিশিষ্ট কারণও আছে । যদিও বেদই আমাদের শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্তী স্মৃতি ও পুৰাণও—যাহাতে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে—আমাদের শাস্ত্র ; এগুলির অবশ্য বেদের দ্বারা প্রামাণ্য নাই । আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি এবং পুৰাণও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির

মত গ্রাহ্য করিতে হইবে এবং স্মৃতির মতকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতকেশরী শঙ্করাচার্য্য ও তন্মতাবলম্বী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যায় অধিক পরিমাণে উপনিষদ্ প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কেবল যেখানে এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইয়াছে, বাহ্যিক শ্রুতিতে কোনরূপে পাইবার আশা করা যায় না, এইরূপ অল্পস্থলেই কেবল স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। অত্যাশ্রয় বাদিগণ কিন্তু শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন আর যতই আমরা অধিকতর দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহের পর্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহারা এত অধিক পরিমাণে স্মৃতি উদ্ধৃত করিতেছেন যে, বৈদান্তিকের নিকট তাহা আশা করা যায় না। বোধ হয়, ইহারা স্মৃতি পুরাণাদির প্রমাণের উপর এত অধিক নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া অদ্বৈতবাদীই খাঁটি বৈদান্তিক বলিয়া ক্রমশঃ পরিগণিত হইয়াছেন।

যাহাই হউক, আমরা পূর্বেই ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, বেদান্ত শব্দে ভারতীয় সমগ্র ধর্মসমষ্টি বুঝিতে হইবে। আর ইহা যখন বেদ, তখন সর্ববাদি-

‘বেদ’ নামধেয় অনাদি অনন্ত  
জ্ঞানরাশি ভারতীয় সর্ববিধ  
ধর্মমত, এমন কি, বৌদ্ধ ও  
জৈন ধর্মেরও মূলভিত্তি।

সম্মতিক্রমে ইহা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক, হিন্দুরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন যে, বেদের কতকাংশ এক সময়ে এবং কতকাংশ অল্প সময়ে লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা অবশ্য এখনও দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সমগ্র বেদ এক সময়েই উৎপন্ন হইয়াছিল অথবা (যদি আমার একপ ভাষা প্রয়োগে কেহ আপত্তি না করেন) উহার কখনই সৃষ্টি হয় নাই, উহার চিরকাল সৃষ্টিকর্তার মনে বর্তমান ছিল। বেদান্ত শব্দে আমি সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশিকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভারতের বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সকলই উহার অন্তর্ভূত হইবে। সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম, এমন কি, জৈনধর্মেরও অংশবিশেষ গ্রহণ করিতে পারি—যদি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মধ্যে আসিতে সম্মত হন। আমাদের হৃদয় ত যথেষ্ট প্রশস্ত—আমরা ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—তাঁহারা ই আসিতে অসম্মত। আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত; কারণ, বিশিষ্ট বিশ্লেষণ করিলে তোমরা দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ সকল উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত; এমন কি, বৌদ্ধধর্মের নীতি,

তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান নীতিতত্ত্ব কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্তমান । এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি সব উপনিষদে রহিয়াছে, কেবল উহাদের বখামিগুলো নাই । পরবর্তী কালে ভারতীয় ধর্মচিন্তায় যে সকল পরিণতি হইয়াছে, উপনিষদে তাহারও বীজ আমরা দেখিতে পাই । সময়ে সময়ে বিনা হেতুবাদে এরূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে যে, উপনিষদে ভক্তির আদর্শ নাই । যাহারা উপনিষদে বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, এ অভিযোগ একেবারে সত্য নহে । প্রত্যেক উপনিষদেই অল্পসঙ্কান করিলে যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায় । তবে অনেক বিষয়, যাহা পরবর্তী কালে পুরাণ ও অজ্ঞাত স্মৃতিতে বিশেষরূপে পরিণত হইয়া ফুলফল-শোভিত মহীরুহাকার ধারণ করিয়াছে, উপনিষদে সেগুলি বীজভাবে মাত্র বর্তমান । উপনিষদে যেন উহারা চিত্রের প্রথম রেখাপাতরূপে, অথবা কঙ্কালরূপে বর্তমান । কোন না কোন পুরাণে ঐ চিত্রগুলি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে, কঙ্কালসমূহে মাংস শোণিত সংযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্বভাবের ধর্মস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায় । বিশিষ্টরূপ উপনিষদ্বিদ্যাহীন কতকগুলি ব্যক্তি ভক্তিবাদ বিদেশাগত, এইটী প্রমাণ করিবার হস্তাস্পদ চেঁচা করিয়াছেন । কিন্তু তোমরা সকলেই জান, তাঁহাদের সমুদয় চেঁচা বিফল হইয়াছে । তোমাদের যতটুকু ভক্তির প্রয়োজন, সবই, উপনিষদের কথা কি, সংহিতায় পর্য্যন্ত রহিয়াছে—উপাসনা, প্রেম, ভক্তিতত্ত্বের যাহা কিছু আবশ্যিক, সবই রহিয়াছে ; কেবল ভক্তির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে । সংহিতা-ভাগে স্থানে স্থানে ভয়ের ধর্মের চিহ্ন পাওয়া যায় । সংহিতাভাগে স্থানে স্থানে দেখা যায়, উপাসক বরুণ বা অশ্ব কোন দেবতার সম্মুখে ভয়ে কাঁপিতেছে । স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাহারা আপনাদিগকে পাপী জ্ঞানে অতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছে, কিন্তু উপনিষদে এসকল বর্ণনার স্থান নাই । উপনিষদে ভয়ের ধর্ম নাই, উপনিষদের ধর্ম—প্রেমের ধর্ম, উপনিষদের ধর্ম—জ্ঞানের ধর্ম ।

এই উপনিষৎসমূহই আমাদের শাস্ত্র । এইগুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আর আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক

শাস্ত্র ও দেশাচার ।

শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই,

আমরা শতকরা ৯০জন পৌরাণিক—আর বাকি শতকরা দশজন বৈদিক—  
তাহাও হয় কি না সন্দেহ। আরও আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে  
নানাবিধ অতিশয় বিরোধী আচারসকল বিদ্যমান—দেখিতে পাই, আমাদের  
সমাজে এমন ধর্মমতসমূহ রহিয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাদের কোন প্রমাণ নাই।  
আর শাস্ত্রপাঠে আমরা দেখিতে পাই ও দেখিয়া আশ্চর্য্য হই যে, আমাদের  
দেশে এমন সকল আচার প্রচলিত যাহাদের প্রমাণ বেদ স্মৃতি, পুরাণ  
কুত্রাপি নাই—যেগুলি কেবল বিশেষ বিশেষ দেশাচারমাত্র। তথাপি প্রত্যেক  
অজ্ঞ গ্রামবাসীই মনে করে যদি তাহার গ্রাম্য আচারটা উদ্ভিয়া যায় তাহা  
হইলে সে আর হিন্দু থাকিবে না। তাহার মনে বৈদান্তিক ধর্ম ও এই সকল  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশাচার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাস্ত্র পাঠ করিয়াও সে বুঝিতে  
পারে না যে, সে যাহা করিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রের সম্মতি নাই। তাহার  
পক্ষে ইহা বুঝা বড় কঠিন হইয়া উঠে যে, ঐ সকল আচার পরিত্যাগ করিলে  
তাহার কিছুই ক্ষতি হইবেনা, বরং তাহাতে সে পূর্য্যাপেক্ষা মানুষ্যের মত  
মানুষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আর এক মুঙ্কিল আছে—আমাদের শাস্ত্র অতি

বৃহৎ ও অসংখ্য। পতঞ্জলিপ্রণীত মহাভাষ্য নামক  
গেদের লুপ্ত শাখাসমূহ ও শব্দবিদ্যাশাস্ত্রে পাঠ করা যায় যে, সামবেদের সহস্র  
দেশাচার। শাখা ছিল। সে সকল গেল কোথায়? কেহই

তাহা জানে না। প্রত্যেক বেদ সম্বন্ধেই তদ্রূপ। এই সকল গ্রন্থের অধি-  
কাংশই লোপ পাইয়াছে, সামান্য অংশই আমাদের নিকট বর্ত্তমান। এক  
এক ঋষিপরিবার এক এক শাখার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হয় এই সকল  
পরিবারের মধ্যে অধিকাংশেরই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বংশলোপ হইয়াছে,  
অথবা বৈদেশিক অত্যাচারে বা অন্ত্র কারণে তাঁহাদের বিনাশ ঘটয়াছে।  
আর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে বেদশাখাবিশেষ রক্ষার ভার গ্রহণ  
করিয়াছিলেন, তাহাও লোপ পাইয়াছে। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে  
স্মরণ রাখা আবশ্যক; কারণ, যাহারা বেদের বিরুদ্ধে কিছু নূতন বিষয় প্রচার  
করিতে অথবা কোন প্রথাকে সমর্থন করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে এই যুক্তি-  
টাই চরম অললম্বন স্বরূপ দাঁড়ায়। যখনই ভারতে ঐতি ও দেশাচার লইয়া  
তর্ক উপস্থিত হয় এবং যখনই ইহা দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, সেই দেশাচারটা  
ঐতিবিরুদ্ধ, তখন অপর পক্ষ তাহার এই উত্তর দিয়া থাকে যে না, উহা  
ঐতিবিরুদ্ধ নহে, উহা ঐতির সেই সকল শাখায় ছিল, যাহা এক্ষণে লোপ



পাইয়াছে। ঐ প্রথাটীও বেদসম্মত। শাস্ত্রের এই সকল নানাবিধ টীকা টিপ্পনীর ভিতর কোন সাধারণ হুত্র বাহির করা অবশ্যই বিশেষ কঠিন। কিন্তু আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল নানাবিধ বিভাগ ও উপ-বিভাগের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তি নিশ্চিতই আছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নিশ্চিত কোন সাধারণ আদর্শে নির্মিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে আমাদের ধর্ম বলি, সেই আপাতবিশৃঙ্খল মতসমষ্টির নিশ্চিত কোন সাধারণ ভিত্তি আছে। তাহা না হইলে ইহা এতদিন চাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না।

আবার আমাদের ভাষ্যকারদিগের ভাষ্য আলোচনা করিতে গেলে আর এক গোল উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুত্যাংশের ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সোজাসুজি অর্থ করেন; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুত্যাংশের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি উহার

শব্দার্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন। ভাষ্যকার নিজ মনোমত অর্থ বাহির করিবার জ্ঞাত সময়ে সময়ে ‘অজ্ঞা’ (জ্ঞানহীনতা) শব্দের অর্থ ছাগী করিয়াছেন—কি অপূর্ব পরিণাম! দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ, এমন কি, ইহাপেক্ষা বিকৃত ভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদে কথ্য আসিয়াছে, সেখানে তাহারা সেই সকল শ্রুত্যাংশের যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সংস্কৃতভাষা এত জটিল, বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র এত সম্পূর্ণ যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক চলিতে পারে। কোন পণ্ডিতের যদি ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যে কোন ব্যক্তির প্রলাপোক্তিকেও যুক্তি, শাস্ত্র ও ব্যাকরণের নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া শুদ্ধসংস্কৃত করিয়া তুলিতে পারেন। উপনিষদ্‌ বুঝিবার পক্ষে এই সকল বাধাবিলম্ব আছে। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপর-  
মদীয় আচার্য্য ঐরামকৃষ্ণদেবের দিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন; যিনি একদিকে যেমন ঘোর ভক্ত, অপরদিকে তেমনি ঘোর জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাকালেই আমি প্রথম উপনিষদ্‌ ও অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্র

মতসম্বন্ধ।

কেবল অন্ধভাবে ভাব্যকারদিগের অঙ্কসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাণে উৎকৃষ্টতর রূপে বুঝিতে শিখিয়াছি। আর আমি এবিষয়ে যৎসামান্য বাহা অমূল্যকান করিয়াছি, তাহাতে আমার মত এই যে, এই সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পর বিরোধী নহে। সূতরাং আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঋতিবাক্যগুলি অতি মনোরম, অতি অদ্ভুত আর উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, উহাদের মধ্যে অপূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটা তব্ধ যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। আমি এই সকল উপনিষদেই একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈততাবের কথা, উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অপূর্ণ অদ্বৈততাবের উচ্ছ্বাসে উহা সমাপ্ত হইয়াছে।

সূতরাং এক্ষণে এই ব্যক্তির জীবনের আলোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

উভয়েরই জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান আছে। ইন্দ্র ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়। দ্বৈতবাদী থাকিবেই; অদ্বৈতবাদীর জায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটী ব্যতীত অপরটী থাকিতে পারে না; একটী অপরটীর পরিণতিস্বরূপ; একটী যেন গৃহ, অপরটী ছাদস্বরূপ। একটী যেন মূল, অপরটী ফলস্বরূপ।

আর উপনিষদের শকার্থের বিপর্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হান্তাস্পদ বলিয়া বোধ হয়; কারণ, আমি দেখিতে পাই, ইহার ভাষাই অপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠতম দর্শনরূপে ইহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, উপনিষদের অপূর্ণ ভাষা। মানবজাতির মুক্তিপথপ্রদর্শক ধর্ম বিজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, উপনিষদিক সাহিত্যে যেমন মহান্ ভাবের অতি অপূর্ণ চিত্র আছে, জগতে আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। এখানেই মনুষ্যমনের সেই প্রবল বিশেষত্ব, সেই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হিন্দু মনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অতীত সকল জাতির ভিতরেই এই মহান্ ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, পাশ্চাত্য কাব্য ও বেদ-সংহিতায় মহান্ ভাবের বর্ণনা। তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান্ ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ মিল্টন, দান্টে, হোমার বা অন্য যে কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য

পর্যালোচনা করা যাউক,—তাহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্তাবব্যঞ্জক

অপূর্ণ শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বত্রই বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশালতাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের সংহিতা তাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ণ শ্লোকমূলে বাহ্য প্রকৃতির মহান্ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব, যতদূর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্ত স্বরূপকে ধরিতে পাণ্ডা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যেসকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও তাহাদিগের প্রকাশে অক্ষম। তখন তাঁহাদের চিন্তা অল্প পথে প্রধাবিত হইল।

উপনিষদে ভাষা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল, উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদোষাতক, স্থানে স্থানে অক্ষুট, যেন উহা তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু অর্ধ উপনিষদের ভাষা পথে গিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক নাস্তিভাবদোষাতক। অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় বস্তু উদ্দেশে দেখাইয়া দিল, তথাপি তোমার সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শোকের তুলনা হইতে পারে?

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্

নেমা বিদ্বাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তথায় সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারারও নহে, এই বিদ্বাতও সেই মহান্কে আলোকিত করিতে পারে না, এই অগ্নির আর কথা কি?

জগতের আর কোথায়, সমগ্র জগতের সমগ্র দার্শনিক ভাবের সম্পূর্ণতর চিত্র পাইবে? হিন্দু জাতির সমগ্র চিন্তার, মানব জাতির মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূপ অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, যেরূপ অপূর্ণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায় পাইবে?

স্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরগ্নঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্ত্যনগ্নন্তোহভিচাক্ষীতি ॥ ইত্যাদি।

একই বৃক্ষের উপর দুইটী সুন্দরপক্ষযুক্ত পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন; তন্মধ্যে একটী সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটী না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখন মিষ্ট কখন বা কটু ফল ভোজন করিতেছে—এবং সেই কারণে কখন সুখী, কখন বা

দুঃখী হইতেছে, কিন্তু উপরি শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী স্থির গভীবভাবে উপবিষ্ট—  
—সে ভাগ্যমন্দ কোন ফলই খাইতেছে না—সে সুখদুঃখ উভয়েই উদাসীন—

নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া অবস্থিত । এটী জীবাত্মার  
উপনিষদের আবস্ত দ্বৈতবাদে চিত্র । মানুষ ইহ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্য ফল  
—সমাপ্ত অধৈতে । উদাহরণ ভোজন করিতেছে—সে কাঞ্চনের অধেষণে মত্ত—

—জীর্ণা ও পরমায়া

গন্ধিষয় ।

সে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ ধাবমান, সংসারের ক্ষণিক

বৃথা সুখের জন্ত মরিয়া হইয়া পাগলের মত

ছুটিতেছে । অথ আর এক স্থলে উপনিষদ্ সারথি ও তাহার দুষ্ট অশ্বের সঙ্গে  
ইহার তুলনা দিয়াছেন । মানুষ এইরূপে জীবনের বৃথা সুখানুসন্ধানচেষ্টায়  
ছুটিতেছে । জীবনের উষাকালে মানুষ কত সোনার স্বপন দেখিয়া থাকে ।  
কিন্তু শীঘ্রই সে বুদ্ধিতে পানে, সেগুলি স্বপ্নমাত্র—বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে সে  
তাহার অতীত কল্পসমূহেরই রোমন্থন করিতে—পুনরাবৃত্তি করিতে— থাকে,  
কিন্তু কিসে এই ঘোর সংসারজাল হইতে বাহির হইবে, তাহার কিছু উপায়  
খুঁজিয়া পায় না । মানুষের ইহাই নিয়তি । কিন্তু সকল মানবেরই জীবনে  
সময়ে সময়ে এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া থাকে,—গভীরতম শোকে, এমন কি,  
গভীরতম আনন্দের সময় মানুষের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়,  
যখন যেন সেই সূর্যালোকাবরোধকাবী মেঘ ক্ষণকালের জন্ত সরিয়া যায় ।  
তখন আমরা আমাদের এই সীমাবদ্ধ ভাব সঙ্কেত ক্ষণকালের জন্ত সেই  
সর্বাঙ্গীত সত্তার চকিতবৎ দর্শনলাভ করি—দূরে দূরে—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবনের  
অনেক পশ্চাতে—দূরে দূরে—এই সংসারের ব্যর্থ ভোগ—ইহার সুখদুঃখ  
হইতে অনেক দূরে, দূরে দূরে—প্রকৃতির পারে—ইহলোকে বা পরলোকে  
আমরা যে সুখভোগের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা হইতে বহু দূরে, বিবৈষণা,  
লোকৈষণা, প্রজৈষণা হইতে বহুদূরে । তখন মানুষ ক্ষণিকের জন্ত দিব্যদৃষ্টি  
লাভ করিয়া স্থিরভাবে অবলম্বন করে—সে তখন বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত  
অপর পক্ষীকে শাশ্বত ও মহিমাময় অবলোকন করে—সে দেখে, তিনি স্বাচ্ছন্দ্য  
অস্বাচ্ছন্দ্য কোন ফল ভোজন করিতেছেন না—তিনি নিজ মহিমায় নিজে  
বিভোর, আনন্দমগ্ন—যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছে ;—

যস্মাৎস্মরতিরেব শ্রাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মাত্মেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্গ্যং ন বিদ্যতে ॥

যিনি আত্মরতি, আনন্দমগ্ন ও যিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাহার আর কি

কার্য অবশিষ্ট থাকে ? তিনি আর কেন বুঝাকার্য্য করিয়া সমস্ত কাটাইবেন ?

একবার চকিতভাবে ব্রহ্মদর্শনের পর আবার সে ভুলিয়া যায়, আবার সংসাররন্ধ্রে স্বাদু অস্বাদু ফল ভোজন করিতে থাকে—আর তখন তাহার কিছু মাত্র স্মরণ থাকে না। আবার হয়ত কিছুদিন পরে সে আর একবার পূর্বের স্মার্য্য ব্রহ্মেব চকিত দর্শন লাভ করে। যতই ঘা খায়, ততই সেই নিয়মশাখা-বলবী পক্ষী উপরিস্থ পক্ষীর নিকটস্থ হইতে থাকে। যদি সে সৌভাগ্যক্রমে ক্রমাগত সংসারের তীব্র আঘাত পায়, তবে সে তাহার সঙ্গী, তাহার প্রাণ, তাহার সখা সেই অপর পক্ষীর ক্রমশঃ সমীপবর্তী হইতে থাকে। আর যতই সে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, ততই দেখে, সেই উপরিস্থ পক্ষীর দেহের জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার পক্ষের চতুর্দিকে খেলা করিতেছে। আরও যত সমীপবর্তী হয়, ততই তাহার রূপান্তর চলিতে থাকে। ক্রমশঃ যত সে অতি নিকটে উপস্থিত হয়, ততই দেখে, সে যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে—অবশেষে তাহার সম্পূর্ণ তিরোভাব ঘটে। তখন সে বুঝিতে পারে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না, সে সেই অপর পক্ষীর প্রতিবিম্বমাত্র—যে সেই সঞ্চরপশীল পত্ররাশির উপর শাস্ত ও গভীরভাবে বসিয়াছিল। তখন সে জানিতে পারে, উপরিস্থ পক্ষীই সে সে সদাকাল শাস্তভাবে অবস্থিত ছিল—তাহারই সেই মহিমা। তখন আর কোন ভয় থাকে না ; তখন সে সম্পূর্ণ ভূপ্ত হইয়া ধীর শান্তভাবে অবস্থান করে। এই রূপকে উপনিষদ্ দ্বৈততাব হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ান্ত অদ্বৈততাবে লইয়া যাইতেছেন।

উপনিষদের এই অপূর্ণ কবিত্ব, মহত্বের চিত্র, এই মহোচ্চ ভাবসমূহ দেখাইবার জন্য শত শত উদাহরণ প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু এই বক্তৃতায়

আমাদের আর তাহার সময় নাই। তবে আর উপনিষদের ভাষার আর এক একটা কথা বলিব ;—উপনিষদের ভাষা, ভাব বিশেষত্ব—উহার ভাষায় সকলেরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই, উহার ঘোরফের নাই।

প্রত্যেক কথাই তরবারিফলকের স্মার্য্য হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎভাবে হৃদয়ে আঘাত করিয়া থাকে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরটীরই একটা জোর আছে, প্রত্যেকটাই তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া যায়। কোন ঘোরফের নাই, একটীও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই, একটীও জটিল

বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপকবর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর বিশেষণ দিয়া ক্রমাগত ভাবটিকে জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টী একেবারে চাপা পড়িল,—মাথা গুলাইয়া গেল—তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না। উপনিষদে এরূপ চেষ্টা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহারা তখনও তাহাদের জাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা আমাদের তেজবীর্য্যের কথা বলিয়া থাকে।

এই বিষয়টী বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে—সমগ্র জীবন আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ্ বলিতেছেন হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানব কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, উপনিষদের উপদেশ—ভয়শূণ্য হও, তেজস্বী হও।

আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই ‘নাভয়েৎ’—ভয়শূণ্য হও—এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি ‘অতী’ ভয়শূণ্য এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। ‘নাভয়েৎ’ ভয়শূণ্য হও—আর আমার মনশ্চক্রে সমক্ষে সেই সুদূর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্যদেশীয় সম্রাট্ আলেকজান্ডারের চিত্র উদ্ভিত হইতেছে—আমি যেন দেখিতেছি,—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির, আমাদেরই

সন্ন্যাসী ও দিগ্বিজয়ী

আলেকজান্ডার।

জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন—সম্রাট্ সন্ন্যাসীর অপূর্বজ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থমানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থমানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্ত সহকারে গ্রীস যাইতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সম্রাট্ নিজ প্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, ‘যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।’ তখন সন্ন্যাসী উরুহাস্ত করিয়া বলিলেন, ‘তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখন বল নাই। আমার মারে কে ?

জড়জগতের সন্ধান, তুমি আমায় মারিসে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি চৈতন্যরূপ, অজ ও অক্ষয়; আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিবও না; আমি অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে? ইহাই প্রকৃত তেজ।

আর হে বন্ধুগণ, আমি যতই উপনিষদ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জ্ঞান অংশবিসর্জন করিয়া থাকি; কারণ, উপনিষদেই এই তেজস্বিতাই আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি, শক্তি—ইহাই আমাদের চাই; আমাদের শক্তির বিশেষ আবশ্যক

হইয়া পড়িয়াছে। কে আমাদের শক্তি দিবে?

পুরাণের গল্প ছাড়া  
উপনিষদের তেজ অবলম্বন  
কর।

আমাদিগকে দুর্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের

প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতের যত পুস্তকালয় আছে, তাহার অর্ধেকেরও উপর পূর্ণ হইতে পারে। এ সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্বল করিতে পারে, তাহা আমাদের বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, কিরূপে আমাদের দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আমরা প্রকৃতপক্ষে কীটতুল্য দাঁড়াইয়াছি—এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদের মাড়াইয়া বাইতেছে। হে বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমি শোণিতসম্বন্ধে সন্দ্বন্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবন মরণ। আমি তোমাদিগকে পূর্বোক্ত কারণ সমূহের জ্ঞান বলিতেছি, আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকররূপ। উপনিষদে যে শক্তিসংস্কারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীৰ্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতিব, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি—শারীরিক মুক্তি, মানসিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র, যাহাতে উদ্ধারের (Salvation) কথা বলে না, মুক্তির কথা বলে। প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হও, দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

আর উপনিষদ্ তোমায় ইহাও দেখাইয়া দেয় যে, ঐ যুক্তি তোমার মধ্যে  
পূৰ্ণ হইতেই বিদ্যমান। এই মতটী উপনিষদের  
জ্ঞান স্বরূপত্ব; ঐ বিষয়ে আর একটী বিশেষত্ব। তুমি দ্বৈতবাদী; তা হউক,  
দৈত ও অদ্বৈতবাদীর কিস্ত তোমাকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে,  
একমত।

আত্মা স্বভাবতঃই পূর্ণস্বরূপ। কেবল কতকগুলি  
কার্যের দ্বারা উহা সঙ্কুচিত হইয়াছে মাত্র। আধুনিক পরিণামবাদীরা  
(Evolutionists) বাহাকে ক্রমবিকাশ (Evolution) ও ক্রমসঙ্কোচ  
(Atavism) বলিয়া থাকেন, রামানুজেরও সঙ্কোচ বিকাশের মত তদ্রূপ।  
আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া যেন সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন,  
তাঁহার শক্তিসমূহ অব্যক্তভাবে ধারণ করে; সং কর্ম ও সং চিন্তা দ্বারা উহা  
পুনরায় বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং তখনই উহার স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রকাশিত হয়।  
অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রভেদ এইটুকু যে, অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির  
দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর পরিণাম স্বীকার করেন, আত্মার নহে। মনে কর,  
প্রভুদেবঃ—অদ্বৈতবাদী একটী যবনিকা রহিয়াছে আর ঐ যবনিকাটিতে  
প্রকৃতির পরিণাম মনেন, একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। আমি ঐ যবনিকার  
আত্মার নহে। অন্তরালে থাকিয়া এই মহতী জনতাকে দেখিতেছি।

আমি প্রথমে কেবল কতকগুলি অল্পমাত্র মুখ দেখিতে পাইব। মনে কর,  
ছিদ্রটী বাড়িতে লাগিল। ছিদ্রটী যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই আমি  
এই সমবেত ব্যক্তিদিগের অধিক সংখ্যককে দেখিতে পাইব। শেষে ছিদ্রটী  
বাড়িয়া বাড়িয়া যবনিকা ও ছিদ্র এক হইয়া যাইবে। তখন তোমাদেরও আমার  
মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিবে না। এ স্থলে তোমাদের বা আমার কোন  
রূপ পরিবর্তন হয় নাই। যাহা কিছু পরিবর্তন কেবল যবনিকাটীতে ঘটিয়াছে।  
তোমরা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরূপই ছিলে, কেবল যবনিকাটীর পরিবর্তন  
হইয়াছিল। পরিণাম সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর ইহাই মত—প্রকৃতির পরিণাম  
ও অভ্যন্তরীণ আত্মার স্বরূপাণ্ডিব্যক্তি। আত্মা কোনরূপে সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইতে  
পারে না। উহা অপরিণামী ও অনন্ত। উহা যেন মায়াবরূপ অবগুণ্ঠনে  
আবৃত্ত হইয়াছিল—যতই এই মায়াবরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়, ততই  
আত্মার জন্মগত স্বাভাবিক মহিমার আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশঃ উহা অধিকতর  
অভিব্যক্ত হইতে থাকে।

এই মহান তত্ত্বটী জগৎ ভারতের নিকট শিখিবার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে।



তাহারা বাহাই বলুক, তাহারা যতই আগনাদের গরিমা প্রকাশের চেষ্টা করুক, ক্রমশঃ যত দিন যাইবে, তাহারা বুঝিবে যে, এই তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না। তোমরা

আত্মা স্বভাবতঃই পূর্ণস্বরূপ  
—এই মতবাদের  
কার্যকারিতা।

কি দেখিতেছ না, সকল বিষয়েই কিরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইতেছে ? তোমরা কি দেখিতেছ না, পূর্বে সবই স্বভাবতঃই মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা স্বভাবতঃ ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ? কি শিক্ষাপ্রণালীতে, কি অপরাধিগণের শাস্তিবিধানে, কি উন্নত চিকিৎসায়, এমন কি, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসায় পর্য্যন্ত প্রাচীন নিয়ম ছিল—সবই স্বভাবতঃ মন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া। আধুনিক নিয়ম কি ? আধুনিক বিধান বলে, শরীর স্বভাবতঃই সুস্থ ; উহা নিজ প্রকৃতিবশে ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকে। ঔষধ বড় জোর শরীরের মধ্যে সার পদার্থসমূহের সঞ্চয়ে সাহায্য করিতে পারে। অপরাধীদের সম্বন্ধে এই নব বিধান কি বলে ? নূতন বিধান স্বীকার করিয়া থাকে যে, কোন অপরাধী ব্যক্তি যতই হীন হউক, তথাপি তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহার কখন পরিবর্তন হয় না, সুতরাং অপরাধিগণের প্রতি আমাদের তদ্রূপ ব্যবহার করা কর্তব্য। এখন পূর্বের ভাব সব বদলাইয়াছে। এখন কারাগারকে তাহারা সংশোধনাগার বলে। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জাতসারে বা অজাতসারে ভারতাস্তগত বা ভারতবহির্ভূত প্রদেশস্থ জনগণের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। আর তোমাদের শাস্ত্রেই কেবল ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে ; তাহাদিগকে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেই হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্তন আসিবে আর মানুষের দুর্বলতা প্রদর্শনরূপ সেকলে ভাব উঠিয়া যাইবে। এই শতাব্দীর মধ্যেই উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এখন লোকে আমাদিগকে গালমন্দ করিতে পারে। “জগতে পাপ নাই” এই ঘোর পৈশাচিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি বলিয়া জগতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত লোকে আমাকে গালি দিয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এক্ষণে যাহারা আমায় গালি দিতেছেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ, আমি অধমের প্রচার করি নাই, ধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছি, বলিয়া আমাকে আলীকাদ করিবে। আমি অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার না করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তারে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া গৌরব অমুভব করিয়া থাকি।

জগৎ আমাদের উপনিষদ্ হইতে আর এক মহান্ উপদেশ লাভ করি-  
বার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে—সমগ্র জগতের অধঃপতন । অতি প্রাচীন কালে

উপনিষদ্ হইতে জগৎ আর  
এক তর শিখিবে—সমগ্র  
জগতের অধঃপতন ।

এক বস্তুতে আর এক বস্তুতে যে পার্থক্য বিবেচিত  
হইত, এখন অতি শীঘ্র শীঘ্র সেগুলি চলিয়া  
যাইতেছে । তাড়িত ও বাষ্পবল জগতের বিভিন্ন  
অংশকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া  
দিতেছে । তাহার ফলস্বরূপ, আমরা হিন্দুগণ এক্ষণে আর আমাদের দেশ  
ছাড়া সব দেশ কেবল ভূতপ্রেত রাক্ষস পিশাচে পূর্ণ দেখি না এবং খৃষ্টিয়ান  
দেশের লোকেরাও বলেন না, ভারতে কেবল নরমাংসভোজী অসভ্যগণের  
বাস । আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেখিতে পাই, আমাদেরই  
ব্রাতা সাহায্যের জন্ত তাঁহার দূত বাহ প্রসারণ করিয়া দিতেছেন, আর মুখে  
উৎসাহ দিতেছেন । বরং সময়ে সময়ে অপর দেশে আমাদের নিজ দেশ  
হইতে অনেক ভাল লোক দেখিয়া থাকি । তাহারাও যখন এখানে আসে,  
তাহারাও এখানে তাহাদেরই মত ব্রাহ্মভাব, উৎসাহবাক্য ও সহানুভূতি  
পাইয়া থাকে । আমাদের উপনিষদ্ ঠিকই বলিয়াছেন,—অজ্ঞানই সর্ব-  
প্রকার দুঃখের কারণ । সামাজিক বা আধ্যাত্মিক, আমাদের জীবনের যে  
কোন বিষয়ে খাটাইয়া দেখা যায়, তাহাতেই উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ  
হয় । অজ্ঞানই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পর পরস্পরকে  
জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরে ভালবাসা নাই । যখনই আমরা  
পরস্পরে ঠিক ঠিক পরিচিত হই, তখনই আমাদের মধ্যে প্রেমের উদয় হইয়া  
থাকে । প্রেমের উদয় হইবেই—কারণ, আমরা কি সকলেই এক আত্মস্বরূপ  
নহি ? স্মৃতরাঃ আমরা দেখিতে পাই, চেষ্টা না করিলেও আমাদের সকলের  
একত্বভাব স্বভাবতই আসিয়া থাকে । এমন কি, রাজনীতি ও সমাজ-  
নীতিক্ষেত্রেও যে সকল সমস্তা বিশ বর্ষ পূর্বে কেবল জাতীয় সমস্তা ছিল, এখন  
আর জাতীয় ভিত্তিতে তাহাদের মীমাংসা করা যায় না । উক্ত সমস্যাগুলি  
ক্রমশঃ বিপুলাবয়ব হইতেছে, বিশাল আকার ধারণ করিতেছে । আন্তর্জাতিক  
ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই কেবল উহাদের মীমাংসা করা যাইতে  
পারে । আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সত্য, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই  
আজকালকার মূলমন্ত্রস্বরূপ । সকলের ভিতর একত্বভাব কিরূপ বিস্তৃত হই-  
তেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ । বিজ্ঞানেও জড়ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ সার্ব-

ভৌমিক ভাবই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে, সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাক—তুমি আমি, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি, আর যাহা কিছু, সবই এই মহান সমুদ্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তের নামমাত্র, আর কিছু নহে। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়; তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রের আবর্তস্বরূপ। আর আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল, অপরিবর্তনশীল সত্তা বলিয়া প্রতীত হয়। নীতিতত্ত্বের ভিত্তি সম্বন্ধেও জগৎ জানিতে ব্যাকুল—তাহাও আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ভারতে আমাদের কি প্রয়োজন? যদি বৈদেশিকগণের এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের ঐগুলির বিশ গুণ প্রয়োজন আছে।

কারণ, আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউক, আমাদের হীনতার প্রধান কারণ শারীরিক দৌর্বল্য। অত্যাশ্রু জাতির সহিত তুলনায় আমাদের পুংপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমতঃ,—আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য। এই শারীরিক দৌর্বল্য অন্ততঃ আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস; আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা এক সঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি দ্বেষ্য করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই লইয়া বিবাদ করিতেছি যে, তিলক ধারণ এই ভাবে করিতে হইবে কি ঐ ভাবে। অমুক ব্যক্তিকে দেখিলে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কি না, এতদ্বিধ গুরুতর সমস্যা সমূহের উপর বড় বড় বই লিখিতেছি! যে জাতির মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি এইরূপ অপূর্ণ সুন্দর সুন্দর সমস্যার গবেষণায় নিযুক্ত, তাহারা এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, তদপেক্ষা তাহাদের আর কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? আর আমাদের লজ্জাও হয় না! হাঁ, কখন কখন হয় বটে, কিন্তু আমরা যাহা ভাবি, তাহা করিতে পারি না। আমরা ভাবি অনেক জিনিষ, কিন্তু, তন্মধ্যে অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করি না। এইরূপে তোতা পাখীর মত চিন্তা এবং বচন আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পক্ষাৎপদ।

ইহার কারণ কি ? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ । দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না ; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে । আমাদের যুবক-গণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে ; ধর্ম পরে আসিবে । হে আমার যুবক

বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও,—ইহাই তোমাদের প্রতি  
গীতা ও ফুটবল ।

আমার উপদেশ । গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে । আমাকে অতি সাহসপূর্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে ; কিন্তু না বলিলেই নয় । আমি তোমাদিগকে ভালবাসি । আমি জানি, জুতা কোন্ খানে পায়ে লাগিতেছে । আমার যৎ-কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে । তোমাদের গুলি একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে । তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে । যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা আপনাদিগকে মাছুষ বলিয়া বুঝিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে । এইরূপে বেদান্ত আমাদের কাছে লাগাইতে হইবে । লোকে অনেক সময় আমার অদ্বৈতবাদ প্রচারে বিরক্ত হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা অত্র কোন বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে । আমাদের এখন কেবল আবশ্যক—আত্মার এই অপূর্ণ তত্ত্ব, উহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া ।

যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে আমি সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, ‘ত্বমসি নিরঞ্জনঃ’ । তোমরা পুরাণে

রাজ্ঞী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করি-  
‘ত্বমসি নিরঞ্জনঃ ।’

রাছ । তাঁহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে অহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া তাহাকে দোল দিতে দিতে তাহার নিকট গাহিতে আরম্ভ করিলেন, ‘ত্বমসি নিরঞ্জনঃ ।’ এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে । তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে । সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে । আমি সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম ? ইংরাজেরা পাপ, পাপী ইত্যাদি লইয়া অনেক কথা বলিয়া থাকে আর বাস্তবিক যদি সকল ইংরাজ আপনাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তবে আফ্রিকার মধ্যভাগনিবাসী নিগ্রোদের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য থাকিত না । ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা একথা

বিশ্বাস করে না, বরং বিশ্বাস করে, সে জগতের অধীশ্বর হইয়া জন্মিয়াছে। সে আপনার মহত্বে বিশ্বাসী; সে বিশ্বাস করে, সে সব করিতে পারে, ইচ্ছা হইলে সে স্বর্ঘ্যলোকে চন্দ্রলোকে বাইতে পারে; তাহাতেই সে বড় হইয়াছে। যদি সে তাহার পুরোহিতদের বাক্যে

ইংরাজেরা বড় কিসে ?

তাহাদের আত্মবিশ্বাসের  
জোবে।

আত্ম স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিত যে, সে একজন ক্ষুদ্র হতভাগ্য পাপীমাত্র, অনন্ত কাল ধরিয়া

তাহাকে নরকায়িতে দগ্ধ হইতে হইবে, তবে আজ

তাহাকে যেকূপ দেখিতেছ, সেরূপ বড় সে কখন হইত না। এইরূপ আমি প্রত্যেক জাতির ভিতরই দেখিতে পাই, তাহাদের পুরোহিতেরা যাহাই বলুক এবং তাহারা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক, তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতাব কখন বিলুপ্ত হয় না। উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। আমরা বিশ্বাস হারা-ই-রাছি। তোমরা কি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আমরা ইংরাজ নরনারী অপেক্ষা কম বিশ্বাসী, সহস্রগুণে কম বিশ্বাসী। আমাদের স্পষ্ট কথা বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই। তোমরা কি দেখিতেছ না, ইংরাজ নরনারী যখন আমাদের ধর্মতত্ত্ব একটু আধটু বুঝিতে পারে, তখন তাহারা যেন উহা লইয়া উন্নত হইয়া উঠে, আর যদিও উহারা রাজার জাতি, তথাপি তাহাদের স্বদেশীয় লোকের উপহাস ও বিক্রপ উপেক্ষা করিয়া ভারতে আমাদের ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া থাকে? তোমাদের মধ্যে কজন ইহা করিতে পার? এই কথাটা কেবল ভাবিয়া দেখ। আব করিতে পার না কেন? তোমরা কি জাননা বলিয়া করিতে পার না?

তোমরা জান বেশী, কিন্তু  
শারীরিক দৌর্বল্য হেতু  
তোমাদের কার্য্য করিবার  
ক্ষমতা নাই।

তা নয়, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা বেশী জান, তাই তোমরা কাষে করিতে পার না। তোমাদের পক্ষে যতটা জানিলে কল্যাণ, তাহা অপেক্ষা তোমরা বেশী জান; ইহাই তোমাদের মুক্তি।

তোমাদের রক্ত কলুষিত, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিল, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরটাকে বদলাইয়া ফেল, শরীরটা বদলাইতেই হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে। গত কয়েক শত বর্ষ ধরিয়া তোমরা নানাবিধ সঙ্কার, আদর্শ প্রভৃতির কথা কহিয়াছ কিন্তু কাষের সময় আর তোমাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ তোমাদের আচরণে সমগ্র জগৎ

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আর সংস্কার নামটা পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি ? তোমাদের জ্ঞানের কি কিছু কৃতি আছে ? জ্ঞানের কৃতি কোথায় ? তোমরা যে অতিরিক্ত জ্ঞানী ! সকল অনিষ্টের মূল কারণ এই যে, তোমরা দুর্বল, দুর্বল অতি দুর্বল ; তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে নাই। শত শত শতাব্দী ধরিয়া অভিজাত জাতি, রাজা ও বৈদেশিকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ; হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্বজন তোমাদের সব বল হরণ করিয়াছে। তোমরা এক্ষণে পদ-দলিত, ভয়দেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের তায় হইয়াছ। কে আমাদিগকে এক্ষণে বল দিবে ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চাই এক্ষণে বল, চাই এক্ষণে বীৰ্য্য।

এই বীৰ্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে, ‘আমি আত্মা’ ‘আমায় তরবারি ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমায় বিধ্বাস। ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু গুল্ক করিতে পারে না ; আমি সর্বশক্তিমান, আমি সর্বজ্ঞ।’ অতএব এই আশাপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি সর্বদা উচ্চারণ কর। বলিওনা, আমরা দুর্বল ; আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি ? আমাদের দ্বারা সব হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমাময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার তায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবিস্কৃত হউক। আর তোমাদের প্রত্যেকেই মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হইয়া ইঙ্গিতে জগৎকে পরিচালন করিবে ; সর্ব প্রকারে তোমরা অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হইবে। আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তিকলাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এই সর্ব উপনিষদে রহিয়াছে।

এঁরা এ যে শুধু সন্ন্যাসীর জন্ত, এ যে রহস্য বিদ্যা ! প্রাচীন কালে আর বোসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করিতেন। শব্দর একটু

সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে ; ইহাতে তাহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না। তবু লোকের মন হইতে এ সংস্কার এখনও যায় না যে, উপনিষদে কেবল বনজঙ্গলের কথাই আছে। আমি তোমাদিগকে আর এক দিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা, একমাত্র প্রামাণ্য টীকাস্বরূপ গীতা অনন্তকালের জন্ত রূপিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকাটিরনী চলিতে পারে না। এই গীতায় বেদান্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কার্য্যই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা, যে যে কার্য্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

আর ভয়ের কোন কাবণ নাই। উপনিষদ্ নিহিত তত্ত্বাবলি জেলেমালা লোকে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে ? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্ত পথ আছে। ধর্ম্ম অনন্ত, ধর্ম্মেব গভী ছাড়াইয়া কেহ যাইতে পারে না। আব তুমি বাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। অতি স্বল্প কর্ম্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে অদ্বুত ফল লাভ হয়। অতএব যে যতটুকু পারে, করুক। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে ; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে। এইরূপ অগাণ্ড সকলই সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

আর ইহার ফল এই হইবে যে, ভাতিবিভাগ অনন্তকালের জন্ত থাকিয়া যাইবে। সমাজের প্রকৃতিই এই,—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। তবে চলিয়া যাইবে কি ? বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি আর থাকিবে না। অতি

বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য  
বেদান্ত প্রচারের দ্বারা জাতি-সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে  
বিভাগ অনন্তকালের জন্য পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার,  
ধাকিয়া যাইবে, বিশেষ আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু  
বিশেষ অধিকারগুলি কেবল তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না।  
নষ্ট হইবে। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার ?

আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি ? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি  
জুতা সেলাই করিতে পটু ; তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার  
মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে তোমায় প্রশংসা করিতে হইবে  
আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমায় ফাঁসি দিতে হইবে, এরূপ  
হইতে পারে না। এই অধিকারতারতম্য উঠিয়া যাইবে। জাতিবিভাগ  
ভাল জিনিষ। জীবনসমস্তা সমাধানের ইহাই স্বাভাবিক পথ। লোকে  
আপনাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিবে ; ইহা অতিক্রম করিবার  
উপায় নাই। যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ  
ইহা নহে যে, এই অধিকারতারতম্যগুলিও থাকিবে। এগুলিকে সমূলে  
নির্মূল করিতে হইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিক্ষাও, সে বলিবে, তুমিও  
যেমন, আমিও তেমন। তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎশজীবী।  
কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন।  
আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ  
প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে  
নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রয়োজন—স্বাধী-  
নতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ এ কথা বলিতে  
আমরা জগতের সাহায্য সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক  
করিতে পারি না, সেবার অমুক ছেলেটীর মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অত্যা-  
আমাদের অধিকার। কথ্য, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে। আমি  
বারম্বার পৃষ্ট হইয়াছি, আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণী জাতির উন্নতির  
উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন ? আমি এ প্রশ্নের এই চরম উত্তর দিতেছি—  
আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমি কি  
স্ত্রীলোক যে, আমাকে বারবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তুমি কে হে



স্বায়ে পড়ে নারীজাতির সমস্ত সমাধানে আগ্রহান হইতেছে? তুমি কি প্রত্যেক বিধবা ও প্রত্যেক রমণীর অন্তর্যামী সাক্ষাৎ ভগবান্ নাকি? তফাত। উহার। আপনাদের সমস্ত আপনাই পূরণ করিবে। কি আপদ্ যথেষ্টাচারী অত্যাচারিগণ, তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা সকলের জন্ত সব করিতে পার। যাও, তফাত হও। ভগবান্ সকলকে দেখিবেন। তুমি কে যে, তুমি আপনাকে সর্বজ্ঞ মনে করিয়া গিয়াছ? হে নাস্তিকগণ, তোমরা খোদার উপর খোদাকারী করিতে সাহস কর কিসে? কারণ, হে নাস্তিকগণ, তোমরা কি জ্ঞান না, সকল আত্মাই পরমাত্মা স্বরূপ? নিজের চরকায় তেল দাও, তোমার নিজের ঘাড়ে এক বোঝা কর্ম রহিয়াছে। হে নাস্তিকগণ, তোমাদের সমগ্র জাতি তোমাকে গাছে তুলিয়া দিতে পারে, তোমাদের সমাজ তোমাকে হাততালি দিয়া আকাশে তুলিয়া দিতে পারে, আহাঙ্গকেরা তোমার সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিদ্রিত নহেন; তিনি তোমাকে ধরিয়া ফেলিবেন আর ইহলোকে বা পরলোকে তুমি নিশ্চিত শাস্তি পাইবে। অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অঙ্গগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেঁট বিষ্টু ভেবো না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাত, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি। আমার নিজ মুক্তির জন্ত আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্ত—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুঞ্জী, পাপী প্রভৃতিরূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে ইহা বলিতেই হইবে, কারণ, তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্ন রূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি জোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বাহ্য কিছু

আবশ্যক, গ্রহণ করে, ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেই ভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।

জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; আলোক, আলোকে লইয়া এস। প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক; যতক্ষণ না সকলেই ভগবানের নিকট পৌঁছায়, ততক্ষণ যেন তোমাদের কার্য শেষ না হয়। দরিদ্রদের নিকট জ্ঞানালোক বিস্তার কর, ধনীদের নিকট আরো অধিক আলো লইয়া এস,

জগতের সর্বত্র জ্ঞানালোক বিস্তার কর।  
কারণ, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের অধিক আলোর প্রয়োজন। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া এস, শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আরো অধিক আলো, কারণ, আজকাল তোমাদের শিক্ষাভিমান বড় প্রবল। এইরূপে সকলের নিকট আলোক বিস্তার কর, অবশিষ্ট বাহা কিছু সেই প্রভু করিবেন, কারণ, সেই ভগবান্‌ই বলিয়াছেন,—

কর্মণ্যোবাধিকাস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূর্ত্মা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি ॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে; তুমি এমন ভাবে কর্ম্ম করিও না, যাহাতে তাহার ফল তোমায় ভোগ করিতে হয়, অথচ কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

যিনি শত শত যুগ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে ও আমাদের এইরূপ মহোচ্চ তত্ত্বসমূহ শিখাইয়াছেন, তিনি যেন আমাদের কাছাকাছি থাকেন।

## ভারতীয় মহাপুরুষগণ ।

ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া আমার মনে সেই প্রাচীনকালের কথা উদিত হইতেছে, ইতিহাসে যে কালের কোন ঘটনার উল্লেখ করে না এবং কিম্বদন্তী যে স্মৃতির অতীতের সনাতন সত্য ও যুগধর্ম্ম। যনাকার হইতে রহস্য উদ্ঘাটনের কথা চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন—বাস্তবিক

হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া অসংখ্য মহাপুরুষ প্রসব ব্যতীত আর কিছু করে নাই। সুতরাং, আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটির বিষয়—যুগপ্রবর্তনকারী আচার্য্যগণের জীবনী লইয়া, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাদের নিকট বলিব। প্রথমতঃ, আমাদের শাস্ত্রসম্বন্ধে আমাদের কিছু বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সত্যের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে—প্রথম সনাতন সত্য; দ্বিতীয় প্রকারটী প্রথমোক্তের জায় ততদূর প্রামাণ্য না হইলেও বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে প্রযুক্ত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় শ্রুতি বা বেদে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় প্রকার সত্য,—স্মৃতি যথা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায়, এবং পুরাণে ও তন্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলির প্রামাণ্য শ্রুতির অধীন, কারণ, স্মৃতি যদি শ্রুতির বিরোধী হয়, তবে শ্রুতিকেই সে স্থলে মানিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রবিধান। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার নিয়তি ও তাহার চরমোদ্দেশ্য মোটামুটি বর্ণিত হইয়াছে, স্মৃতি ও পুরাণে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে। সামান্য ভাবে উপদেশে শ্রুতিই পর্য্যাপ্ত; ধর্ম্মজীবন যাপনের সার তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিনির্দিষ্ট উপদেশের অধিক আর কিছু বলা যাইতে পারে না, আর কিছু জানিবার নাই। এ বিষয়ে বাহা কিছু প্রয়োজন, সবই শ্রুতিতে আছে; জীবাত্মার সিদ্ধিলাভের জন্ত যে সকল উপদেশের প্রয়োজন, শ্রুতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান শ্রুতিতে নাই; স্মৃতি বিভিন্ন সময়ের জন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির আর একটা বিশেষত্ব আছে। যে সকল মহাপুরুষ শ্রুতিতে বিভিন্ন সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ( ইহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, তবে কয়েকজন নারীরও উল্লেখ দেখা যায় ) তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে, যথা তাঁহাদের জন্মের সন তারিখ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জানিতে পারি; কিন্তু তাঁহাদের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা—( তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়া বলিলেই ভাল হয় ) আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্যরূপ বেদে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত আছে। স্মৃতিতে কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী ও কার্য্যকলাপই বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেই আমরা প্রথম অদ্বুত, মহাশক্তিশালী, মনোহরচরিত্র, ইন্দ্রিতে সমগ্র জগতের পরিচালক মহা-

পুরুষগণের পরিচয় পাইয়া থাকি—তাহাদের চরিত্র এতদূর উন্নত যে, তাহাদের উপদেশাবলিও যেন তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের ধর্মের একটা বিশেষত্ব আমাদেরকে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের ধর্মে যে ঈশ্বরের উপদেশ আছে, তিনি নিগূণ অথচ সগুণ।

উহাতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রহিত সনাতন তত্ত্বের হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রভেদ; সত্বে সত্বে ব্যক্তিত্বাপন্ন ঈশ্বরের উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু ক্রটি বা বেদই আমাদের ধর্মের মূল—উহাতে কেবল সনাতন তত্ত্বের উপদেশ; বড় বড় অবতার, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের বিষয় সমস্তই স্মৃতি ও পুরাণে আছে। আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, কেবল আমাদের ধর্ম ছাড়া জগতের অন্যান্য সকল ধর্মই কোন বিশেষ ধর্ম-প্রবর্তক বা ধর্মপ্রবর্তকগণের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ। খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের মুসলমানধর্ম মহম্মদের, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের, জৈনধর্ম জিনগণের এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য ব্যক্তিগণের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই সকল ধর্মে ঐ মহাপুরুষগণের জীবনের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইয়া যে যথেষ্ট বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। যদি কখন এই প্রাচীন মহাপুরুষগণের অস্তিত্ববিষয়ক ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্বল হয়, তবে তাহাদের ধর্মরূপ অট্টালিকা পড়িয়া গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। আমাদের ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সনাতন তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের এরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। তোমরা যে তোমাদের ধর্ম মানিয়া চল, তাহার কারণ ইহা নহে যে, কোন মহাপুরুষ বা অবতার উহার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণের বচনে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদান্তগত বলিয়াই কৃষ্ণবাক্যের প্রামাণ্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে, বেদের প্রচারক যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষগণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা গোড়াতেই একথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষ্যের পূর্ণতা লাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য বাহ্য কিছু আবশ্যক, সবই বেদে কথিত হইয়াছে। নূতন কিছু আর আবিষ্কার হইতে পারে না। তুমি কখনই সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্বরূপ পূর্ণ একত্বকে ছাড়াইয়া যাইতে পার না। বেদ অনেক দিন পুণেই এই পূর্ণ একত্ব আবিষ্কার

করিয়াছেন, ইহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব । যখনই ‘তত্ত্বমসি’ আবিষ্কৃত হইল, তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল—এই তত্ত্বমসি বেদে রহিয়াছে । বাকি রহিল কেবল বিভিন্ন দেশকালপাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোক-শিক্ষা । এই প্রাচীন, সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা ইহাই বাকি রহিল—সেই জন্তই সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে । গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্বজনপরিজ্ঞাত বাণীতে এই তত্ত্বটী যেরূপ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, কুত্রাপি তদ্রূপ হয় নাই ।

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাঙ্গানং সৃজাম্যহং ॥ ইত্যাদি—

‘যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি । অধর্ম্মের নাশের জন্ত আমি সময়ে সময়ে আবিভূত হইয়া থাকি ।’ ইত্যাদি । ভারতে ইহাই ধারণা ।

ইহা হইতে কি দাঁড়াইতেছে ? দাঁড়াইতেছে এই যে, একদিকে এই সনাতন তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে । ঐগুলি স্বতঃপ্রমাণ, উহারা কোনরূপ যুক্তির

উপর পর্য্যন্ত নির্ভর করে না । খৃষ্টিয়ান, তাঁহারা  
হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সার্ব-  
ভৌমিক ধর্ম্ম কেন ? যতই বড় হউন অথবা অবতারগণ, তাঁহারা যতই  
মহিমাসম্পন্ন হউন, তাঁহাদের বাক্যের উপর

নির্ভর করা ত দূরের কথা ! আমরা এখানে একথা বলিতে পারি যে, অতীত দেশ হইতে ভারতীয় চিন্তার এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আমরা বেদান্তকেই একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া দাবী করিতে পারি, বেদান্তই জগতের একমাত্র বর্তমান সার্বভৌমিক ধর্ম্ম ; কারণ, উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় না, উহা কেবল সনাতন তত্ত্বসমূহই শিক্ষা দিয়া থাকে । কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ধর্ম্ম, জগতের সমগ্র মানবজাতি গ্রহণ করিতে পারে না । আমরা একটা ক্ষুদ্র সহরেই দেখিতে পাই, সেই সহরের বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শত শত লোককে আপনাদের আদর্শ করিয়া থাকে । সুতরাং মহম্মদ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট এরূপ কোন এক ব্যক্তি কিরূপে সমগ্র জগতের আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন ? অথবা সেই এক ব্যক্তির বাক্যপ্রমাণেই বা সমগ্র নীতিবিদ্যা আধ্যাত্মিকত্ব ও ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার

করা যায় ? বৈদাস্তিক ধর্মে এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না। মানবের সনাতন প্রকৃতিই ইহার প্রমাণ, ইহার নীতিতত্ত্ব মানব জাতির সনাতন আধ্যাত্মিক একত্বরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই একত্ব চেষ্টা করিয়া লাভ করিবার নয়, উহা পূর্ণ হইতেই লক্ষ্য।

অতীতকালে আবার আমাদের ঋষিরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, জগতের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন অংশদিকে শাস্ত্রকারগণ ঐতি- ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে হানিক আদর্শের প্রয়োজ- পারে না। কোন না কোন আকারে লোকে নীয়তাও উপলব্ধি করিয়া- একজন ব্যক্তিবিশেষস্বরূপ ঈশ্বর করিয়া লয়। ছিলেন। যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার

করিয়া গেলেন, তাঁহার দেহত্যাগের পর পঞ্চাশ বর্ষ যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিল। ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে আর আমরা জানি, এইরূপ ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা হইতে ( অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য ) শ্রেষ্ঠতর জীবন্ত ঈশ্বর সকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর হইতে আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু হইতে, আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা করিতে পারি, তাহা হইতে তাঁহারা অধিকতর পূজার যোগ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়। আমরা আমাদের মনে যতদূর উচ্চ আদর্শের চিন্তা করিতে পারি, বুদ্ধতাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ, জীবন্ত আদর্শস্বরূপ ধারণা। সেই জন্তই সর্বপ্রকার কাল্পনিক দেবতাকেও পদচ্যুত করিয়া তাঁহারা চিরকাল মানবের পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। আমাদের ঋষিরা ইহা জানিতেন ; সেই জন্ত তাঁহারা ভারতবাসী সকলের পক্ষে এই মহাপুরুষগণের ; এই অবতারগণের পূজার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুধু তাহাই নহে, যিনি আমাদের সম্মুখেই অবতার, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া গিয়াছেন,

যদ্বদ্বিভূতিমং সত্বং শ্রীমদ্বজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসত্ত্বং ॥

ভাবার্থ এই,—মাহুকের মধ্য দিয়া যেখানেই অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির

প্রকাশ হয়, জমিও সেখানে আমি বর্তমান ; আমা হইতেই এই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে ।

ইহা হারা হিন্দুগণের পক্ষে সকল দেশের সকল অবতারণকে উপাসনা করিবার দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । হিন্দু যে কোন দেশের যে কোন সাধু মহাত্মার পূজা করিতে পারে । আমরা সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল অবতারণই হিন্দুর উপাসনা । কার্য্যতঃও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খ্রীষ্টিয়ানদের চর্কেও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি । ইহা ভালই বলিতে

হইবে । কেন আমরা এরূপ উপাসনা না করিব ? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌমিক । উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, উহা সর্ব-প্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে । জগতে যত প্রকার ধর্মের আদর্শ আছে, তাহাদিগকে এখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর ভবিষ্যতে যে সকল বিভিন্ন আদর্শ আসিবে, তাহাদের জন্য আমরা ঐশ্বর্যের সহিত অপেক্ষা করিতে পারি । সেগুলিকেই ঐরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, বৈদান্তিক ধর্মই তাঁহার অনন্ত বাহ প্রসারিত করিয়া সকলগুলিকেই আলিঙ্গন করিয়া লইবেন ।

ঈশ্বরবতার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই । ইহাদের অপেক্ষা একটু নিয়ন্ত্রণের আর একপ্রকার মহাপুরুষ আছেন । বেদে ঋষি শ্রমের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় আর

ঋষি অর্থাৎ যিনি ধর্মকে  
সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি  
করিয়াছেন ।

আজকাল ইহা একটা চলিত শব্দ হইয়া পড়িয়াছে ।  
ঋষিবাক্যের বিশেষ প্রামাণ্য ।  
ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে । ঋষি অর্থে

মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে, ধর্মের প্রমাণ কি ? বহিরিঙ্গিয়ের সাক্ষ্য ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন ।

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।’

‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি ।’ ইত্যাদি

অর্থাৎ—‘মনের সহিত বাক্য, বাহাকে না পাইয়া বাহা হইতে ফিরিয়া আসে ।’

‘সেখানে চক্ষু বাইতে পারে না, বাক্যও বাইতে পারে না, মনও নহে।’ ইত্যাদি।

শত শত যুগ ধরিয়া ঋষিরা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতি আমাদের আশ্রয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনন্ত জীবন, মানবের চরম লক্ষ্য প্রকৃতি বিষয়ে কোন উত্তর দিতে অক্ষম। এই মনের সর্বদা পরিণাম হইতেছে, সর্বদাই যেন উহার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা সসীম, উহা যেন ঋণ ঋণ ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রহিয়াছে। উহা কিরূপে সেই অনন্ত, অপরিবর্তনশীল, অখণ্ড, অবিভাজ্য, সনাতন বস্তুর সংবাদ দিবে? কখনই পারে না। আর যখনই মানবজাতি চৈতন্যহীন জড় হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইতিহাসই জানেন, তাহার ফল কিরূপ অশুভ হইয়াছে। তবে ঐ বেদোক্ত জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? ঋষির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই জ্ঞানলাভ হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানই কি মানুষের সর্ব্বম্ব? কে ইহা বলিতে সাহসী হইবে? আমাদের জীবনে, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এমন মুহূর্ত্ত সকল আসিয়া থাকে, হয়ত আমাদের সম্মুখেই আমাদের কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হইল, অথবা আমরা অথ কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলাম, অথবা অতিশয় আনন্দের কারণ হইল—এই সকল অবস্থায় সময়ে সময়ে মনটা যেন একেবারে স্থির হইয়া যায়। অনেক সময়ে অনেক অবস্থায় এমন ঘটে যে, মনটা স্থির হইয়া গিয়া কণকালের জন্ত উহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন সে সেই অনন্তের একটু আভাস পায়, তখন আমাদের সম্মুখে এমন এক বস্তু প্রকাশিত হয়, যেখানে মন বা বাক্য কিছুই বাইতে পারে না। সাধারণ লোকের জীবনেই সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে; অত্যাশ্রয় দ্বারা এই অবস্থাকে প্রগাঢ়, স্থায়ী ও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। মানব শত শত যুগ পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিল যে, আত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ নহে; শুধু তাহাই নহে, উহা জ্ঞানের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান সেই আত্মারূপ অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সত্তা জ্ঞানের সহিত অতিশয় নহে, জ্ঞান সত্তার একটি অংশ-বিশেষমাত্র। ঋষিরা জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। জ্ঞান পক্ষে ইন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করিতে হইলে মানুষকে উহার অতীত প্রদেশে, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে



যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন ব্যক্তি সকল আছেন, যাহারা পক্ষে-  
দ্রিয়ার সীমার বহির্দেশে যাইতে সক্ষম। ইহাদিগকেই ঋষি বলে, কারণ,  
ইহারা আধ্যাত্মিক সত্য সমূহের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা  
সম্মুখস্থ এই টেবিলটিকে যেমন আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণে জানিয়া থাকি,  
বেদনিহিত সত্যসমূহের প্রমাণও তদ্রূপ প্রত্যক্ষানুভূতি। টেবিলটিকে আমরা  
ইন্দ্রিয়যোগে উপলব্ধি করিয়া থাকি, আর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহও জীবাত্মার  
জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। এই ঋষিভ্রমভ দেশকাল  
লিঙ্গ বা জাতিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। বাৎস্তায়ন অকুতোভয়ে  
বলিয়াছেন যে, এই ঋষিভ্রম ঋষির বংশধরগণের, আর্য্য, অনার্য্য, এমন কি,  
শ্লেচ্ছগণের পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পত্তি।

বেদের ঋষিভ্রম বলিতে ইহাই বুঝায়; আমরাদিগকে ভারতীয় ধর্ম্মের এই  
আদর্শকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আর আমি ইচ্ছা করি যে,

জগতের অন্যান্য জাতিরাও এই আদর্শটিকে বুঝিয়া  
ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে স্মরণ রাখিবেন, কারণ, তাহা হইলে বিভিন্ন  
ধর্ম্মে বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যাইবে। শাস্ত্রপাঠে  
বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণ্য।

ধর্ম্মলাভ হয় না, অথবা মতমতান্তরের দ্বারা বা  
বচনে, এমন কি, তর্কযুক্তি বিচারের দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ-  
কার কবিতো হইবে—ঋষি হইতে হইবে। বহুগণ, যতদিন না তোমাদের  
প্রত্যেকেই ঋষি হইতেছ, যতদিন না আধ্যাত্মিক সত্য সাক্ষাৎকার করিতেছ,  
ততদিন তোমাদের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় নাই জানিবে। যতদিন না তোমা-  
দের এই জ্ঞানাতীত অবস্থা খুলিয়া যায়, ততদিন ধর্ম্ম কেবল কথার কথামাত্র,  
ততদিন কেবল ধর্ম্মলাভের জন্ত প্রস্তুত হইতেছ মাত্র, ততদিন তোমরা পরের  
মুখে ঝাল খাইতেছ মাত্র। এক সময়ে বুদ্ধদেবের সহিত কতকগুলি ব্রাহ্মণের  
তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়া-  
ছিলেন—তাহা এখানে বেশ খাটে। ব্রাহ্মণের বুদ্ধদেবের নিকট যাইয়া  
ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন। সেই মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা  
করেন, ‘আপনারা কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন?’ তাঁহারা বলিলেন, ‘না,  
আমরা দেখি নাই।’ বুদ্ধদেব আবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘আপনা-  
দের পিতৃগণ কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?’ ‘না, তাঁহারাও দেখেন নাই।’  
‘আপনাদের পিতামহগণ?’ ‘আমাদের বোধ হয়, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখেন

নাই।’ তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, ‘বহুগণ আপনাদের পিতাপিতামহগণও ঠাহাকে দেখেন নাই। এমন পুরুষ সম্বন্ধে আপনারা কিরূপে বিচার দ্বারা পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন?’ সমগ্র জগৎ ইহাই করিতেছে। বেদান্তের ভাব্য আমাদেরকেও বলিতে হইবে,—

‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যে

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।’

‘বাগ্‌ভাষ্য দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, প্রবল মেধা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এমন কি, বেদপাঠের দ্বারাও নয়।’

জগতের সমগ্র জাতিকে বেদের ভাব্য আমাদেরকে বলিতে হইবে, তোমাদের বিবাদ বিসম্বাদ বৃথা; তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করিতে

প্রত্যেক হিন্দুকেই ঋষি  
লাভ করিতে হইবে—উপ-  
নিষদে পিতাপুত্র সংবাদ।

চাও, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বৃথাই তোমার প্রচার; তুমি কি বলিতেছ, তাহাই তুমি জান না আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাক, তুমি আর বিবাদ করিবে

না, তোমার মুখ অস্ত্র শ্রী ধারণ করিবে। উপনিষদের এক প্রাচীন ঋষি তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। যখন সে ফিরিল, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিখিলে? পুত্র উত্তর দিল, সে নানা বিদ্যা শিখিয়াছে। পিতা বলিলেন, তোমার কিছুই হয় নাই; যাও, আবার গুরুগৃহে যাও। পুত্র আবার গুরুগৃহে গেল; ফিরিয়া আসিলে পিতা আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র পুনরায় সেই সকল বিদ্যার কথাই বলিল। তাহাকে আর একবার গুরুগৃহে বাইতে হইল। এবার যখন সে ফিরিল, তখন তাহার মুখের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। তখন পিতা বলিলেন, ‘বৎস, অদ্য তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের জায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি।’ যখন তুমি ঈশ্বরকে জানিবে, তখন তোমার মুখশ্রী, স্বর, তোমার সমগ্র আকৃতিই পরিবর্তিত হইবে। তুমি তখন মানবজাতির পক্ষে এক মহাকল্যাণ স্বরূপ হইবে। ঋষি হইলে তাঁহার শক্তি কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট যাহা কিছু এই সকল বচন, যুক্তি বিচার, দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত এই ঋষি লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া শাস্ত্র, ওগুলি গোণমাত্র। ঋষি লাভই মুখ্য। বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি সব গোণ; তাহাই চরম জ্ঞান, যাহা দ্বারা আমরা সেই অপরিণামী

বস্ত্র লাক্ষ্যকার করিতে পারি। যাহারা সাক্ষ্যকার করিয়াছিলেন, তাঁহা-  
রাই বৈদিক ঋষি। ঋষি অর্থে আমরা এক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে  
বুঝিয়া থাকি। ঋষার্ধ হিন্দুপদবাচ্য হইতে গেলে আমাদের প্রত্যেককেই  
আমাদের জীবনের কোন না কোন অবস্থায় এই ঋষি লভ করিতে হইবে  
আর ঋষি লভই হিন্দুর মুক্তি। কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাস, সহস্র সহস্র-  
মন্দির দর্শন বা জগতের যত নদী আছে সব গুলিতে স্নান করিলে হিন্দুর মতে  
মুক্তি হইবে না। ঋষি হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইলেই তবে মুক্তিলাভ হইবে।

পরবর্তী সময়ের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ সময়ে  
সমগ্র জগৎ আলোড়নকারী মহাপুরুষগণ, শ্রেষ্ঠ অবতারগণ জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছেন। অবতারগণের সংখ্যা অনেক। ভাগবতের  
ভগবান্ রামচন্দ্র ।

মতে অবতার অসংখ্য; তন্মধ্যে রাম ও কৃষ্ণই  
ভারতে বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। মহর্ষি বায়ীকি এই প্রাচীন  
বীরযুগের আদর্শ, সত্যপরায়ণতা ও সমগ্র নীতিতত্ত্বের সাকার মূর্তিস্বরূপ,  
আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা সর্বোপরি, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের  
চরিত্র চিত্রিত করিয়া আমাদের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাকবি  
যে ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাৎপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ  
সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব?  
তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্য সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে  
পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের  
ভাবী সাহিত্য সমূহও নিঃশেষ করিয়া আর একটা সীতার চরিত্র বাহির  
করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ;

ঐ চরিত্র ঐ একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে।  
আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়ত অনেকগুলি হইয়াছেন, কিন্তু  
সীতা আর হয় নাই। ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা  
তাহার আদর্শ; রমণী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই  
এক সীতাচরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত ভূমিতে এই সহস্র  
সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতে-  
ছেন। মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধতা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার  
চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র  
বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাত্ম্যের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই

মিত্যাসাধী নিত্যবিগ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া বাইতে পারে, এমন কি, আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালশ্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন পর্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্যভাষাভাবী পাঁচজন হিন্দু থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা; আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিক ভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে লষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতির বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

তার পর তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাতাবে পূজিত হইয়া থাকেন—যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একপা সীতার সাকার মূর্তি ভগবান্ বসিতেছি, ভাগবতকার যাহাকে অবতার বলিয়াই তুল্য হন নাই, বলিয়াছেন,

‘এতে চাংশঃ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।

অস্তান্ত অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

আর যখন আমরা তাঁহার বিবিধভাবসম্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন তাঁহার প্রতি যে একরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তিনি একাধারে অপূর্ণ সন্ন্যাসী ও অদ্বিত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্বিত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা বাইতে পারে না, কারণ, তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ

ছিলেন। সকল অবতারই, বাহা তাঁহার প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন্ত উদাহরণরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক রুক্মিচর জীবন সেই ভগবান্গীতার সাকার বিগ্রহরূপ বর্তমান ছিলেন, তিনি অমাসক্তির মহান্ দৃষ্টান্তরূপ ছিলেন। তিনি স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা, তাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া ভূপতিত হইতেন, তিনি রাজ্য হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি বাল্যকালে যেমন সরল ভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের অন্ত অবস্থায়ও তাঁহার সেই সরল ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই।

তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে বাহা অতি দুর্লভা; যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ পূর্ণব্রহ্মচারী ও পবিত্রভাব হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহা বুকিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়; সেই প্রেমের অত্যন্ত বিকাশ বাহা সেই ব্রহ্মাবনের

ঐক্য ও গোপীপ্রেম।

মধুর লীলার রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রেম-মদিরা পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ বাহা বুকিতে অক্ষম। কে সেই গোপীদের প্রেমজনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুকিতে সক্ষম, যে প্রেম প্রেমের চরম আদর্শরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না; যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাজক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম ধারাই সগুণ নিগুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে। আমরা জানি,

মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে  
সগুণ ও নিগুণ ঈশ্বরবাদের  
অক্ষম। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র  
সামঞ্জস্য গোপীপ্রেমে।

জগদ্ব্যাপী সমগ্র জগৎ তাঁহার বিকাশমাত্র, সেই নিগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায়। বাহা আমরা ধরিতে পারি, তাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ চালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানবস্বভাবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এ সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—বাহা ব্রহ্মত্বে বিচারিত হইয়াছে, বাহা লইয়া বনবাস-কালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেন—যদি একজন সগুণ সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এ নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী

ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপী-  
প্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে বাহা পড়িয়া থাক তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে।  
কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে তাহারা চাহিত না; তিনি  
যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান, তাহা তাহারা জানিতে চাহিত না।  
তাহারা কেবল বুঝিত, তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।  
গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত। সেই বহু অনিকিনীর  
নেতা, রাজাধিরাজ কৃষ্ণ তাহাদের নিকট বরাবর সেই রাখালবালকই  
ছিলেন।

ন ধনং ন জনং ন কবিতাং স্মর্য্যীং বী জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনীষরে ভবতাত্ত্বিত্তিরহৈতুকী স্ময়ি ॥

হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা স্মর্য্যী কিছুই প্রার্থনা করি না;  
হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।  
ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিকাম  
কর্ম্ম; আর মাহুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের যুগ  
হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম্ম, কামনার ধর্ম্ম  
চিরদিনের জন্ত চলিয়া গেল—আর মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক নরকভীতি ও  
স্বর্গস্থলভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিকাম কর্ম্মরূপ শ্রেষ্ঠতম  
আদর্শের অভ্যুদয় হইল।

এ প্রেমের মহিমা আর কি বলিব! এই মাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি  
যে, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বো-  
ধের অসম্ভাব নাই, বাহারা শ্রীকৃষ্ণ জীবনের এই  
অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির গোপীপ্রেম অতি অপূর্ব্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য্য বুঝিতে  
চর্চ্চায় অনধিকার! অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের

সহিতাই শোণিতসম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, বাহারা  
গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে  
দশ হাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই,  
আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে  
হইবে যে, যিনি এই গোপীপ্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই  
নহেন, সেই আজ্ঞামুগ্ধ, ব্যাসতনয় শ্রীকৃষ্ণ। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকে,  
ততদিন ভগবৎপ্রেম অসম্ভব। উহা কেবল দোকানদারি; আমি তোমায়

কিছু দিতেছি, প্রভু তুমি আমার কিছু দাও। আর ভগবান্ বলিতেছেন, যদি তুমি এরূপ না কর, তাহা হইলে তুমি মরিলে তোমার দেখিয়া নইব। চিরকাল আমি তোমায় দন্ধে মারুব। সকাম ব্যক্তির ঈশ্বরধারণা এইরূপ। স্বত দিন মাথায় এই সব ভাব থাকে, ততদিন গোপীদেয় প্রেমজনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে ?

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা স্তূৰ্ঠু চুহিতং ।

ইতররাগবিম্মারণং নৃণাং বিতর বীর নন্তেহধরামৃতম্ ॥

‘একবার মাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুসন লাভ করা যায়, বাহাৎ তুমি একবার চুসন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্ত তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অস্তান্ত সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।’

প্রথমে এই কাকদ, নাম বশ, এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই, কেবল তখনই তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিগত জিনিষ যে, সৰ্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। স্বতদিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে বাহাদের হৃদয়ে কামকাননশোলিপার বৃষুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা!

এমন কি, দর্শন শাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই গীতান্ত উপদেশেরও উপরে  
গোপীপ্রেমের স্থান—কেবল  
ত্যাগীর উহাতে অধিকার।

অপূৰ্ণ প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বরসান্বাদের উন্মত্ততা, যোগ প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্ন-মাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের আয় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অম্বরঞ্জিত হইয়া যায়। মহামুত্তাব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা!

কৃষ্ণ জীবনের অবান্তর কথা লইয়া সময় রূথা ব্যয় করিও না ; তদীয় জীবনের  
মুখ্য অংশ বাহ্য, তাহাই অবলম্বন কর । কৃষ্ণের জীবন চরিতে হয়ত অনেক  
কৃষ্ণোপদেশের অভিনব ও ঐতিহাসিক গলদ বাহির হইতে পারে, অনেক বিষয়  
হয়ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এ সবই সত্য হইতে  
কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব । পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে সমাজে যে

এক অপূর্ণ নূতন তাবের অভ্যুদয় হইল, তাহার অবশ্যই কোনরূপ ভিত্তি  
ছিল । অল্প যে কোনও মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখিতে  
পাই যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কতকগুলি ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র ; আমরা  
দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার নিজ দেশে, এমন কি, সেই সময়ে যে সকল  
শিক্ষা প্রচলিত ছিল, শুদ্ধ তাহাই মাত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন । এমন কি  
সেই মহাপুরুষ আদৌ ছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধেই গুরুতর সন্দেহ থাকিতে  
পারে । কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিকাম কর্ম ও নিকাম  
প্রেমতত্ত্ব জগতে এক অভিনব মৌলিক আবিষ্কৃত্য নহে, ইহা প্রমাণ করুন  
দেখি । যদি না পারেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও  
এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই তত্ত্বগুলি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । ঐ তত্ত্বগুলি  
অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা  
যায় না । কারণ, কৃষ্ণের আবির্ভাব কালে সর্ব সাধারণের মধ্যে ঐ তত্ত্ব  
প্রচারিত ছিল বলিয়া জানা যায় না । ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক,  
তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস উক্ত তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন ।  
মানব ভাবায় এক্ষণে প্রেরিতম আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই । আমরা  
তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও  
উচ্চ আদর্শ পাই না । যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্নততা প্রবিষ্ট হইবে,  
যখন তোমরা মহাভাগা গোপীপণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা প্রেম কি  
বস্তু জানিতে পারিবে । যখন সমগ্র জগৎ তোমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত  
হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অল্প কোনও কামনা থাকিবে না, যখন  
তোমাদের সম্পূর্ণ চিন্তাশক্তি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, এমন  
কি, যখন তোমাদের সত্যাত্মসন্ধান স্পৃহা পর্য্যন্ত থাকিবে না, তখনই তোমাদের  
হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের  
অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে । ইহাই লক্ষ্য । যখন এই প্রেম পাইলে,  
তখন সব পাইলে ।



এইবার আমরা একটু নিরন্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন আলেকের মধ্যে একটা চেঁচা দেখা যায়; সেটা

গীতাপ্রচারক কৃষ্ণ।

যেন ঘোড়াতে গাড়ী যোতার মত। আমাদের

মধ্যে অনেকের ধারণা,—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম। সাহেবরাও ইহা বড় পছন্দ করেন না। অথচ পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি, গোপীদের ঘরনার জলে ভাসিয়ে দাও। মহাভারতে হু এক স্থল ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালবধে শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র।

গীতাই ঋত্বির একমাত্র প্রামাণিক ভাষ্য; অত্যাশ্রু ঋতি-ভাষ্য ও গীতায় প্রভেদ—গীতার সর্বমতসম্মত।

আমরা এখন সেই আদর্শপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা

ছাড়িয়া একটু নিরন্তরে নামিয়া গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও

আমরা দেখিতে পাই, গীতার জায় বেদের ভাষ্য আর কখন হয় নাই, হইবেও না। ঋতি বা উপ-

নিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ, নানা ভাষ্যকার সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং ঋতির বক্তা, সেই ভগবান্ নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে ঋতির অর্থ বুঝাইলেন আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সমগ্র জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, শাস্ত্রের পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ, এমন কি, গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বাক্ত তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কি দেখিতে পাওয়া যায় এবং আধুনিক ভাষ্যকারগণের ভিতরই বা কি দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার ভিতর অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনরূপে শৈথিল্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজের মনোমত অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আরার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলি লইয়া তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু গীতায় ঋতির তাৎপর্য একরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য, জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণরূপে উপনীত হন।

গীতাতে এই ভাবে বেদের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে ! এমন কি, কর্মকাণ্ড পর্য্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে আর ইহা দেখান হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎভাবে যুক্তির সাধন নহে, গোপনভাবে যুক্তির বিভিন্ন প্রকার সাধন প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ।

সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, কেবল একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি । যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় ও আমাদেরই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায় আর এই সব বিভিন্ন উপাসনা প্রণালীই সত্য, কারণ, সত্য না হইলে কেন সেগুলির সৃষ্টি হইল ? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত,—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট ছুঁই লোকের কৃত ; তাহারা কিছু অর্থ-লাভসায় এই সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে । একথা একেবারে ভুল । তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে, ঐগুলি ঐক্লপে সৃষ্ট হয় নাই । জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে । বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল নাই । যে দিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সে দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সহিত সেগুলিও লোপ পাইবে আর যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তুমি যতই উহাদের তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই উহাদের বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ওগুলি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে । তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তশ্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমা পূজা থাকিবেই থাকিবে । এই বিভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্যই থাকিবে আর আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কি প্রয়োজন ।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবে কিছুকাল পরেই ভারতে তিহাসের এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল । আমরা গীতাতেই সম্প্রদায় সমূহের বিরোধকোলাহলের দুরশ্রুত ধ্বনি শুনিয়া থাকি, আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাঝে পড়িয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন । তিনি বলিতেছেন,—

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্ত্রে মণিগণা ইব ।

যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাদেরই সমস্ত ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে ।

আমরা সাম্প্রদায়িক বিরোধের দুরশ্রুত অক্ষুট ধ্বনি তখন হইতেই শুনিতে পাই । সম্ভবতঃ ভগবানের উপদেশে এই বিরোধ কিছুকাল মল্লীভূত হইয়া সমন্বয় ও শান্তি আসিয়াছিল, কিন্তু আবার এ বিরোধ বাধিয়া উঠিল । শুধু ধর্মমত লইয়া নহে, সম্ভবতঃ জাতি লইয়া এ বিবাদ চলিয়াছিল—আমাদের সমাজের দুইটা প্রবল অঙ্গ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় । আর সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহান্ তরঙ্গে সমগ্র ভারতকে বহায়া ভাসাইয়াছিল,

তাহার সর্বোচ্চ চূড়ায় আমরা আর এক মহামহিম-  
কর্মযোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ময় মূর্তি দেখিয়া থাকি । তিনি আর কেহই মনেন,  
বুদ্ধদেব । আমাদেরই গোঁতম শাক্যমুনি । আমরা তাঁহাকে

ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড় নির্ভীক নীতিতত্ত্বের প্রচারক আর দেখে নাই । তিনি কর্মযোগীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই ক্লকই যেন নিজেরই শিষ্যরূপে তাঁহার নিজ মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন । আবার সেই বাণী আবির্ভূত হইল, যাহা গীতার শিক্ষা দিয়াছিল,—

‘স্বল্পমপ্যন্ত ধর্মন্ত জায়তে মহতো ভয়াৎ ।’

এই ধর্মের অতি সামান্য অমুষ্ঠান করিলেও মহান্ ভয় হইতে রক্ষা করে ।

‘জিরো বৈশ্বাত্থা শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিং ।’

জী, বৈশ্ব, এমন কি, শূদ্রগণ পর্য্যন্ত পরমগতি প্রাপ্ত হয় ।

গীতার বাক্যসমূহ, শ্রীকৃষ্ণের বজ্রগভীর মহতীবাবী, সকলের বন্ধন, সকলের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, সকলেরই সেই পরম পদ লাভের অধিকার ঘোষণা করে ।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রমশ্চি তে স্থিতাঃ ॥

যাহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন । ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন ও নির্দোষ, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত ।

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

‘ম হিনস্ত্যাশ্বানান্মানং ততো যাতি পরাং গতিং ॥

পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আপনাদের দ্বারা আর আপনাদের হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি লাভ করেন ।

এই গীতার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ রূপে, উহার এক বিন্দুও অন্ততঃ বাহ্যতে কার্যে পরিণত হয় এই জন্ত সেই গীতা উপদেষ্টাই অন্তরূপে আবার মর্ত্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি ভগবান্ বুদ্ধদেব কৃষ্ণকর্তৃক দ্বংধী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইনি বাহ্যতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, তজ্জন্ত দেবভাষা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দ্বংধী দরিদ্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, ইনি দ্বিতীয় রামের স্থায় চণ্ডালকে বন্ধে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

কিন্তু এই প্রচারকার্যে একটা দোষ প্রবেশ করিল, তাহার জন্ত আজ পর্যন্ত আমরা ভুগিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধের কোন দোষ নাই, তাঁহার চরিত্রে পরম বিশুদ্ধ ও মহামহিমময়। দ্বংধের বিষয়, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দ্বারা যে সকল বিভিন্ন অসভ্য ও অশিক্ষিত মানবজাতি আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহারা বুদ্ধদেব প্রচারিত উচ্চ আদর্শগুলি ঠিক ঠিক লইতে পারিল না। এই সকল জাতির নানাবিধ কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনাপদ্ধতি ছিল, তাহারা ধলে ধলে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুদিনের জন্ত বোধ হইল, তাহারা সভ্য হইয়াছে, কিন্তু এক শতাব্দী বাইতে না বাইতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের সর্ব ভূত প্রভৃতির উপাসনা সমাজে চালাইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র ভারত কুসংস্কারের পূর্ণ লীলাক্ষেত্রে হইয়া ঘোর অবনতি প্রাপ্ত হইল। প্রথম বৌদ্ধগণ প্রাণিহিংসাকে নিন্দা করিতে গিয়া বৈদিক যজ্ঞসমূহের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল তখন প্রত্যেক গৃহে এই সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। প্রত্যেক গৃহেই যজ্ঞার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, যজ্ঞাদির আর বিশেষ কিছু আড়ম্বর ছিল না। বৌদ্ধদের প্রচারে এই যজ্ঞগুলি লোপ পাইল, তৎস্থলে বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, আড়ম্বরপ্রিয় পুরোহিতদল এবং বর্তমান কালে ভারতে আর বাহা কিছু দেখিতেছ, সমুদয়ের আবির্ভাব হইল। যাহাদের নিকট অধিক তথ্যসংগ্রহের আশা করা যায়, এরূপ কতকগুলি আধুনিক ব্যক্তির গ্রন্থে পড়া যায়, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পুতুল পূজা উঠাইয়া দিয়াছিলেন—

আমি উহা পড়িয়া হাস্ত সম্বরণ করিতে পারি না। তাহারা জানে না যে,

বৌদ্ধধর্মই ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও প্রতিমাপূজার সৃষ্টি করিয়াছিল। ছ এক বৎসর পূর্বে একজন রুশিয় সম্রাট ব্যক্তি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

তাহাতে তিনি বীণ্ডুগ্রীষ্টের একখানি অদ্ভুত জীবন-  
 রুশিয় সম্রাট ব্যক্তি লিখিত চরিত পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি  
 বীণ্ডুগ্রীষ্টের জীবনী। সেই পুস্তকখানির একস্থলে বলিতেছেন, গ্রীষ্ট

ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্ম শিক্ষার্থ জগন্নাথের মন্দিরে গমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গীর্ণতা ও মূর্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে তিব্বতের নামাদের নিকট ধর্ম শিক্ষার্থ গমন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে সিদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাহারা ভারতেতিহাসের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট পূর্বোক্ত কথাটিতেই পুস্তকখানি যে আগাগোড়া জুয়াচুরি, তাহা ধরা পড়িয়া যায়। কারণ, জগন্নাথ মন্দির একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ঐটা এবং অত্যাশ্চর্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ব্যাপার আমাদেরিগকে এখনও অনেক করিতে হইবে। আর সে সময়ে জগন্নাথে একজনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তথাপি বলা হইতেছে, বীণ্ডুগ্রীষ্ট তথায় ব্রাহ্মণদের নিকট উপদেশ লইবার জন্ত আসিয়াছিলেন। আমাদের রুশীয় দিগ্গজ প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা বলিতেছেন! পূর্বোক্ত কারণে বৌদ্ধ-ধর্মের সর্বপ্রাণীতে দয়া, উহার অপূর্ণ নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মার আন্তর্য লইয়া চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও সমগ্র বৌদ্ধধর্মরূপ প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস। বৌদ্ধ-ধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপার সমূহের আবির্ভাব হইল, তাহা বর্ণনা করিবার আমার সময়ও নাই প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অল্পাঙ্গন-পদ্ধতি সমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থ যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখন বাহির হয় নাই বা মানবমস্তিষ্ক যাহা আর কখন কল্পনা করে নাই, অতি ভীষণ পাশব অল্পাঙ্গন পদ্ধতি যাহা আর কখন ধর্মের নামে চলে নাই, এ সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন, যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি, তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। এবার দাক্ষিণাত্যে ভগবানের আবির্ভাব হইল। সেই ব্রাহ্মণ যুবক, যাহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, ষোড়শ বর্গে তাঁহার সকল গ্রন্থলেখা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই অদ্ভুত

প্রতিভাবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন বিত্তকমার্গে লইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু এই কার্য্য যে কি কঠিন ও বৃহৎ ব্যাপার ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখ। সে সময়ে ভারতের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। তোমরা যে এই সকল ভীষণ আচারের সংস্কারে অগ্রসর হইতেছ, তাহা সেই অধঃপতনের যুগ হইতে আসিয়াছে। তাতার, বেলুচি প্রভৃতি ভয়ানক জাতি সকল ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ হইয়া আমাদের সহিত মিশিয়া গেল। তাহারা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতীয় আচার সকলও লইয়া আসিল। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবন অতি ভয়ানক পার্শ্বিক আচার সঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল। উক্ত ব্রাহ্মণ যুবক বৌদ্ধদের নিকট হইতে ইহাই দায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে এই অবনত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বেদান্তের পুনর্বিজয় চলিতেছে। এখনও একাধা চলিতেছে, এখনও উহা শেষ হয় নাই। মহাদার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে বুদ্ধদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ তাঁহাদের আচার্য্যের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা হীনাবস্থা এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়াছিল। শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন; তখন সকল বৌদ্ধই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এই সকল অমুষ্ঠান পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সে গুলির সম্বন্ধে কি হইবে, এই এক মহাসমস্যা উপস্থিত হইল।

তখন মহামুত্তাব রামানুজের অভ্যুদয় হইল। শঙ্কর মহামনীষী ছিলেন বাট, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার হৃদয় রামানুজের আশ্রয় প্রাপ্ত ছিল না। রামানুজের হৃদয় শঙ্কর হইতে প্রশস্ততর ছিল। পতিতের ভগবান্ রামানুজাচার্য্য।

দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল, তিনি তাহাদের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। কালে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অমুষ্ঠানপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছিল, তিনি সেইগুলি লইয়া যথাসাধ্য তাহাদের সংস্কার করিলেন এবং নূতন নূতন অমুষ্ঠানপদ্ধতি, নূতন নূতন উপাসনা প্রণালী স্থষ্ট করিয়া তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাদিগকে ঐ সকল উপদেশ করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে উচ্চতম

আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন। এইরূপে রামানুজের কার্য চলিল। তাঁহার কার্যের প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, আৰ্য্যাবর্তে উহার তরঙ্গ লাগিল। তথায় কয়েক জন আচার্য্য উক্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ইহা অনেকদিন পরে মুসলমান-শাসনকালে সম্ভটিত হয়। বর্তমানকালের এই সকল আৰ্য্যাবর্তের আচার্য্য-গণের মধ্যে চৈতন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। রামানুজের সময় হইতে ধর্ম্মপ্রচারে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিও ;—তখন হইতে সর্বসাধারণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। আমি জানি না, লোকে শঙ্করকে অনুদারমতাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করে কেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থে আমি এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহার সতীর্ণত্বের পরিচয় প্রদান করে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি যেমন তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ দ্বারা বিকৃত হইয়াছে, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যের উপদেশাবলির উপর যে সতীর্ণতা রূপ দোষারোপ করা হয়, তাহাতে খুব সম্ভবতঃ শঙ্করের কোন দোষ নাই, তাঁহার শিষ্যবর্গের বুদ্ধিবার অক্ষমতার দরুণই এ দোষ সম্ভবতঃ শঙ্করে আরোপিত হইয়া থাকে।

আমি এক্ষণে এই আৰ্য্যাবর্তনিবাসী ভগবান্ জ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই বক্তৃতা শেষ করিব। তিনি গোপীদেব প্রেমোন্মত্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখনকার এক খুব পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি ঞ্জায়ের অধ্যাপক হইয়া বাগদুন্দে লোককে পরাস্ত করিতেন,—ইহাই তিনি অতি বাগ্যাবস্থা হইতেই জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মহাজনের রূপায় এই

ব্যক্তির সারা জীবন পরিবর্তিত হইয়া গেল ; তখন প্রেমাবতার ভগবান্ জ্রীচৈতন্য।

তিনি বাদ বিবাদ, তর্ক, ঞ্জায়ের অধ্যাপকতা সবই পরিত্যাগ করিলেন, জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মাদ চৈতন্য তাঁহাদের অন্ততম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁহার প্রেমের সীমা ছিল না। সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অগবিত্র বেঙ্গা পতিত সকলেই তাঁহার প্রেমের ভাগী ছিল, সকলকেই তিনি দয়া করিতেন, এবং যদিও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মত ধোরতর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত উহা দরিদ্র, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, কোন সমাজে বাহার স্থান নাই, এইরূপ সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাকে

মৃত্যুর অমরোদয়ে স্বীকার করিতে হইবে যে, দার্শনিক সম্প্রদায় সমূহে আমরা অদ্বুত উদার ভাব দেখিতে পাই। শঙ্করমতাবলম্বী কেহই একথা স্বীকার করিবে না যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন ভেদ আছে। এ দিকে কিন্তু জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সঙ্কীর্ণ ভাৱ পোষকতা করিতেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যের ভিতরেই আবার আমরা জাতিভেদ বিষয়ে অদ্বুত উদারতা দেখিতে পাই, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অতি সঙ্কীর্ণ।

একজনের ছিল অদ্বুত মস্তিষ্ক, অপরের বিশাল হৃদয়। এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় জ্ঞানভক্তি-সমন্বিতাচার্য্য ভগবান্  
ঈশ্বরামক ।

বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্বুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্ত্যের অদ্বুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন,—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অমুপ্রাণিত, ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাহার হৃদয় ভারতাস্তর্গত বা ভারত বহির্ভূত দরিদ্র, দুর্বল, পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎতত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতাস্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্বুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতি সাধক সার্বভৌমিক ধর্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন ব্যক্তি জন্মিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল আর অদ্বুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্য এমন এক সহরের নিকট অমুষ্ঠিত হয়, যাহা পাশ্চাত্যভাবে উন্নত হইয়াছিল, ভারতের অজ্ঞাত সহর অপেক্ষা যাহা অধিক পরিমাণে সাহেবীভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পুঁথি-গত বিদ্যা কিছুমান ছিল না, এরূপ মহামনোবাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নাম পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তিনি এক অদ্বুত লোক ছিলেন। সে অনেক কথা, আদ্যরাতে ভোমাদিগের নিকট তাঁহার কথা কিছু বলিবার সময় নাই। সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ যুগাচার্য্য



মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্লান্ত হইতে হইবে, ঐহ্যার উপদেশ আজকাল আমাদের বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঈশ্বরীয় শক্তি খেলা করিত, সেটী লক্ষ্য করিও। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সংগ, বঙ্গদেশের সুদূর অজ্ঞাত অপরিচিত কোন গল্পীতে ইহঁতার জন্ম। আজ ইউরোপ আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি সত্য সত্যই ফুলচন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছা কে বুঝিতে পারে? হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যদি ইহাতে বিধাতার হস্ত না দেখিতে পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্বক। যদি সময় আসে, যদি তোমাদের সহিত আলোচনা করিবার আর কখন সাবকাশ হয়, তবে তোমাদিগকে ইহঁতার বিষয় আরো বিস্তারিত ভাবে বলিব; এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটা সত্যও বলিয়া থাকি, তবে সে তাঁহার, তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহা অসত্য, ভ্রমাত্মক, যাহা মানব জাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, তৎসমুদয়ের জন্ত আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

### থামাদের উপস্থিত কর্তব্য।

[এই বক্তৃতা ট্রিল্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত হয়। স্বামীজির আমেরিকা গমনের পূর্বে এই সমিতির সভ্যগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত স্বামীজির নানাবিষয়ে আলোচনা হওয়াতে ক্রমশঃ মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজির অদ্ভুত ক্ষমতাবলির পরিচয় পায় এবং অবশেষে তাহাদের চেষ্টায়ই স্বামীজি চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-রূপে প্রেরিত হন। এই সকল কারণে এই বক্তৃতাটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বোধ্য।]

যতই দিন যাইতেছে, ততই জীবনসমস্যা গভীর ও প্রশস্ততর হইতেছে! অতি প্রাচীনকালে যখন সমগ্র জগতের অখণ্ডত্ব রূপ মহাসত্য আবিস্কৃত হয়, তখন হইতেই উন্নতির মূলমন্ত্র ও মার তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। জগতের একটা পরমাণুও গতি-শীল হইলে তৎসঙ্গে সমগ্র জগৎ গতিশীল হইয়া থাকে। কোন জাতি কোনরূপ উন্নতিপথে অগ্রসর হইলেই তাহার সঙ্গে সমগ্র জগৎ উন্নতিপথে অগ্রসর হয় আর দিন দিন ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে

যে, শুধু জাতীয় বা এইরূপ কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্তার নীমাংসা হইতে পারে না। যে কোন বিষয়, যে কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্বভৌমিক হইয়া দাঁড়ায়; যে কোন আকাজ্জক হউক না, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণি-জগৎকে নিজ সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

উপরোক্ত বাক্যগুলি যদি সত্য হয়, তবে যদি আপনাদের অনুমতি হয় ত বলিতে পারি যে, প্রাচীন কালে আমাদের জাতি যে মহত্ত্ব পদবীতে আকৃষ্ট ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে তাহা হারাইয়াছে। আর যদি আমরা, এই অবনতি কিসে হইল, তাহার কারণসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা, আমাদের কার্যক্ষেত্রের সংকোচ—ইহার অন্ততম কারণ।

জগতে দুইটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দিষ্ট পন্থায় জীবনসমস্তার সমাপানে নিযুক্ত দুইটি প্রাচীন জাতি ছিলেন—আমরা প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। হিমাচলের হিমশিখররূপ উত্তরনিবদ্ধদৃষ্টি, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী সমন্বিত সমতলে প্রবহমান সমুদ্রসদৃশ সুবাহুসলিলা প্রোতস্বতী বেষ্টিত হিন্দু আর্যের মন সহজেই অন্তর্মুখী হইল। চতুর্দিকে এই সকল মহান্ ভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া আর্যজাতির হৃদয়ানুপরায়ণ মস্তিষ্ক স্বভাব-বশেই অন্তর্মুখ হইল, স্বচিন্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় গ্রীক ও হিন্দু।

আর্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীক জাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিল, যেখানে গান্ধীর্ঘ্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের অধিক সমাবেশ,—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্কর্ত্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দিক্স্থ প্রকৃতি নিরাভরণা কিন্তু হস্তময়ী—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণপরায়ণ হইল আর উহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগাত্মক বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি অল্পত ফল প্রসব করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যে

প্রকার শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোনও জাতির তুলনা হয় না আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের বালকগণ অন্য যে কোনও দেশের বালকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন, সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের ভারতবিজয়ের দুই এক শতাব্দী পূর্বে জাতীয় শক্তি অন্তর্হিত হইল, তখন এই জাতীয় বিশেষত্বটিকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহা অবনত ভাব প্রাপ্ত হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পে আর সেই প্রশস্ত ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়োন্মাদী গভীর ভাব রহিল না, পূর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত অথচ অপূর্ণ ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বতন্ত্র হারাইল। আমাদের সমগ্র সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালধিচুড়িস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে ; ইহাই সঙ্গীত শাস্ত্রের অবনতির চিহ্ন স্বরূপ। তোমাদের ভাবরাজ্য সম্বন্ধীয় অস্ত্রাস্ত্র বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য ও মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইনে আর তোমাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্র স্বরূপ ধর্ম্মেও অতি ঘোর অবনতি প্রবেশ করিয়াছিল। যে জাতি শত শত বর্ষ ধরিয়া এক গ্লাস জল ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে খাব, এইরূপ গুরুতর সমস্যাসমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার ? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো শত শত বর্ষ ধরিয়া এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে ? বেদান্তের মহান্ তত্ত্বসমূহ, জৈন ও আত্মা সম্বন্ধীয় মহান্ অপূর্ণ উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ নষ্টপ্রায় হইল, গভীর অরণ্যে কতিপয় মাত্র সন্ন্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যাখাদ্য স্পর্শস্পর্শ প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিয়া, অবশ্য তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কারণ, জগতের হীনতম ব্যক্তিও

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারিল না ।

অবশেষে আমাদের শুভাদৃষ্টেই হউক বা দুরদৃষ্টক্রমেই হউক, ইংরাজ ভারত জয় করিল । অবশ্য পরদেশবিজয় কখনই শুভফলগ্রন্থ নহে, বৈদেশিক শাসন কখনই কল্যাণকর নহে । তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে । ইংরাজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল সংঘটিত হইয়াছে । ইংলণ্ড ও সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার জ্ঞান গ্রীসের নিকট গুণী । ইউরোপের সকল ভাবের মধ্য দিয়া যেন গ্রীসের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় । উহার প্রত্যেক গৃহে, বাড়ীর প্রত্যেক আসবাবটিতে পর্য্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ দেওয়া । ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প সবই গ্রীসের ছায়া । আজ ভারতক্ষেত্রে

সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্রে মিলিত হইয়াছেন । এইরূপে ধীর অথচ নিশ্চলভাবে উভয় শুভফল ।

ভাব মিলিয়া উদার জীবনপ্রদ ভাবসমূহের আবির্ভাব হইতেছে আর আমাদের চতুর্দিকে যে পুনর্জীবনের লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা এই সকল বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল । আমাদের মানব-জীবন সম্বন্ধীয় ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে । আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্তাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি আর আমরা ইহাও বুঝিতেছি, এই উদার ভাবসমূহ আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণতিস্বরূপ । আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না । আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গুণী হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরে ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্ব-ভৌমিক ভাবে উপনীত হওয়া । কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ আপনাদিগকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি, আমাদের জাতীয় মহীৰূহকে রসে বঞ্চিত করিয়া শুকাইয়া ফেলিতেছি । আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে ‘আমরাই জগতের একমাত্র জাতি,’ এই গোঁড়ামী একটী । ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্ত আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন

পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিভ্রদ্ধা করিয়া থাকি ; তথাপি আমার মন হইতে এ ভাব কোন মতে যায় না যে, জগৎ হইতে আমাদের অনেক জিনিষ শিখিতে হইবে। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু মহারাজ বলিয়াছেন,—

“শ্রদ্ধাধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি ।

অন্ত্যাদপি পরো ধর্মঃ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥”

অর্থাৎ “শ্রদ্ধাবান হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, আর অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবাস্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষা করিবে।” ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুষ্য উপযুক্ত বংশধর হই, তবে যে কোন ব্যক্তি আমাদের শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারমাণ্বিক সকল বিষয়ে শিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদেরকে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতের দেশসমূহের সহিত আমাদের সশ্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে তাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা আমাদের নির্বুদ্ধিতামাত্র আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বর্ষ ধরিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অপরাপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করিবার জন্ত বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই বিদেশে ধর্মপ্রচার ও বিদেশীয় ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ।  
সহিত মেলা মেশা অবশ্য কর্তব্য। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতবহির্ভূত

প্রদেশে গমন অন্তর্চিত, এ সকল আহ্বানের কথা, ছেলেমানুষী মাত্র। এ সকল ধারণাকে সমূলে নির্মূল করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া জগতের অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিবে, ততই তোমাদের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব হইতেই, শত শত শতাব্দী পূর্ব হইতেই যদি ইহা করিতে, তবে তোমরা আজ, যে কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম সুষ্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমাদিগকে বাঁচিতে হয়, তবে তোমাদিগকে সন্ধীর্ণ গভী ছাড়াইতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে

তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু তোমাদিগকে বিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে । আমি ইউরোপ আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সঙ্কল্প ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছ । আমাকে বাইতে হইয়াছিল, কারণ, এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ভূতের প্রথম চিহ্ন । এই জাতীয় জীবন পুনরুদ্ভূত হইয়া বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, আর সহস্র সহস্র ব্যক্তিও এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে । আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতিকে বাচিতে হয়, তবে ইহা হইবেই হইবে । সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ভূতের সর্বপ্রধান লক্ষণ আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের বাহ্য দিবার আছে, সমগ্র জগতের উন্নতি বিধানের আমাদের যেটুকু কার্য আছে, তাহাও হইয়া বাইতেছে ।

আর, ইহা কিছু নূতন ব্যাপারও নহে । তোমাদের মধ্যে বাহ্যার মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল ধরিয়া তাহাদের দেশের প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক অধ্যয়ন কর বিদেশগমন হিন্দুর পক্ষে কিছু নাই । যে কোন জাতিকেই বাঁচিতে হইলে তাহাকে নূতন ব্যাপার নহে ।

কিছু দিতে হইবে । প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে । প্রতিগ্রহ করিলেই উহার মূল্যস্বরূপ কিছু দিতে হইবে । এত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি—এ কথা ত আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এখন যদি, আমরা কিরূপে এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্তার সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যই ভাবুক, আমরা চিরকালই জগৎকে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছি ।

তবে ভারতের দান—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা । আর ধর্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না । জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বকে শোণিতপ্রবাহের উপর দিয়া বহন করিতে হয় না । জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদাপটে গমন করে না, উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষভরে শান্তভাবে আগমন করিয়া থাকে

আর তাহাই বরাবর হইয়াছে । লণ্ডনস্থ জনৈক ভারতের দান ধর্মদান । যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ ? তোমরা একটা জাতিও কখন জয় কর নাই ।” ইংরাজ

জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরাজ জাতির পক্ষে একথা শোভা পায়,—তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পারিলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ। তাহাদের দৃষ্টি হইতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, আমি তাহার এই উত্তর পাই যে, ‘ইহার কারণ এই যে, আমরা কখন অপর জাতিকে জয় করি নাই।’ ইহাই আমাদের মহা গৌরব। তোমরা আজকাল সর্বদাই ‘আমাদের ধর্ম আক্রমণকারী নহে’ বলিয়া উহার নিন্দা শুনিতে পাও আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিক জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম যে অশ্রান্ত ধর্ম হইতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, তাহার ইহাই একটা প্রধান যুক্তি। আমাদের ধর্ম কখনই অপর ধর্ম বিজয়ে প্রস্তুত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্বদাই আশীর্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই, কেবল এখানেই পরধর্মে বিদ্বেষরাহিত্য সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এখানেই এই পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্যে পরিণত

হইয়াছে। অশ্রান্ত দেশে উহা কেবল মতবাদে হিন্দুগণ নীরব ও শান্তভাবে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরা মুসলমান-উহা দান করিয়াছেন।

দেব জন্ত মসজিদ ও খ্রীষ্টিয়ানদের জন্ত চর্চ নির্মাণ করিয়া দেয়। হে ভদ্র মহোদয়গণ, এইরূপে আমরা আমাদের ভাব জগতে অনেকবার বহন করিয়াছি, কিন্তু অতি দীর্ঘ, নিস্তর ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটা লক্ষণ উহার শান্ত-ভাব, উহার নীরবতা। আবার ইহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বলবাচক কোন নামে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রস্তুত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার অতিশয় বিরক্তিকর লাগে; উহাতে হয়ত তাহার সাহিত্যের ত্রায় উদ্দীপনা নাই, চাঞ্চল্যতাব নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠবে। ইউরোপের বিয়োগান্ত নাটকাবলির সহিত আমাদের গুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, উহাতে ঋণকালের জন্ত তোমায় উদ্দীপিত করে, কিন্তু যাই শেষ হইয়া

যায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া আসে, সবই তোমার মস্তিষ্ক হইতে চলিয়া যায়। ভারতীয় বিয়োগান্ত নাটকগুলি যেন ঐন্দ্রজালিকের শক্তিস্বরূপ, উহা দীর্ঘ নিস্তরূভাবে কার্য্য করে; কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকে, তুমি আর কোথায় যাইবে? তুমি বাঁধা পড়িলে; আর যে কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছে, সেই উহার সহিত চিরপ্রেম বাঁধা পড়িয়াছে।

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তরূ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলেও অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রক্ষুণ্ণিত করে, সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে ভারতের দান তরুণ বৃষ্টিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না, কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ

ভারতীয় গ্রন্থকারগণ  
অজ্ঞাতনামা।

বলিয়াছিল, ‘ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার!’ ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, ‘ইহাই ভারতের ভাবসঙ্গত।’

তঁাহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের জায় ছিলেন না—যাঁহারা অজ্ঞাত গ্রন্থকারগণের নিকট তঁাহাদের গ্রন্থের শতকরা ৯০ ভাগ চুরী করিয়াছেন, শতকরা দশভাগ তঁাহাদের নিজেদের, কিন্তু তঁাহারা গ্রন্থারম্ভে একটী ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, ‘এই সকল মতামতের জন্ম আমিই দায়ী।’

যে সকল মহামনীষিগণ মানবজাতির হৃদয়ে গুরুতর তত্ত্বসমূহের ভাব দিয়া গিয়াছেন, তঁাহারা কিন্তু তঁাহাদের গ্রন্থে নাম পর্য্যন্ত দেন নাই, তঁাহারা সমাজকে গ্রন্থখানি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তঁাহারা সকলেই ব্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাধিমাাত্র দ্বারা পরিচিত। তঁাহারাই বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। তঁাহারাই বথার্থ গীতার অনুসরণ করিয়াছেন। তঁাহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ

‘কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।’

‘কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে।’

জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র জগতের উপর কার্য্য করিতেছে। তবে ইহাতেও একটী বিষয়ের অপেক্ষা আছে। বাণিজ্যদ্রব্য যেমন কোন



ব্যক্তিবিশেষের নির্দিষ্ট পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও তদ্রূপ । ভাবরাশি এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইবার পূর্বে উহা যাইবার পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক আর জগতের ইতিহাসে যখনই

কোন মহা দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন বৈদেশিক দিগ্বিজয় যাতা-  
য়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া  
ভারতের ধর্মপ্রভাব বিস্তা-  
রের সহায়ক ।

প্রদেশকে এক স্তরে গাঁথিয়াছে, তখনই এই মার্গা-  
বলম্বনে ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে  
এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করি-  
য়াছে । যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রমাণরাশি  
সঞ্চিত হইতেছে যে, বৌদ্ধদের জন্মগ্রহণেরও পূর্বে ভারতীয় চিন্তা সমগ্র  
জগতে প্রবেশ করিয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বেই বেদান্ত চীন,  
পারস্য, ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল । পুনরায় যখন মহান গ্রীক  
শক্তি প্রাচ্য জগতের সমুদয় অংশকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন  
আবার তথায় ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল আর খ্রীষ্টধর্ম ও  
উহার অতঃসংস্কৃষ্ট যে সভ্যতার গর্ভ করিয়া থাকে, তাহাও ভারতীয় চিন্তায়  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত কিছু নহে । আমরা সেই ধর্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম  
( উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও ) যাহার বিদ্রোহী সম্ভান এবং খ্রীষ্টধর্ম অতি নগণ্য  
অনুকরণ মাত্র । আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার এইরূপ সময় আসিয়াছে ।  
ইংলণ্ডের দোদীপ্ত শক্তিতে জগতের বিভিন্ন ভাগকে আবার একত্র করিয়াছে ।  
রোমক রথ্যানিচয়ের ন্যায় ইংরাজের রাস্তা কেবল স্থলে হইয়া সন্তুষ্ট নহে,  
উহা অতলস্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দিয়া পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে । ইংলণ্ডের  
রথ্যানিচয় সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে । জগতের প্রত্যেক অংশ অল্প  
সকল অংশের সহিত একত্রীভূত হইয়াছে আর তাড়িত নবনিযুক্ত দূতরূপে  
উহার অত্যদ্বৃত অংশ অভিনয় করিতেছে । এই সমস্ত অমুকূল অবস্থা পাইয়া  
ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতা সমষ্টিতে উহার  
যাহা দিবার আছে, তাহা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে । ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি  
যেন আমায় জোর করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়া-  
ছিল । আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, ইহার সময়  
আসিয়াছে । সকল দিকেই গুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে আর ভারতীয় দার্শ-  
নিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যাইয়া আবার সমগ্র জগৎকে জয় করিবে ।  
সুতরাং আমাদের জীবনসমস্তা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে ।

আমাদিগকে শুধু যে আমাদের নিজদেশকে জাগাইতে হইবে, তাহা নহে, ইহা ত অতি সামান্য কথা ; আমি একজন কল্লনাশ্রয় ভাবুক ব্যক্তি—আমার ভাব এই,—হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ বিজয় করিবে।

জগতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি হইয়া গিয়াছে। আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের সেই মহা-সম্রাট্ অশোক, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়-বিদেশে ধর্মপ্রচারের দ্বারা ইন্দো-চীনে বিদেশের অধিকতর কল্যাণের সম্ভাবনা। রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন আর আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেন, সক-

লেরই মনে এই কল্লনা জাগ্রত হউক আর খতাদিন না তোমরা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কার্য্যের বিরাম না হয়। লোকে তোমায় রোজ বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্য্যে বাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, যখনই তোমরা অপরের জন্ত কার্য্য কর, তখনই তোমরা সর্বোত্তম কার্য্য করিয়া থাক। যখনই তোমরা অপরের জন্ত কার্য্য করিয়া থাক, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাব বিস্তারে চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজের জন্ত সর্বোত্তম কার্য্য করিতেছ আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞান-লোভ বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিরূপে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান আদর্শ আর প্রত্যেক-কেই ইহার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে ; ভারতের দ্বারা সমগ্র জগতের বিজয়—ইহার কয়ে কিছুতেই নহে, আর আমাদের সকলকে ইহার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্ত প্রাণপণ করিতে হইবে। উহারা আসিয়া উহাদের সৈন্তদলে ভারত প্রাণিত করিয়া দিচ্—বুছ পরোয়া নেই—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ফেল। অহো, এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, প্রেমের দ্বারা বিদ্রোহকে জয় করিতে হইবে, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না—আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষ্ঠানিক দুঃখনিচয়কে জড়বাদ দ্বারা জয় করা

যায় না। যখন এক দল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পণ্ডতে পারিণত করে আর ক্রমশঃ ঐরূপ পণ্ডসংখ্যা বাড়াইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবগ্রহই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, এক জাতিরূপে তাহারা যদি থাকিতে চায়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জ্ঞাত্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জ্ঞাত্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে? ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত লোক কোথা? এই মঙ্গলবার্তা যাহাতে জগতের প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে পঁহুছে, তাহার জ্ঞাত্য সর্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত লোক কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জ্ঞাত্য এইরূপ বীরহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ প্রচারের জ্ঞাত্য বীরহৃদয় কর্মীগণের প্রয়োজন। জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা না হইলে জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটী আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে—কালই ইহা ফাটিয়া উঠাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। উহার জগতের সমস্ত অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই। উহার স্নুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এই—কাম করিবার সময়, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্য-প্রদেশের ভিতর গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব, হে মাম্ব্রাজ-বাসী যুবকহৃদয়, আমি তোমাদিগকে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। আমাদের বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তা সহায়ে আমাদের জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর পত্যন্তর নাই; এই করিতে হইবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—একদিন যে জাতীয় জীবন সতেজ ছিল তাহার—পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশিদ্বারা জগৎ জয় করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদের বিদেশে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আনিষ্টন করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে। ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পদ্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহার এফেবরে মরিয়া যায়।



স্বামী বিবেকানন্দ ।

ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণ স্বরূপ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বাহিতা আসিয়া থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক উচ্চ ও মহৎ চিন্তার অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিশ্লেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্মের নামে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে আপনাকে বিযাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে, এই ভারতে কতকগুলি বিপদ আমাদের সম্মুখে, উহাদের মধ্যে এক দিকে ঘোর জড়বাদ অপরদিকে উহার প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার; উভয় হইতেই আমাদের বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানমদিবাপানে মত্ত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে। তাহারা প্রাণীম পক্ষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল বতকগুলি রাবিশমাল মাত্র, হিন্দু দর্শন কেবল শিশুর অক্ষুট বাণীমাত্র এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধদের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথাটা একটু চিড়-খাওয়া, তাহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহারা যাহা দেখেন, সবেরই ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত। তিনি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষী ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাহারা নিকট তাঁহার প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটাই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলির প্রতিপালনের উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এইগুলি হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

আমি বরং তোমাদিগের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি কিন্তু কুসংস্কারগণ্ড নিরোধ দোখতে ইচ্ছা করি না; কারণ, নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছ হইবার আশা আছে সে মৃত নহে। কিন্তু যদি

কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায় মস্তিষ্ক নির্বাহী হইয়া যায়; যত্নাকোট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ভীক, সাহসী লোক আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাড়া হউক, ঝাড়ু সতেজ হউক, পেশী লোহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্বাহিতা সম্পা-

দক ভাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্বপ্রকার গুপ্ত-  
 ভাবের দিকে ঝোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদাদ্ব  
 বা বেদ বা সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? প্রাচীন ঋষিগণ  
 তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারার্থ কোথায়-কি গুপ্ত সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন?  
 তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান সত্যসমূহ সমগ্র জগতে দিবার জন্ত তাঁহারা কোথায়-  
 কি হাতের সাফাই, কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা কোথাও  
 লিপিবদ্ধ পাইয়াছে কি? গুপ্ত ভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্ল-  
 লতার চিহ্নস্বরূপ, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ। অতএব উহা  
 হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াও। সংসারে  
 অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। আমাদের প্রকৃতির ধারণা যতদূর, সেই  
 হিসাবে উহাদিগকে অতি প্রকৃত বসিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটী গুপ্ত  
 নহে। ধর্ম্মের সত্যসমূহ গুপ্ত, অথবা উহারা হিমালয়ের হৈমচূড়ায় অবস্থিত  
 গুপ্তসমিতিসমূহের একচেটিয়া সম্পত্তি, এ কথা ভারতভূমিতে কখনই  
 প্রচারিত হয় নাই। আমি তিনালয়ে গিয়াছিলাম; তোমরা যাও নাই।  
 তোমাদের দেশ হইতে উহা অনেক শত মাইল দূরবর্তী। আমি একজন  
 সন্ন্যাসী গত চতুর্দশ বর্ষ ধরিয়া পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি। আমি  
 তোমাদিগকে বলিতেছি, এইরূপ গুপ্ত সমিতি সমূহ কোথাও নাই। এই  
 সকল কুসংস্কারের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না। তোমাদের এবং তোমাদের  
 সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে বরং  
 তোমাদের একটু বীর্য্য আসিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কার সম্পন্ন হওয়া অবনতি  
 ও মৃত্যুস্বরূপ। অতঃ পরে সত্যজ্ঞানবোধ ব্যক্তিগণ  
 সকল বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না। এই সকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় নষ্ট করে,  
 জগতের ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা  
 করিতে সময় নষ্ট করে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার  
 বিষয়। সাহসী হও; সব বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা  
 এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেককাল  
 দাগ—অনেক ক্ষত আছে; ঐগুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে,  
 কাটিয়া দিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম,  
 আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না।  
 ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি ইহাতে অক্ষত থাকিবে আর যত শীঘ্র এই কাল

দাগগুলি মুছিয়া যায়, ততই মূল তত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাক।

তোমরা শুনিয়াছ, জগতের প্রত্যেক ধর্মই আপনাকে সার্বভৌমিক ধর্ম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ

কোন ধর্মই কোন কালে সার্বভৌমিক ধর্মরূপে  
হিন্দুধর্মই একমাত্র সার্ব- পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্মের  
ভৌমিক ধর্ম কেন? এই দাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের

ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে; কারণ, অতীত সকল ধর্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অতীত সকল ধর্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। উহারা মনে করে, ঐ ঐতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্মের দৃঢ়তাবিশ্লেষণ; কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা সবলতা মনে করে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে দুর্বলতা। কারণ, যদি সে ব্যক্তির ইতিহাস ভুল বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে তাহাদের ধর্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে। উক্ত ধর্মসংস্থাপক বড় বড় মহাপুরুষগণের জীবনের অর্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বিশেষরূপ সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং যে কোন সত্যের কেবল তাঁহাদের কথার উপর প্রামাণ্য, সেগুলি উড়িয়া যায়। আমাদের ধর্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্মের সত্য সকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের দ্বারা তাঁহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত।

সুতরাং আমরা চিরকালই ব্যক্তিবিশেষের মতামুখ্যায়ী নহি, আমরা ধর্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের সাকার মূর্তিস্বরূপ—

উদাহরণ স্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে,  
তবে শত সহস্র মহাপুরুষ, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয়  
হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলির লোপ হয়, যদি  
ঐগুলি ভুলিয়া যাওয়া যায়, আর সমস্ত জাতীয়  
জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির  
মতামুখ্যায়ী হইয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্মের অবনতি অনিবার্য্য, সেই

হিন্দুগণ ব্যক্তিবিশেষের  
মতামুখ্যায়ী নহেন,  
ধর্মের মূল সত্যগুলির  
উপাসক।

ধর্মের বিপদ অবশ্যস্তানী। সুতরাং কেবল আমাদের ধর্মই কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নহে, উহা তত্ত্ব-সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপব দিকে, আবার ইহাও পক্ষ গুরু অবতার, মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহাপুরুষেরও আমাদের ধর্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্ব-সমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইতে হইবে। এইটী ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলিতে যাহাতে কালে মালিন্য ও ধূলি সঞ্চিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্ত আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের ঘোব জাতীয় অবনতি ঘটলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও উহাদিগকে দূষিত করিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের শাস্ত্র-সমূহও জগতের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্র অপেক্ষা উত্তমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রাক্লিষ্ট অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্য্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবেই উহা বহিয়াছে, এবং জাবায়াকে সেই আদর্শের দিকে যাইতে বলিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য্যগণ উহা প্রচার করিয়াছেন, আর তোমরা দেখিবে, এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক-গুলি তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈত-ভাবদ্রব্যোত । দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার, তাঁহার দ্বৈতভাব ছাড়া আর কিছুই

দেখিতে পান না—সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি

ভাষ্যকারগণের বেদব্যাখ্যায়

মতভেদ ।

একেবারে চাপা দিয়া যাইতে চান। দ্বৈতবাদী

ধর্ম্যাচার্য্য ও পুরোহিতগণ সকলেই দ্বৈতভাবে উহার

ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে তদ্রূপ অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা ত বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে, এটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মুর্থোচিত কার্য্য। আবার সমগ্র বেদে অদ্বৈত ভাব সমর্থক প্রমাণের চেষ্টাও তদন্তরূপ মুর্থোচিত। বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই। আমরা নূতন নূতন ভাবেরআলোকে আজকাল ইহা অপেক্ষাকৃত ভালরূপে বুঝিতে পারি। চরম সিদ্ধান্তে পঁছরিবার জন্ত প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ধারণার প্রয়োজন, এই সকল



গুলিই আবার মনের ক্রমবিকাশের জন্ত আবশ্যক হইয়া থাকে; সেই জন্তই বেদ সেই তত্ত্বগুলির উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পঁছছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পর বিরোধী, তাহানহে; বেদ বালকবৎ নিরোধ মানবগণকে মোহিত করিবার জন্ত ও সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

কিন্তু উহাদের প্রয়োজন আছে। শুধু বালকগণের জন্ত নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্তও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন দেহ বর্জমানে সঙ্গ ঈশ্বর আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূল-স্বীকার করিতেই হইবে। জগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদেরকে ব্যক্তি-বিশেষ ঈশ্বর বা সঙ্গ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। মহামনীষী রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ এই তিনটির মধ্যে একটি স্বীকার করিলে অপরগুলিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা এড়াইবার যো নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্য জগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ষোর বাতুলতামাত্র।

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া যায়, যখন সে প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়, সেই সর্বাত্মীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে প্রতি বলিয়াছেন,—  
ভূতি।

‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।’

‘ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ ।’

‘নাহং যন্তো সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।’

‘মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।’ ‘সেখানে চক্ষুঃও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।’ ‘আমি তাঁহাকে জানি, ইহাও মনে করিনা, জানি না, ইহাও মনে করি না।’

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই, কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব—আমি ও জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক—উদ্ভূত হয়।

আর এই সিদ্ধান্ত শুধু যে জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার কিছু আমরা প্রেমদ্বারাও লাভ করিতে পারি। তোমরা ভাগবতে

পড়িয়াছ, গোপীগণমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাহার তাঁহার বিরহে  
 প্রেমবলেও অগ্নিতাহুত্ব  
 সম্ভব।

বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার ভাবনা  
 তাহাদের মনে এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের  
 প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইল, তাহারা  
 আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে তাঁহার লীলার অমুকরণে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং  
 আমরা বুঝিতেছি, প্রেমবলেও এই একতাহুত্ব আসিয়া থাকে। একজন  
 প্রাচীন পারস্য দেশীয় সুফির একটা কবিতায় এইরূপ ভাবের কথা আছে :—  
 আমি প্রেমাস্পদের নিকট গেলাম—তাঁহার দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। আমি  
 দ্বারে করাঘাত করিলাম, ভিতর হইতে একটা স্বর বলিল, ‘কেও?’ আমি  
 উত্তর দিলাম, ‘আমি।’ দ্বার খুলিল না। আমি দ্বিতীয়বার আসিলাম,  
 দ্বারে করাঘাত করিলাম। সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেও?’ আমি  
 আবার উত্তর দিলাম, ‘আমি অমুক।’ তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয় বার  
 আসিলাম, সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেও?’ তখন আমি উত্তর  
 দিলাম, ‘হে প্রিয়তম, আমি ও তুমি।’ তখন দ্বার খুলিল।

সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মানুভূতির এই সকল বিভিন্ন  
 উপায় আছে আর যদিও প্রাচীন ভাস্কর্যগণের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে,

তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন  
 নানা উপায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার  
 হইতে পারে এবং উহাতে  
 সকলেরই অধিকার আছে।

হইবে, জ্ঞানের ইতি করা যায় না। প্রাচীন কালে  
 বা বর্তমানকালে সর্বজ্ঞতা কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। যদি অতীত  
 কালে ঋষি মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, নিশ্চিত জানিও, বর্তমান কালেও  
 তাঁহাদের অভ্যুদয় হইবে। যদি প্রাচীন কালে ব্যাস বাজীকি শঙ্করাচার্যগণের  
 অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন শঙ্করা-  
 চার্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্মের এই বিশেষত্বটীও আমাদের  
 সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রত্যাশিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই  
 শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে, বটে, কিন্তু এইরূপ পুরুষের সংখ্যা  
 তাঁহাদের মতে এক, দুই অথবা আত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। তাঁহারা ই সর্ব-  
 সাধারণে ঐ সত্যের প্রচার করিয়াছেন—আমাদের সকলকেই তাঁহাদের কথা  
 মানিতে হইবে। নাসরথীয় যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল—আমাদের

সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে—আমরা আর বেশী কিছু জানি না। কিন্তু আমাদের ধর্মে বলে—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজন নহে, অনেকের ভিতর ঐ সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থে মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বগতত্বের সাক্ষাৎকর্তা—কেবল দাক্ষ্যাদীশ, শারঙ্গাঙ্গী, পণ্ডিত, শঙ্কর নহে,—তৎসাক্ষাৎকর্তা।

নামমাত্রা প্রবচনেন লভ্যো

ন বোধয়া ন বহনা শ্রুতেন।

বহবাক্যব্যয় দ্বারা অথবা বোধ দ্বারা, এমন কি, বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।

বেদ নিজে এক কথা বলিতেছেন। তোমরা কি অল্প কৌন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—বেদপাঠের দ্বারা পর্য্যন্ত আত্মাকে লাভ করা যায় না? হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে প্রাণভরে ধর্ম বাহিরে নহে, ভিতরে। ডাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, তিলক করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র বিচিত্র করিয়া চিতা বাবটী সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তোমাদের হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবান্কে উপলব্ধি করিতেছে, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রঙে, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক কবে না। ধর্মকে সাক্ষাৎ করিলেই তবে কাষ হইবে। বাহিরের রঙ, আভরণাদি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্মজীবনে সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময়ে শুধু অহুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্মজীবনের সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অহুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্মকে সমানার্থক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়া ধর্মজীবনের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা বাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ধর্ম কখন বহিরিঙ্গিয়ের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইতে পারে না। তাহাই ধর্ম, বাহ্য আমাদেরকে সেই অক্ষর পুরুষের সাপাৎকার করায় আর এই ধর্ম সকলেরই জন্ত। যিনি সেই অসীম সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবান্কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বভূতে

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বর্ষ পূর্বে যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বর্ষ পক্ষেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তদ্রূপ ঋষি। আর বতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্মজীবন লাভ হইবে না। তখনই তোমাদের প্রকৃত ধর্ম আরম্ভ হইবে; এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র। তখনই তোমাদের ভিতরে ধর্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদেরকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যদি কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে এই ঋষি লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, আমাদের ধর্মের দর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ হয়, তবে আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব। ইহাই করিতে হইবে। আবার আমাদের প্রাচীন ঋষিগণকে, তোমাদের নিজদের ভিতরেই তাঁহারা বাহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্ট সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহা-ব্যস্ত কর।

পুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরো বড় হইতে চাই। তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কায করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা বড় বড় কায করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শত শত ঋষি ছিলেন, ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন; আর তোমাদের প্রত্যেকেই বত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র জগতের পক্ষে ততই কল্যাণ। তোমরা বাহ্য বিশ্বাস করিবে, তোমরা তাহাই হইবে। তোমরা যদি আপনাদিগকে অকুতোভয় বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে তোমরাও অকুতোভয় হইবে। যদি তোমরা আপনাদিগকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিণত হইবে। কিছুতে ইহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায় সকলের ভিতর একটী সাধারণ মত দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা এই যে আত্মার মধ্যে প্রথম হইতেই মহিমা, ভেদ ও পবিত্রতা রহিয়াছে। কেবল রামানুজের মতে ঈশ্বর লম্বরে লম্বরে সঙ্কচিত হয় ও সময়ে সময়ে বিকাশ হইয়া থাকে আর

শক্তির মতে উহা ব্রহ্ম শব্দ । এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই ত স্বীকার করিতেছে। ব্যক্তিই হউক অব্যক্তিই হউক, যে কোন আকারে হউক, ঐ শক্তি রহিয়াছে আর বস্তু শীঘ্র উহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ । সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে । তোমরা সব করিতে পারিবে । উহা বিশ্বাস কর । বিশ্বাস করিও না—তোমরা দুর্বল । আজকাল আমরা যেমন আপনাদিগকে আধপাগল বলিয়া মনে করি, সেরূপ বিশ্বাস করিও না । তোমরা, এমন কি, অপরের সাহায্য ব্যতীতও সব করিতে পার । সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে—উঠিয়া দাঁড়াও ও তোমাদের ভিতর যে অধীশ্বর লুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ কর ।

## ভারতের ভবিষ্যৎ ।

[ সাম্রাজ্যের এই শেষ বক্তৃতাটি একটি বৃহৎ ভাবুর মধ্যে প্রস্তুত হয়—প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সম্মুখে হইয়াছিল । ]

এই সেই প্রাচীন ভূমি, যেখানে অসংখ্য দেশের পূর্বেই জ্ঞানের অভ্যাস হয় ; সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিকতা-প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবাহমান শ্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উথিতহইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্তনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির যুগ্মিকা শ্রেষ্ঠতম

ধর্মযুগ্মিগণের চরণরঞ্জে পবিত্রীকৃত হইয়াছে ।  
প্রাচীন ভারত ।

এখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্ত উদঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল—এখানেই মানবমন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম আগ্রসর হইয়াছিল । এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ-প্রগতি ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধীয় নতবাদের প্রথম উদ্ভব । ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বক্তা-কাণ্ডে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্রাবীকৃত করিয়াছে, আর এখান হইতেই

আবার তরুণ তরুণের অভ্যুদয় হইয়া মৃতকল্প মানবজাতির ভিত্তর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, বাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, বাহা নিজ অবিদ্যাপী বীর্য ও জীবন নষ্ট করিয়া গরুত হইতেও দৃঢ়ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মাশ্রয়ন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তরুণ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারতসন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাষের কথা বলিতে আসিয়াছি আর ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্যে অতীত গৌরবের চিন্তা ভাবী আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে কার্যের উত্তেজক।

লোকে অনেক বার বলিয়াছে, পূর্ব গৌরব স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না—সুতরাং তোমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব বতদূর পার, পশ্চাদ্গতি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিনী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকর্ষণ তাহার সলিল পান কর, তার পর সম্মুখ-সম্প্রসারিত-দৃষ্টি হইয়া—সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব-শিখরে আরুঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। তোমাদিগকে প্রথমে উহা জানিতে হইবে। তোমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তার পর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শৌণ্ডিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে, সেই অতীত মহত্বের জলন্ত ধারণা হইতেই এমন এক ভাবত গঠন করিতে হইবে, বাহা সে পূর্বে কখনই ছিল না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতির বুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্ডবোর মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি—উহারও আবশ্যকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীপুত্র হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল—সেই ফল মাটিতে পড়িয়া পলিল—তাহা হইতে আবার অল্প জন্মিয়া হয় ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল।

এই অবনতির বৃষ্ণ, বাহ্যিক মধ্য দি। আমরা আসিয়াছি, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি দুইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অকুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান প্রকাণ্ড ‘উদ্ধৃৎসল’ ব্রহ্ম উদগত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—আমি আদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে আগ্রহ হইয়াছি।

অত্যাশ্চর্য দেশের সমস্তাসমূহ হইতে এদেশের সমস্তা জটিলতর, গুরুতর।

জাতীয় অবাস্তুর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসন—সমুদয় লইয়াই একটা জাতি গঠিত। যদি একটা একটা করিয়া এই দেশের সহিত ভুলনা করা যায়, তবে অত্যাশ্চর্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি অল্পসংখ্যক বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য, দ্রাবিড়ী, তাতার, তুর্ক, মোগল ইউরোপীয়—যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ণ সমাবেশ—দুইটা ভারতীয় শাখাজাতির আচার ব্যবহারে

যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পরিচিত পুরাণেতিহাস, আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন—ভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র এক ধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—এ কথা আশ্চর্য্যকি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে ‘এক ধর্ম’ কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ বড়ই বিভিন্ন হউক, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে, বাহ্যতে সকলেরই ঐক্য হয়। এই সাধারণ ভিত্তি আমাদের সম্প্রদায়সমূহের ভিতর রহিয়াছে আর ঐগুলি ছাড়া আমাদের ধর্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্যের অনন্ত স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি অর্থাৎ আমাদের মধ্যে

ধর্মই এই জটিল সমস্তার  
মৌমাংসক।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ঐক্য-  
সাধন আবশ্যক।

বাহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা ইহা জানেন। আর আমরা চাই আমরা-  
দের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের

সর্বসাধারণে ধর্মপ্রচারই  
জাতীয় সম্মিলনের  
প্রথম পদা।

আবালবুদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক  
—সকলে সেইগুলি জাহুক, বুঝুক আর নিজেদের  
জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং  
ইহাই আমাদের প্রথম কার্য। আমরা দেখিতে

পাই। এশিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা, সমাজ যে কোন বিষ-  
য়েই কোন গোল উপস্থিত হয়, ধর্মের সম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট সব  
উড়িয়া যায়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—ধর্ম হইতে উচ্চতর  
জিনিষ আর কিছু নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর ইহাও আমরা  
জানি, আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে সমর্থ।

ধর্ম যে সর্বোচ্চ আদর্শ, ইহা ত সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সেকথা  
বলিতেছি না; ভারতে কার্য করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পদা—প্রথমে  
ধর্মের দিক্টি দৃঢ় না করিয়া এখানে অল্প কোন  
ধর্মের সাধারণ তত্ত্বসমূহের  
ঈগর বিধাসী হইয়া বিরোধ  
পরিহার কর্তব্য।

নই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রথম সেতু স্বরূপ, যুগযুগা-  
ন্তর ধরিয়া অবস্থিত এই ভারতক্ষেত্র রূপ মহাচল হইতে উহাই প্রথম  
সোপানস্বরূপ খোদিত করিতে হইবে। আমাদের জানিতে হইবে যে,  
—বৈতবাদী, বিশিষ্টাবৈতবাদী, অবৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাণ্ডপত সকল  
সম্প্রদায়ের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আরও ইহাও জানিতে  
হইবে, এখনই সেই সময় আনিয়াছে, যখন আমাদের নিজেদের কল্যাণের  
জন্ত আমাদের জাতির কল্যাণের জন্ত আমাদের পক্ষের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব  
পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই বিরোধভাবগুলি  
সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শত্রু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমা-  
দের পূর্বপুরুষগণের উহা সম্পূর্ণ অননুমোদিত আর সেই মহাপুরুষগণ, বাহা-  
দের বংশধর বলিয়া আমরা দাবী করিয়া থাকি, বাহাদের রক্ত আমাদের  
শিরায় শিরায় প্রবহমান, তাঁহারা তাঁহাদের সম্ভ্রামণের সাক্ষ্য সাক্ষ্য  
বিষয় লইয়া এইরূপ বিরোধকে অস্তিত্বহীন করে দেখিয়া থাকেন।

ধর্মের এইরূপ সম্মিলন সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত বিষয়ে উন্নতি



আপনাপনি হইবে। যদি রক্ত ভাঙ্গা ও পরিষ্কার হয়, সে দেখে কোন রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিতস্ফূরণ।

যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ, যদি রোগকীটগুণই শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইল, তখন আর সেই রক্তে অন্য বাহ্য বস্তু কিছু কি করিয়া প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা উপমা লইলে বলা যায়, রোগ হইতে হইলে দুইটা জিনিষের প্রয়োজন :—বাহিরের কোন বিষাক্ত কীটগুণ এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যদি দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগজীবাণু প্রবেশের ও উহাদেহে বৃদ্ধির অসম্ভব না হয়, তবে জগতের কোন কীটগুণ শক্তি নাই যে, শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ক্রমাগত এমণ করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন উহা ঐগুলির অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। কেবল যখন শরীর দুর্বল হয়, তখনই ঐ অণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যখনই জাতীয় জীবন দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়েই সর্বপ্রকার রোগাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং রক্তের মলিনতা দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, বাহ্যতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের ভেজ, বীৰ্য্য, এমন কি, জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে বাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে বাইতেছি না যে, ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যগত পরিণামে আমাদের কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হইবে; কিন্তু ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্ম আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা

আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে বাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে বাইতেছি না যে, ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যগত পরিণামে আমাদের কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হইবে; কিন্তু ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্ম আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা

উহা ছাড়াইতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ রহিয়াছে আর আমাদের ধর্মে আহার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তরুণ নাও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে। তোমরা এই ধর্মবন্ধনে চিরাবদ্ধ; যদি উহা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ—উহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ, তোমরা উহা সবসঙ্গে রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অত্র সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ এই ধর্মরক্ষার জন্য সকলই সাহসপূর্বক সহিয়াছিলেন, এমন কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত আগ্রহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বৈদেশিক দ্বিধিজয়ী আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভগ্ন করিয়াছে—কিন্তু

প্রাচীন মন্দির সমূহ মহা-  
দিক্কার আকর।

এই অত্যাচারশ্রোত যাই একটু বন্ধ হইয়াছে,  
আবার সেই স্থলে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক  
গ্রন্থপাঠে বাহ্য না শিক্ষিতে পার, গুজরাটের সোম-

নাথ মন্দিরের মত দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে তাহা হইতে অনেক অধিক জ্ঞান শিখাইতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, উক্ত মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরুদ্ভবের চির ধারণ করিয়া আছে—বার বার নষ্ট হইতেছে আবার সেই ভগ্নাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্বেরই জায় অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং এখানেই, এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন জাতীয় প্রাণপ্রবাহ

ধর্মত্যাগে বিনাশ।

দেখিতে পাইবে। ইহার অনুসরণ কর, তোমরা  
মহত্বপদবীতে আকৃষ্ট হইবে। উহা পরিত্যাগ কর,

তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে—বিনাশ। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আর কিছুই প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই—আমার এই-টুকু মাত্র বক্তব্য এবং আমার ইচ্ছা যে, তোমরা এটুকু ভুলিও না যে, ঐশ্বরিক গোঁশমাত্র, ধর্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চার ধর্ম—তার পর চার অস্ত্রান্ত বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষভাবে আগাইতে হইবে।

কিভাবে ইহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্য্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মাদ্রাজ ছাড়িবার অনেক

বৎসর পূর্ব হইতেই আমার মনে এই সংকল্পগুলি

আমার কার্য্যপ্রণালী।

ছিল এবং আমি যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়া-  
ছিলাম, তাহার কারণ ইহাই। ধর্ম্মমহাসভা ফন্ডার জন্য আমার বড় ভাবনা  
হয় নাই—উহা কেবল একটা সুযোগস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার  
মনে যে সংকল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আনাকে সমগ্র জগতে ঘুরাইয়াছে।  
আমার সংকল্প এই—প্রথমতঃ, যে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে  
নিবন্ধ রহিয়াছে, যাহা এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে রহিয়াছে, ভার-

সকসাধারণের বোধগম্য

করিয়া শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূ-

হের প্রচার।

তের মঠ ও অরণ্য সমূহে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, সেই

গুলিকে যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে

তাহাদের—শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষারূপে গুপ্ত-

পোড়কা হইতে বাহির করিয়া সকসাধারণে প্রচার

করিতে হইবে। এক কথায় আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সকসাধারণের বোধ্য  
কারতে চাই—আমি চাই ঐ ভাবগুলি সকসাধারণের, প্রত্যেক ভারতবাসীর,  
সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি হউক। এই সংস্কৃত  
ভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্য এই সকল ভাব  
প্রচারের এক মহান্ অন্তরায় আর ষষ্ঠদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সমগ্র জাতিই  
উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূর হইবার  
নহে। সংস্কৃত ভাষা যে কি কঠিন ভাষা, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই  
বুঝিবে যে, আমি সারা জীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি  
প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার নূতন ঠেকে। তবে যাহাদের ঐ ভাষা  
সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা  
কিরণ কঠিন হইবে, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং  
তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ, সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত

শব্দগুলি উচ্চারণ মাএই যেন জাতির মধ্যে একটা

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিখাইতে

গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান্

হইবে।

রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের মিল্ল জাতি-

গণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই

মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্বুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ আছে—এই মহান আচার্য্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল ? ইহার উত্তর এই,—তাঁহারা নিয়জ্ঞাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরুঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্ত শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া বিশেষ ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষানিবদ্ধভাবসমূহ অল্পবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা খুব ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ, তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল ; দূরে, অতি দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে “গৌরববুদ্ধি” ও “সংস্কার” জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি কখন নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তির্য্যকিত পারে না। তোমরা জগৎকে কতকগুলি জ্ঞান দিয়া যাইতে পার কিন্তু তাহাতে ইহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না। ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা আধুনিক ইতিহাস হইতে এমন অনেক জাতির বিষয় জানিতে পারি, যাহাদের এই রূপ কতকগুলি জ্ঞান আছে কিন্তু সে সকল জাতি বোর অসভ্য জাতির তুল্য, তাহারা ব্যাপ্ততুল্য নৃশংস—কারণ তাহাদের জ্ঞান সংস্কারগত হয় নাই। সভ্যতার জ্ঞানও ভাষা ভাষা মাত্র, উহা ভিতরটাকে স্পর্শ করে না, একটু নাড়িলেই ভিতরের পশু প্রকৃতি জাগিয়া উঠে। এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে। অতএব এই বিপদ হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও ; তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান বাহ্যতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ,

ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই। এমন এক নূতন জাতি উঠবে, যাহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও উহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। হে নিয়জাতীর ব্যক্তিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে গোখাণেশ্বি, হিন্দু, বৈবাদ চলিতেছে, উহা বৃথা, উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না—উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ক হইতেই নানাভাগে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরো বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার—সাম্যভাব আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শিক্ষা—যাহা লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব—স্বায়ত্ত্বীকরণ। তাহা যদি করিতে পার, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের বিচার করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মাক্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটু মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রাবিড়ী জাতির নিবাস ছিল; তাহাদের মত—এই দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন—সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অত্যাগ্র জাতি দাক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সমগ্র ভারতই আর্য্যম।

হহার একমাত্র প্রমাণ এই যে—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ বিদ্যমান; আর কোন প্রভেদ নাই। আমরা এতগুলি আর্য্যাবর্ত্তের লোক এখানে রহিয়াছি আর আমি আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করিতেছি। উহাদের মধ্যে কিসের প্রভেদ? একটু ভাষার প্রভেদ মাত্র। যদি বল, ব্রাহ্মণেরা পূর্বে সংস্কৃতভাষী ছিল, এক্ষণে এখানে আসিয়া দ্রাবিড়া ভাষা কাহাতে কাহাতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছে। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে হুহু হইয়, তবে অত্যাগ্র জাতির সম্বন্ধেও ত একথা খাটিতে পারে। বলা যাহতে পারে, অত্যাগ্র জাতিরও আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ছিল—তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা লইয়াছে। এই যুক্তি দুদিকেই খাটিতে পারে। এইরূপ বিষয় সমূহে বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে, একটী দ্রাবিড়ী জাতি ছিল—তাহারা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনজঙ্গলে বাস করিতেছে।

খুব সম্ভব যে ঐ দ্রাবিড়ী ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু তাহারাও আর্য্য—আর্য্যাবর্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্য্যময়—এখানে অপর কোন জাতি নাই। আবার আর এক মত আছে যে—শূদ্রেরা নিশ্চিত অনার্য্য জাতি। আর্য্যগণবিজিত তাহাদের দাসগণ অনার্য্য জাতিই শূদ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার বাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংগাজ, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান বেচারাদিগকে ধরিয়া জীবদশায় কঠোর পরিশ্রম করাত্যাছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, এই ঘটনার তুলনা লইয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীত কালে লাফাইয়া চলিয়া যায় আর এইরূপ অনুমান করা হয় যে, সংস্কৃত ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল! প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্নে দোষিতে থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষুঃ আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জলকায় আর্য্যগণ আসিয়া তথায় বাস করিলেন, তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া ছুড়িয়া বসিলেন, সে বিষয় দ্বন্দ্ববদ্বি জানেন! কাহারও কাহারও মতে মধ্য তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন—মধ্য এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ আছেন—যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপর আবার নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে তাহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের ঢুল কাণ হইলে তিনি আর্য্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। সম্প্রতি, আর্য্যগণ সুইজার্ল্যান্ডের হ্রদসমূহের তীরে বাস করিতেন—প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা উত্তর-মেরুনিবাসী ছিলেন। যদি আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে, আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই। এমন কোন বাক্য নাই, বাহাতে আর্য্যগণকে ভারতবর্ষভূতপ্রদেশনিবাসী মনে করা যাইতে পারে আর আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভূত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য্য, একথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্য্যের পক্ষে শতসহস্র অনার্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাসই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচমিনিটে আর্য্যদের খাইয়া ফেলিত।

জাতিভেদ সমস্তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়—মহাভারতে লিখিত আছে—সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসা ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই মহাভারতেই রহিয়াছে। জাতিভেদ সমস্তার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণের সকল জাতিই ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্তার মীমাংসা এইরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণ গুলিকে হীনতর করিতে হইবে না—ব্রাহ্মণ জাতির লোপ-সাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্ত অবতারণা হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই ব্রহ্মজ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না। আর আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি, আমাদেরকে ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অত্যাচার জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকাংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সত্য। অত্যাচার জাতিকে তাঁহাদিগকে এ গৌরব দিতেই হইবে। আমাদেরকে ভরসা করিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা, যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। অতএব হে বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদে প্রয়োজন নাই। উহাতে কি ফল হইবে? উহাতে আমাদেরকে আরও বিভক্ত করিবে, আমাদেরকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আমাদেরকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে, চিরদিনের জন্ত ভারত-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছে আর ইহাই ভারতে ইংরেজাধিকারের এক মহা সফল।

এমন কি, মুসলমান অধিকারেও এই একচেটিয়া-অধিকার-রাহিত্যরূপ মহা সফল ফলিয়াছে। মুসলমান শাসন প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ ধারাপ নহে—জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ ধারাপও নহে, কোন জিনিষই সম্পূর্ণ ভালও নহে। মুসলমানের ভারত-অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের

কারণ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্রই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে উহা মুসলমান ও উংরাজ শাসনের মুফল। সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে উহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতান্ত

পাণ্ডুলামীমাত্র। আর তোমরা যদি এখন হইতেই সাবধান না হও, তবে মাদ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি, অর্ধেক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তদপেক্ষা জগতে আর অধিক পাণ্ডুলামী কি হইতে পারে? পরিয়া বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যাই তিনি খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইয়া নাম পরিবর্তন করেন, আর কোন গোল নাই। এইরূপ দেশাচার দেখিয়া ইহা ব্যতীত আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারীরা সব পাগল, তাদের গৃহগুলি সব পাগলাগারদ আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতীয় সকল জাতির ঘৃণার পাত্র থাকিবে? তাহারা যে এরূপ দূষিত প্রথাসমূহের এখনও অনুমোদন করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোর লজ্জার বিষয় নহে? নিজেদের ছেলেরা অনাহারে মরিতেছে—এ দিকে ঘাণ তাহারা অপরের হইতেছে, অমানি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া মোটা করা হইতেছে! বিভিন্ন জাতির ভিতর আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকা উচিত নয়।

উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্ত্রাব মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি ব্যক্তি (অবশ্য ইহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান এবং প্রাচীনগণের মহান উদ্দেশ্য বুঝিবার প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের জাতি-ভেদ সমস্ত্রাব নীমাংসা,—নীচ জাতিকে ক্রমশঃ উন্নত করা। ক্ষমতা কিছুই নাই) অন্তরূপ বলিয়া থাকেন, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য-প্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু

যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারা উহা বুঝিতে পারেন। অনন্তযুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ণ প্রবাহ চলিয়াছে, তাঁহারা তাহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ঋষিগণের কার্যপ্রণালীর প্রতি সোপান দেখিতে পান।

সেই ঋষিগণেরা কি? এক দিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; আর



চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের উন্নয়নই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী । যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, তাহাতে দেখিবে, নিম্নতর জাতিসমূহকে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে । এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে । যদি সে ব্রাহ্মণকে “ওহে ব্রাহ্মণ” বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে । ইহা প্রাচীন আশুরিক বর্বরতা—সন্দেহ নাহ, কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না—কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র । সকল যুগে, সর্বত্রই অল্পবিস্তর এইরূপ কিছু না কিছু ঘটিয়াছে । এই প্রাচীনগণের ভিতরও এইরূপ আশুরিক-প্রকৃতি লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল । পরবর্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রদের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—“শূদ্রগণকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই ।” ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক, বিশেষতঃ যেগুলি এই যুগের জন্ত বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট সেই সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই, “যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে—তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর্তব্য ।” এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন বাহ্যেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে । বিস্তারিত ভাবে ইহা দেখাইবার আমার

সময় নাই, কিন্তু মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ের অনু-জাতিভেদের কঠোরতা সহেও সম্মান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ধীরে ধীরে বিভ্রমজাতির ক্রমোন্নতি ।

সকল জাতিই উঠিতেছে । এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হইতেছে । কারণ, জাতিবিশেষ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে ? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে । মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ সহস্র করিয়া ব্যক্তি । উহারা যদি মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না । আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি । কতকগুলি জাতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে আর যখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে ? কারণ, আর যাহাই হউক, প্রত্যেক জাতির সহিত

অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কার্যে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি, এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ করে না।

আর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচার্য্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যুগাচার্য্য-গণ নূতন জাতির স্রষ্টা। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পার। কিন্তু আমার ভ্রমণে ও অভিজ্ঞতায় আমি

উহা অবশেষে করিয়া পাইয়াছি আর আমি : গবেষণায় অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেগুচি লইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে।

তোমাদিগকেও ঋষি মুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য্য হইবার গূঢ় উপায়। অল্লাধিক পরিমাণে সকলকেই ঋষিসম্পন্ন হইতে হইবে। ‘ঋষি’

শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। অগ্রে কার্য্য করিবার উপায়—বিশুদ্ধচিত্ত হও—তোমার শক্তি আসিবে। কেবল ঋষিহীনতা। ‘আমি ঋষি’ বলিলেই চলিবে না, কিন্তু যখনই

তুমি যথার্থ ঋষিহীনতা করিবে, তুমি দেখিবে, অপরে কে জানে কেন, তোমার কথা না শুনিয়া থাকিতেই পারিবে না। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য বস্তু আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্ত্তা হয়, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনে, এমন কি, তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির সহায়ক হইয়া থাকে। ইহাই ঋষিত্ব।

অবশ্য যাহা বলিলাম, তাহাতে কার্য্যপ্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা কিছু হইল না। বিবাদবিসম্বাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাই দেখাইবার জগু দুই একটা কথার আভাস দিলাম মাত্র। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতির মধ্যে ‘রম্পর বোর বাদ’ প্রতিবাদ চলিতেছে। এটি বন্ধ হওয়াই চাই। উভয় পক্ষেরই ইহাতে কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ, একচেটিয়া

অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতিকে নিজের ক্ষমাদি  
নিজে খনন করিতে হইবে; আর যত নীচ তাঁহারা একাধা করেন, ততই

তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, উহা

ব্রাহ্মণ জাতির কর্তব্য— তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও তত তদানক  
সর্বসাধারণে ধর্ম ও বিদ্যাদান।

হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণ জাতির কর্তব্য

ভারতের অজ্ঞাত সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং  
যতদিন ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যদি তিনি কেবল টাকার  
চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও  
উচিত—কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা। কারণ, আমাদের শাস্ত্র  
বলিয়াছেন—অল্পযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া  
তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে  
হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম করেন না।  
সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্ত—ব্রাহ্মণের জন্ত নহে। ব্রাহ্মণগণকে  
আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি,—তাঁহারা যাহা জানেন, শতশত শতাব্দীর  
শিক্ষা অভিজ্ঞতায় যাহা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দিয়া  
ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে  
হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য—তাঁহারা যে যথার্থই ব্রাহ্মণ—এইটি  
স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্ত গুপ্তয়ে ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হই-  
য়াছে, তাহার কারণ, তাঁহার নিকট ধর্মের ভাণ্ডার। ঐ ধনভাণ্ডার খুলিয়া  
জগতে বিতরণ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা যে—ভারতীয় অজ্ঞাত সকলের  
নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন—অপরে জীবনের গূঢ়তম সমস্তা-  
সমূহের রহস্য উপলব্ধি করিবার পূর্বে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ যে অজ্ঞাত জাতি হইতে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া-

ছিলেন, ইহাতে তাহার অপরাধ কি? অপর

ব্রাহ্মণের জাতির কর্তব্য। জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করিল না? তাহারা

কেন প্রথমে অলস হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শব্দ ও কৃষ্ণের পতিশক্তি  
পরীক্ষায় পুনরতিনয় করিল?

তবে কথা এই—অপর অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাভ করা এক কথা আর অসম্ভাবহারের ভয় ঐগুলিকে ধরিয়৷ রাখা আর এক কথা । ক্ষমতা যখন অসহুদেস্তে ব্যবহৃত হয়, বৈদেশিক আক্রমণের কারণ—তখন উহা আনুসঙ্গিক ভাব ধারণ করে; সহুদেস্তে ব্রাহ্মণের জাতিকে ধর্ম ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে । অতএব এই বিচার বঞ্চিত করা ।

শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—তিনি এতদিন যাহার রক্ষকস্বরূপ আছেন—তাহা সর্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্বসাধারণে উহা এত দিন দেন নাই, এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ ঘটয়াছিল । তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণেই যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভারতে আসিয়া আমাদের পদদলিত করিয়াছে । ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটয়াছে ।

আর আমাদের সকলের সাধারণ পূর্বপুরুষগণ যে অপূর্ব ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেইগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য প্রথমে করিতে হইবে । বাঙ্গালাদেশে একটি প্রাচীন কুসংস্কার আছে—যে গোখরো সাগ কামড়াইয়াছে সে যদি নিজেই নিজের বিব উঠাইয়া নয়, তবেই সেই রোগী বাঁচিবে । সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাহার নিজ বিব উঠাইয়া লইতে হইবে ।

ব্রাহ্মণের জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না । সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিতে আক্রমণ করিতে বাইও না । কারণ, আমি

তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ । তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা উপার্জন করিতে ও সংস্কৃত শিথিতে কে নিষেধ করিয়াছিল ? তোমরা এতদিন উদাসীন থাকিয়া ইতিমধ্যে অপর তোমাদের অপেক্ষা অধিক

মস্তিষ্ক, অধিক বীৰ্য্য, অধিক শক্তি ও কৌশলসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া এখন বিরক্তপ্রকাশ কর কেন ? সংবাদপত্রে এই সকল কথা বাদপ্রতিবাদ, বিবাদবিসম্বাদে কথা শক্তিকর না করিয়া, নিজগৃহে এইরূপ কলুষাত্মক বিবাদে ব্যস্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন তাহা পাইবার চেষ্টা করুক—তবেই তাহাদের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন ? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কর না কেন ? যখনই ইহা করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের ভূলা হইবে। ভারতে অধিকার লাভের ইহাই রহস্য।

সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য ও সম্মান এখানে সমানার্থক। বাই তোমরা উহা পাইলে, কেহই তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না।

ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর।  
মনের বলেই সব হয়।

অদৈতবাদের প্রাচীন উগমা লইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত, অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করেন—এইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয় তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ,—৪ কোটি ইংরাজ ৩০ কোটি ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে ? সংহতিই শক্তির বল—একথা বলিলে তোমরা হয়ত বলিবে—উহা ত জড়শক্তিবলেই সাধিত হয়—সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন কোথায় রহিল ? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বৈ কি। এই ৪ কোটি ইংরাজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে আর উহা দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইরা থাকে আর তোমরা ত্রিশকোটির লোক সকলেই পৃথক্ পৃথক্ মনবিশিষ্ট।

সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র মিলন। আমার সকলে সম অন্তঃকরণ হইলেই মনশ্চক্ষের সমক্ষে অর্থবেদসংহিতার সেই অপূর্ণ জাতীয় উন্নতি।  
শ্লোকাবলি স্মরণ হইতেছে :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জাগতাং।

দেবা ভাগং যথাপূর্বে ইত্যাদি।

তোমরা সকলে সমঅন্তঃকরণ বিশিষ্ট হও, কারণ, পূর্বকালে দেবগণ একমনাঃ হইয়াই তাঁহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ

একচিহ্ন বলিয়াছি, মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন—সমাজগঠনেরও ইহাই রহস্য । আর যতই তোমরা অর্থ্য অনর্থ্য স্বাক্ষণ অত্রাক্ষণ জাবিড়ী এই সকল ভুল বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারতের উপাদান স্বরূপ শক্তির সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকিবে । কারণ, বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে । এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য । প্রত্যেক চীনেমানের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন আর যুষ্টিমেয় কয়েকটি জাপানী একচিহ্ন । ইহার কল কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ । সমুদয় জগতের ইতিহাসেই এইরূপ ঘটনা থাকে । তোমরা দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক ; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিসমূহের বিভিন্ন ভাব সমূহকে এককেন্দ্রীভূত করা অতি সহজ—আর ঐরূপ করিতে পারিলে তাহারা সহজেই উন্নত হইয়া থাকে । আর যে জাতিতে লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার সমবেতভাবে কার্য্যপরিচালন তত কঠিন । উহা যেন একটা অসংহত অনিয়ন্ত্রিত লোকসমষ্টি স্বরূপ, তাহারা কখন মিলিতে পারে না । বাহা হউক, আমাদেরকে সমুদয় বিবাদবিসংবাদ ছাড়িতে হইবে ।

আমাদের ভিতর আর এক দোষ আছে । শতশত শতাব্দীর দাসত্বে আমরা যেন একদল মেয়েমানুষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি । তোমরা এদেশে

আমরা নারীজাতির স্থায়  
ঈর্ষাপরায়ণ ।

বা অপর যে কোন দেশে যাও, দেখিবে, তিনজন স্ত্রীলোক যদি একত্র মিলিয়াছে, ত বিবাদ করিয়া বসিয়াছে । পাশ্চাত্যদেশসমূহে বড়বড় সভা করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুদিন বাইতে না বাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া বসে, স্ত্রীরাং কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে । সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখিবে—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন । যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না—জোর করিয়া বসাইয়া দেয় । কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ

ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাদের স্বস্তিবোধ হয়—  
তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে। আমরাও ঐরূপ হইয়াছি।  
যদি একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে চাপিয়া  
দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, তবে তাহা  
অনায়াসে সহিতে প্রস্তুত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। দাসগণকে  
এখন দাসত্ব ভুলিয়া প্রভু হইতে হইবে—সুতরাং তোমাদের ঐ দেব ছাড়িয়া  
দাও।

একণ্ঠে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি বেন  
তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অতীত একেজো দেবতাগণকে এই কয়েক  
বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অতীত দেবতার  
জননী জনভূমি রূপ বিরাট, ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—  
দেবতার উপাসনা কর।

তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র  
তাঁহার কণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার  
অশেষে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দিকে যে  
দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন  
তুমি ঐ দেবতার উপাসনার সক্ষম হইবে, তখন অতীত দেবতাকেও পূজা  
করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়া পথ হাঁটিতে পার না,  
হনুমানের জায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছ? তাহা কখনই হইতে পারে  
না। সকলেই বোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর। তাহা  
হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, কর্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায়  
ধানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার  
নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবে? একি  
ভামাসা—একি ছেলেখেলা না কি? আবশ্যক—চিন্তাশক্তি। কিরূপে এই  
চিন্তাশক্তি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার  
চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা—এই সব মানুষ, এই সব পশু—  
ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্ত।  
তোমাগণকে পরস্পরের প্রতি ঘেমহি সা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ  
না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমার নিজের  
ঘোর কুকর্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ  
খুলিতেছে না।

বিবর প্রকাশ—সুতরাং কোন্‌খানে ধামিবে তাহা জানি না। সুতরাং  
মাপ্রাণে আমি বেভাবে কার্য্য করিতে চাই, হুচার কথা তাহা তোমাদের

নিকট বলিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব।  
আধুনিক শিক্ষার দোষগুণ।

আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক  
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা কি এখনও ইহা বুঝিতেছ না?  
তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ কল্পনা করিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ বিষয় বলিতে হইবে,  
চিন্তা করিতে হইবে এবং কার্য্যও করিতে হইবে। যতদিন না ইহা  
করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই। তোমরা এক্ষণে যে  
শিক্ষা লাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে, উহার আবার কতকগুলি  
বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া  
যায়। প্রথম কথা এই যে, ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ  
অনন্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা অস্ত্র যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব  
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক ছুলে গেল, সে

প্রথম শিথিল—তাহার বাপ একটা মুখ, পিতামহ  
শিক্ষা অর্থে ভাঙ্গা নহে, গড়া।

একটা পাগল, প্রাচীন আচার্য্য গণ সব ভণ্ড, আর  
শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন,  
মেকদণ্ডহীন ‘না’ এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়! আর ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে  
যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় তিন প্রেসিডেন্সিতে একটা লোকও  
জন্মাইল না। মৌলিকভাবপূর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশে  
নব, অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার  
হইতে মুক্ত করিবার জন্ত প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। মাধায়  
কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—ইহাকে শিক্ষা বলে

না। আমাদিগকে জীবন গঠন করিতে হইবে,  
গুণ গ্রহণার্থে শিক্ষা লাভ  
হয় না।

মাছুষ তৈয়ারি করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে  
হইবে, ভাবগুলি হজম করিতে হইলে। যদি  
তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে  
পার, তবে যে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরি মুগ্ধ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা  
আধিক শিক্ষিত।

বধা ধরশ্চন্দনভারবাহী

ভারস্ত বেস্তা ন তু চন্দনস্ত ॥



চন্দনভারবাহী গর্দভ যখন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অতীত গুণ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি ।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাই-ব্রেরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, কোবলমুহই ঋষি । সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব-প্রকার শিক্ষা আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে ।  
জাতীয়ভাবে শিক্ষা দান  
অবশ্য ইহা একটী গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা ।  
করিতে হইবে ।  
আমি জানি না, ইহা কখন কার্যে পরিণত হইবে  
কি না । কিন্তু আমাদের কার্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে ।

কিভাবে আমাদের কার্য করিতে হইবে ? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মাদ্রাজের কথাই ধর । আমাদের একটী মন্দির করিতে হইবে—কারণ, হিন্দুগণ সকল কার্যেরই প্রথমে ধর্মকে লইয়া থাকে ।  
অসাম্প্রদায়িক হিন্দুমন্দির  
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ।  
তোমরা বলিতে পার, বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐ মন্দিরে  
কি দেবতার পূজা হইবে, এই বিষয় লইয়া বিবাদ  
করিতে পারে । এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই । আমরা যে মন্দির  
করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের  
শ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে । যদি কোন সম্প্রদায় ওঙ্কারে  
অবিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই ।  
যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সকলেই হিন্দু । নিজের নিজের সম্প্র-  
দায়গত ভাব অনুসারে সকলেই ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু  
সর্বসাধারণের উপযোগী একটী মন্দিরের প্রয়োজন । অতীত স্থানে আমাদের  
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু  
এখানে তোমাদিগ হইতে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও  
না । এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা  
দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদের মত-  
সমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে—কেবল একটী বিষয় নিষেধ—  
তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ  
করিতে পাইবে না । তোমার বাহা বক্তব্য আছে, বলিয়া যাও, জগৎ উহা  
শুনিতে চায় । কিন্তু অতীত ব্যক্তিগণ সন্মুখে তোমার কি মত, জগতের

তাহা জনিবার সাবকাশ নাই, ওটা তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক ।

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটা বিদ্যালয় থাকিবে । ইহা হইতে যে সকল আচার্য্য গঠিত হইবে,

তাহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবে । আমরা যেমন একপে দ্বারে দ্বারে ধর্ম প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম ও

বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে । আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে । ক্রমশঃ এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অস্ত্রান্ত স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, যতদিন না সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলিতে পারে । ইহাই আমার কার্য্য-প্রণালী ।

ইহা অতি প্রকান্ত ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা চাইই চাই । তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়—টাকার প্রয়োজন নাই, টাকার কি হইবে ? গত বার বৎসর ধরিয়া কাল কি খাইব আমার তাহার ঠিক ছিলনা কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার বাহা কিছু লোক চাই ।

আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্ধাদি আমার দাস, আমি তাহাদের দাস নহি । আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে । লোক কোথায়—ইহাই প্রশ্ন । আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি । লোক কোথায় ?

হে মাজাজবাসী যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না ? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি বিশ্বাসেই শক্তি আসিবে । তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময় । নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ ; আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল । আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতেছি । তোমাদের প্রত্যেকে সেই বিশ্বাসসম্পন্ন হও—অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আশ্রয় মধ্যে বর্তমান । তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে । হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে বাইব আর আগামী দশ বর্ষের মধ্যে আমা-

দের ভাব—যে সকল বিভিন্ন শক্তি সহযোগে জগতের প্রত্যেক জাতি গঠিত হইতেছে, তাহার একাংশস্বরূপ হইবে। আমাদেরকে প্রত্যেক জাতির কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রত্যেক জাতির ভিতরেই—ভারতের বহিঃরই হউক আর ভিতরেই হউক—আমাদেরকে কার্য্য করিতে হইবে। কেউকোঁই আমরা অগ্রসর হইব।

আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, ‘আশিষ্ঠো দ্রুতিষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী’ যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। এই—সময় তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি স্থির করিবার, যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন তোমাদের কর্ম্মশক্তি না ফুরাই-  
 কয়েকজন দৃঢ়শরীর স্বার্থ-  
 ত্যাগী যুবকের আবশ্যক।  
 তেছে, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে। কাষে লাগো—এই সময়। কারণ, নব-বিকশিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ করিবার ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কাষ করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প—সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্ত সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্ত আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতর কর্ম্ম। এট জীবন কতটুকু? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মাল্লাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা কহিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী হইলাম, কিন্তু সে দুদিনেব জন্ত, উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে বাহ্য নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না উহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হই নাই—উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন যত্নাই নিশ্চয়, তখন এস একটী মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক আর সেই ভগবান্ যিনি বার বার তাঁহার নিজজনের পরিব্রাজনের জন্ত ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, শাস্ত্রসমূহে যাহার বাণী লিপিবদ্ধ, সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হউন।

## চেন্নাপুরী দাতব্যভাণ্ডারে বক্তৃতা।

যাত্রাজে অবস্থানকালীন স্বামীজি চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজের নামক এক 'দাতব্যভাণ্ডারে'র সাহস্রিক অধিবেশনে সভাপতি হন। জনৈক পূর্ণ বক্তা অত্যন্ত জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে বিশেষভাবে ভিত্তিমান হবার দোষ প্রদর্শন করেন। স্বামীজি ঐ বিষয়ে বলেন, এই প্রকার ভাল মন্দ ছদিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষক স্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত পড়িবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

ভারতের অবিচারিত দান ও অত্যাচারিত জাতির বিধিবদ্ধ দান প্রকার তুলনা করিয়া স্বামীজি বলিলেন, ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও

শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের  
বিধিবদ্ধ না অবিচারিত দান? দরিদ্রকে আইন গরিবখানায় ( Poor-house )  
হাইতে বাধ্য করে ; মানুষ কিন্তু আহাৰ অপেক্ষা

স্বাধীনতা ভালবাসে সুতরাং সে গরিবখানায় না যাওয়া সমাজের শত্রু চোর ডাকাতে হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্ত আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীরে অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আবশ্যক থাকিবে। এখন হয় ভারতের জায় অবিচারিতভাবে দান করিতে হইবে, বাহার ফলে অন্ততঃ স্যাঁসিগণকে—তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার লাভ করিবার জন্ত অন্ততঃ কিছু শাস্ত্র শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চাত্য জাতির জায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, বাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্র-দুঃখ-নিবারণ প্রকার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া গণ নাই। এখন কোন পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

## কলিকাতা ।

মংগ্রাজ হইতে স্বামীজি কলিকাতায় আসিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির বন্দন ও অহুসারে ঐদিরপুর হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে অতি প্রত্যুষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। তথায় প্রায় বিংশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র স্বামীজি গাড়িতেই দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। স্বামীজির প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মুক্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। ‘জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়’ ‘জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকি জয়’ শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হইল। যুবকগণ স্বামীজির গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত পথ পত্রপুষ্পাদিনির্মিত তোরণ ও পতাকায় শোভিত হইয়াছিল। রিপণ কলেজে অতি অল্পকণ থাকিয়া স্বামীজি রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতীবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। ঠাহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ৬গোপাললাল শীলের কান্দিপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামীজি মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তুকগণকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অভিনন্দন সভা আহূত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পরে একটি রৌপ্যপাত্রে ঐ অভিনন্দন-পত্র স্বামীজিকে প্রদত্ত হইল। আমরা সমগ্র অভিনন্দন পত্রটির বঙ্গানুবাদ দিলাম।

কলিকাতা অভিনন্দন ।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী ।

প্রিয় ভ্রাতঃ,—

কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অত্যাশ্চর্য্য কতিপয় স্থানের হিন্দু অধিবাসী আমরা

আপনার নিজ জন্মভূমিতে শুভাগমনোপলক্ষে আপনাকে প্রবেশ সান্ত জ্ঞান-  
ধর্না করিতেছি। এই কার্যে আমরা কৃতজ্ঞতার সাহিত একটু গলপ শুভ্র  
করিতেছি। কারণ, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনি যে মহৎ কার্য্য করিয়া-  
ছেন এবং নিজ জীবনেও যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে শুধু যে  
আপনি আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে, আপনি  
সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশের যুথোজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৮৯০ সালে আমেরিকার চিকাগো শহরে যে মহামেলা বসিয়াছিল,  
তাহার অঙ্গীভূত ধর্ম্মন্যাসভায় আপনি আর্ধ্য-ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ বিবৃত  
করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যান আপনার অধিকাংশ শ্রোতার নিকট  
দৈববাণী স্বরূপ প্রাতিভাত হইয়াছিল, আপনার বক্তৃতার ওজস্বিতা ও মাদুর্য্য  
সকলকে অভিভূত করিয়াছিল। কেহ কেহ হয় ত একটু সন্দেহের ভাবে উহা  
লইয়াছিল, কতকগুলি ব্যক্তি উহার সমালোচনা করিয়া থাকিতে পারে  
কিন্তু উহাতে অধিকাংশ শিক্ষিত মার্কিনের ধর্ম্মবিশ্বাসে যুগান্তর আনয়ন  
করিয়াছিল। তাহাদের মনে যেন নূতন আলোকের উদয় হইল আর  
তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্যানুরাগ ও অকপটতাবশে তাহারা ঐ নূতন  
আলোকের সম্পূর্ণ সহায়তা লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। আপনার কার্য্যক্ষেত্রের  
পরিধি বাড়িল, আপনার প্রচারবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হইতে চলিল।  
নানা প্রদেশ হইতে, নানা নগর হইতে আপনার আহ্বানের পর আহ্বান  
আসিতে লাগিল, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল, অনেক  
সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল, অনেক সমস্তার মীমাংসা করিতে হইল। আপনি  
এই সমুদয় কার্য্যই উদ্যমের সহিত, দক্ষতার সহিত, অকপটভাবে করিলেন  
আর উহার স্থায়ী ফলও ফলিল। আপনার উপদেশ আমেরিকার সাধা-  
রণতন্ত্রের অনেক সুশিক্ষিত সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নূতন  
চিন্তা ও গবেষণার উদ্দীপনা করিয়াছে আর অনেকস্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা  
সকলকে হিন্দু আদর্শ সমূহের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর  
করিয়া স্পষ্টভাবেই পরিবর্তিত করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের যুগপৎ চর্চ্চা ও  
আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লাব ও সমিতি সমূহের অতি  
সম্পন্ন বৃদ্ধি পাশ্চাত্যদেশে আপনার কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ। আপনাকে লগুনে  
স্থাপিত একটা বেদান্তদর্শন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।  
আপনি নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ নিয়মিতভাবে উহাতে

পদান করিয়াছে এবং অনেক স্থানের লোক উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।  
 দেবগণের প্রাচীরের বাহিরেও উহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। লগুনস্থ  
 বদান্ত চর্চনের ছাত্রগণ আপনার তথা হইতে আসিবার অব্যবহিত পূর্বেই  
 আপনাকে যে আনন্দন দিয়াছিল, তাহাতে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহারা  
 আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, আপনার  
 শিক্ষায় তাহাদের আপনার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদয় হইয়াছে।

বেদান্তের আচার্য্যরূপে উহার বিস্তারে সফলকাম হইবার কারণ শুধু  
 আপনার আধ্যাত্মের সত্যসমূহের সহিত গভীর ও সন্নিবিষ্ট পরিচয় অথবা  
 বুদ্ধতা ও লেখা স্বাধীন শাস্ত্র ব্যাখ্যানে পটুতা নহে, কিন্তু প্রধানতঃ আপনার  
 চরিত্র। আপনার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে  
 অতি মূল্যবান জিনিস হইয়াছে, সুতরাং উহাদের প্রভাব লোকের উপর  
 বিস্তৃত না হইয়া যায় নাই। কিন্তু আপনার সরল, অকপট, আত্মত্যাগময়  
 জীবন এবং আপনার বিনয়, আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠা ও তৎপরায়ণতার দৃষ্টান্তে উহার  
 ফল শতগুণ বাড়িয়াছে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়।

আমাদের ধর্মের মহান সত্যসমূহের আচার্য্যরূপে আপনি জগতের যে  
 হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে  
 হইতেছে, আপনার শ্রদ্ধাস্পদ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গীয় স্মৃতির  
 সন্মান প্রদর্শন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমরা যে আপনাকে পাইয়াছি,  
 তাহার জগৎ প্রধানতঃ তাঁহার নিকট গুণী। তাঁহার অপূর্ণ দৈবশক্তি-বলে  
 আপনাব ভিতর যে স্বর্গীয় বহিষ্কৃত ছিল, তাহা অনেকদিন পূর্বেই  
 আবিষ্কার করেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—  
 সুখের বিষয়, তাহা এক্ষণে পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ঈশ্বর আপনাকে যে  
 দৈবদৃষ্টি ও ঐশ্বরিক শক্তি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা খুলিয়া দেন, তাঁহার  
 পবিত্র স্পর্শের দ্বারা আপনার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনোদ্দেশ্যের পতি ফিরাইয়া  
 দেন এবং তিনিই সেই অদৃশ্যবাজ্যের তত্ত্বাবধানে আপনার সগায়তা করেন।  
 আপনিই পরবংশীয়গণের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দায়বরূপ।

হে মহাত্মন, আপনি যে পথ নির্বাচন করিয়াছেন সেই পথে স্থিরভাবে  
 সাহসের সহিত অগ্রসর হউন। আপনাকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে।  
 আপনাকে অজ্ঞ, নাস্তিক, স্বেচ্ছায় অন্ধ জনগণের নিকট হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ও  
 সমর্থন করিতে হইবে। আপনি যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে

আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে আর আপনি এখনই বতটা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। জগতের অনেক দেশ তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি রহিয়াছে আর আমাদের স্বদেশ অথবা আপনার স্বদেশ আপনার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। অগণ্য হিন্দুর নিকটই আপনাকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব আপনি এই মহান্ কর্মের জন্ত প্রস্তুত হউন। আপনার প্রতি এবং আমাদের জীবনকালের আঘাতের প্রতি আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমাদের জাতীয় ধর্ম কোনরূপ ভৌতিক বিজয় চাহে না। উহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক; জড়নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, বিচারদৃষ্টিতে মাত্র প্রতিভাত সত্যই উহার অস্ত্র। আপনি সমগ্ৰ জগৎকে এবং আবশ্যক হইলে হিন্দুদিগকেও তাহাদের অন্তঃকর্মে উন্নীলন করিতে, ইঙ্গ্রিয়ের রাজ্যের পারে যাইতে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যথার্থভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেই পরমসত্যের সম্মুখীন হইতে এবং মনুষ্য বলিয়া জগতে তাহাদের যথার্থ স্থান ও পরিণাম উপলব্ধি করিতে আহ্বান করুন। সকলকে জাগাইতে অথবা আহ্বান করিতে আপনাকে উপযুক্ত কেহ নাই আর বিধাতা নিশ্চিতই যে কাষের জন্ত আপনাকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনাকে সহায়ত্বের সহিত ও অবিচলিত ভাবে সহায়তা করিব, ইহা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

প্রিয়ভ্রাতঃ

আপনার স্নেহের বন্ধু ও ভক্তগণ।

### কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর।

মানুষ তাহার ক্ষুদ্র আমিকে অনন্তে ডুবাইতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয় স্বজন দ্বী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে অতি দূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে—দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্বিক ত্রিংশত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্বদাই একটি মুহূর্ত্ত অক্ষুণ্ণ নিহিত পায়,

আমি কলিকাতাবাসী  
বালকরূপে তোমাদের  
নিকট উপস্থিত।



তাহার কণ্ঠে একটি সুর সর্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারান তাহার কাণে কাণে মৃদু সুরে বলিতে থাকে, “জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী”। হে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্মাদিভাবে উপস্থিত হই নাই প্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু তোমাদের নিকট পূর্বের ত্রায় সেই কলিকাতাবাসী বাণকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাত্রিপথের ধুলির উপর বসিয়া বালকের ত্রায় সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার জন্ত তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাভ্রতনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজি! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরববৃকুটধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য ভূমিও ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে? আমি বলিলাম, “পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ”। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আসিল না।

হে কলিকাতাবাসিগণ, আমার ভাই সকল, তোমরা আমার প্রতি যে অন্তর্গত প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, স্বার্থ ভ্রাতারই কাষ করিয়াছ। অহো! হিন্দু ভ্রাতারই এই কাষ। কারণ, এক্রপ পারিবারিক বন্ধন, এক্রপ সম্পর্ক, এক্রপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির দীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

এই চিকাগো ধর্মসভা একটি বিরাট্ ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্ত ধন্যবাদার্থও বটে। কিন্তু এই ধর্মসভাসভার স্বার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, স্বার্থ উদ্বেগ যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট গুন। তথাকার অধিকাংশ লোকের

চিকাগো ধর্মসভার  
ইতিহাস।

জন্ত ধন্যবাদার্থও বটে। কিন্তু এই ধর্মসভাসভার  
স্বার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, স্বার্থ উদ্বেগ

ইচ্ছা ছিল, খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অপর ধর্ম সকলকে হাত্তাস্পদ করা। কার্যতঃ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অতরূপ হইয়াছিল। অনেকেই আবার আমাদের প্রতি সদয় ছিল, তাহাদিগকে প্রচুর ধন্যবাদও দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তবিক কথা এই—আমার আমেরিকা যাত্রা সম্বন্ধে মার্কিনজাতি।

ধর্ম মহাসভার জন্ম নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের অনেকটা পথপরিষ্কার ও কাষের সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও সভার সভ্যগণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাজ্যনিবাসী, সহৃদয়, আতিথেয়, উন্নত সমুদয় আমেরিকান জাতির প্রাপ্য—যাহাদের মধ্যে অপর জাতি অপেক্ষা ভ্রাতৃত্বাবিশেষরূপে বিকাশ হইয়াছে। কোন আমেরিকাবাসীর সহিত ট্রেনে পাঁচ মিনিটের জন্ত আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই আমেরিকাবাসীর লক্ষণ—ইহাই তাহাদের পরিচয়। তাহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আমার প্রতি তাহাদের দয়া বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাহারা যেরূপ অপূর্ণ দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বলিতে আমার বছবর্ষ লাগিবে।

কিন্তু শুধু আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ দিলে চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্থ, আটলাণ্টিকের অপর পারস্থ সেই ইংরাজ জাতিকেও আমাদের

তদ্রূপ বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যখন  
ভাবগোপনে অত্যন্ত আমি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলাম, তখন আমার যত-  
ইংরাজ জাতি। দূর ব্রিটিশ জাতির উপর ঘৃণা ছিল আর কাহারই

বোধ হয় ততদূর নাই; এই প্রাটফরমে যে সকল ইংরাজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যতই আমি তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম ব্রিটিশ জাতির জীবনযন্ত্র কিসে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম; ঐ জাতির মর্মস্থান কোথায়, ততই উহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরাজজাতিকে এখন আমাদের অপেক্ষা বেশী ভাল বাসেন। তাহাদিগের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটতেছে, তাহা দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের

জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধ ভাবও প্রায়ই অজ্ঞান-জনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাহাদের জানিনা, তাহারাও আমাদের জানেনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, এমন কি, নীতি পর্য্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই

কোন ইংরাজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান,— জাতির বিবেকের মূল। এখানে দুঃখ দারিদ্র্য অপ্রতিহতপ্রভাবে বিরাজ

করিতেছে, তিনি অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, এ দেশে ধর্মের কি কথা, নীতি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। তাহার নিজের অভিজ্ঞতা অবশ্য সত্য। ইউরোপের শৈত্যপ্রধান আবহাওয়ায় এবং অস্ত্রাস্ত্র নানা কারণে দারিদ্র্য ও পাপ একত্রে দেখা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা নহে। আমি জানি, ভারতবর্ষে যে বত দরিদ্র সে তত অধিক সাধু, কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক বুঝা সময়সাপেক্ষ। আর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের গুণ রহস্য বুঝিবার জন্ত দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বৈদেশিক প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্য্যসহকারে অধ্যয়ন করেন ও বুঝিতে পারেন, এরূপ লোক অল্পই আছেন। এখানে, কেবল এখানেই এমন জাতির বাস, তাহাদের নিকট দারিদ্র্য ও পাপ তুল্যার্থহচক নহে; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে। এইরূপ আমাদের গকেও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি অতি ধৈর্য্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের জী পুরুষের মেলামেশা এবং অস্ত্রাস্ত্র আচার ব্যবহার সকল গুলিরই অর্থ আছে, সকল গুলিরই ভাল দিক আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে উহাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাহারা আমাদের অনুকরণ করিবে; সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সকল গুলিরই একটা গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও তাহাদের আচার ব্যবহার গুলিকে যেন উপহাস না করি, তাহারাও যেন আমাদের তদ্রূপ না করে।

আমি এই সভার সমক্ষে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সম্ভাব-  
জনক হইয়াছে। অকুতোভয়, দৃঢ়অধ্যবসায়শীল  
আমার মতে ইংলণ্ডে আমার ইংরাজ জাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার  
প্রচারকার্য অধিকতর ছাড়া। প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (তাহার মস্তিষ্কের  
খুলি যদিও অপর জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায়  
না, কিন্তু যদি ক্রুপের দ্বারা ঐ খুলি ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কে কোন ভাব  
প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়) উহা তাহার মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়, কখন  
বাহির হয় না আর সেই জাতির অসীম কার্যকারিণী শক্তিবলে বীজভূত  
সেই ভাব হইতে অল্পর উদ্ভূত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অপর কোন  
দেশে তদ্রূপ নহে। এই জাতির ধেরূপ অপরিমিত কার্যকারিণী শক্তি,  
এই জাতির ধেরূপ অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির তদ্রূপ দেখিতে  
পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্যকারিণী শক্তি অগাধ।  
আর এই ইংরাজ হৃদয়ের গুণ উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের  
গভীর প্রদেশে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্চাস লুক্কায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে?  
উহার বীরের জাতি, উহার প্রকৃত ক্রিয়, উহাদের শিক্ষাই তাৎপোপন  
করা, কখন না দেখান—বাল্যকাল হইতেই তাহারা এই শিক্ষা পাইয়াছে।  
খুব কম ইংরাজ দেখিতে পাইবে, যে কখন নিজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ  
করিয়া কেলিয়াছে; পুরুষের কথা কেন, ইংরাজ রমণীও কখন হৃদয়ের  
আবেগ প্রকাশ করে না। আমি ইংরাজ রমণীকে এমন কার্য করিতে  
দেখিয়াছি, বাহা করিতে অতি সাহসী বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু  
এই বীরের ভিত্তির পশ্চাতে, এই ক্ষত্রস্থূলত কঠিনতার অন্তরালে ইংরাজ  
হৃদয়ের ভাববারির গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনারা একবার উহার  
নিকট পৌঁছিতে পারেন, যদি আপনারা একবার উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা  
হয়, যদি উহাদের সহিত মেশেন, যদি তাঁহাকে একবার আপনারা নিকট  
তাঁহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরমিত্র,  
তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই হেতু আমার মতে অজ্ঞাত হুন অপেক্ষা  
ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য অধিকতর সম্ভাবজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ়  
বিশ্বাস করি যে, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচার-  
কার্য অল্প থাকিবে ও ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে থাকিবে।

ভক্ত মহোদয়গণ ! আগনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্বাংগে  
নতীতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য,  
আমার জীবনের আদর্শ, ধর্মবীর, আমার প্রাণের দেবতা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের  
নাম গ্রহণ করিয়া। যদি কার মন বা বাক্য দ্বারা  
মল্লীর আচার্য্য রামকৃষ্ণ আমি কোন সংকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার  
পরমহংস। মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে  
বাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার  
কোন গৌরব নাই ; তাহা তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অস্তি-  
শাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহার প্রতি  
বৃণাচ্ছক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। বাহা  
কিছু দুর্বল, দোষযুক্ত, সবই আমার। বাহা কিছু জীবনপ্রদ, বাহা কিছু  
বলপ্রদ, বাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং  
তিনি স্রষ্টা। সত্য, বজ্রগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয়  
নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ  
করিতেছি, তাঁহাদের অন্তর্দ্বানের পর শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাঁহাদের জীবনী  
লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের শিষ্যগণ ক্রমাগত সেই জীবনের  
অনুজ্জ্বল অংশকে পুনঃ পুনঃ তুলিকা স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু  
তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বাঁহার ছায়ায় আমি বাস  
করিয়াছি, বাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই বাগকৃষ্ণ  
পরমহংসের জীবন বৈরাগ্য উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন  
মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।

বজ্রগণ ! তোমাদের সকলেরই গীতার ভগবদ্ভক্ত্যু-  
বাণী জানা আছে,—

যদা যদা হি ধর্মস্য মানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ কুরুতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ত্যামি যুগে যুগে ॥

“যখনই যখনই ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তখনই  
আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিভ্রাণের জন্য, অসাধু দলনের জন্য  
ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।” এই সঙ্গের আর

একটা কথা আপনাদিগকে বୁঝিতে হইবে, আজ আমাদের চক্ষের সমক্ষে তরুণ ঘটনাই ঘটিতেছে। এইরূপ বর্ষাবস্থা প্রবলবেগে আসিবার পূর্বে সমাজের সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র তরুণপরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যে একটা তরঙ্গ—প্রথমে বাহার অস্তিত্বই হয়ত  
মহাশক্তির আধার  
ঈশ্বরাকৃতি। কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, বাহাকে কেহ ভাল করিয়া

দেখে নাই, বাহার গুণশক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই—ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে বেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে সুবিপ্লবকায় ও প্রবল হইয়া মহাবল্য রূপে পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতি রোধ করিতে পারে না। এইরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবে ইহা দেখিতে পার; যদি তোমাদের হৃদয়হার উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহা গ্রহণ করিবে; যদি তোমরা সত্যাহুসন্ধিষু হও, তবে তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ সে অতি অন্ধ, যে সময়ের চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, কোন সুদূর অপরিচিত গল্পানিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা মাতার এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, বাহার শত শত শতাব্দী ধরিয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে। যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ তাঁহারই শক্তি। কারণ, ভূমি, আমি, সাধু, মহাপুরুষ, এমন কি, অবতারগণ, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশ মাত্র—কোথাও বা কম কোথাও বা বেশী ঘনীভূত ও পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র দেখিতেছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্বেই ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা আমরা দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্ত এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। আমরা যে, যে মূল জীবনী শক্তি দ্বারা ভারতকে সলা সজীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য্য করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরাজ রাজনীতির সহায়তায় ধর্ম বৃদ্ধেন, বোধ

হয় আমেরিকাভাগী সমাজনীতির সহায়তায় সহজে ধর্ম কৃত্তিতে পারেন কিন্তু হিন্দু—রাজনীতি, সমাজনীতি ও অত্যাশ্রয় বাহা কিছু সবই, ধর্মের ভিতর দিয়া নহিবে বাঁধতে পারেন না। জাতীয় জীবনসঙ্গীতের এইটাই যেন প্রধান সুর, অত্যাশ্রয় যেন তাহারই একটু উন্টা পান্টা করা মাত্র। আর ঐটাই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া তৎস্থানে অত্যাশ্রয় একটা স্থাপন করিতে বাইতেছিলাম, আমরা যেন, যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, তাহারি পরিবর্তে অপর একটা স্থাপন করিতে বাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে বাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে তোমরা যে ভাবেই লও, তাহা আমি বড় ধরি না; ইহাকে তোমরা কতটা ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্বিতীয় মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমাদের কর্তব্য—এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা। তোমাদেরই দেখা কর্তব্য যে, এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপ সাধিত হইতেছে। অহো, জগতে সার্বভৌমিক ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাবের কথা উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন একজন ছিলেন, বাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটী আদর্শ ধর্মমহাসভার স্বরূপ ছিল।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নিগূণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরেজায় সকলেই যদি সেই নিগূণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল।  
 একটা সগুণ আদর্শের  
 প্রয়োজন।  
 অনেকেরই পক্ষে একটী সগুণ আদর্শ না থাকিলে চলিবে না। ঐকরূপ কোন মহান আদর্শ পুরুষে বিশেষ অগ্রাঙ্গী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি, একেবারে কাঁধে করিতে পারে

না। রাজনৈতিক, সামাজিক বা বাণিজ্যিকক্ষেত্রে কোন আদর্শ পুরুষ কখন সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই ধর্মবীর। উন্নত মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে পারি, সকলে মাতিতে পারি। রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন প্রকৃত ধর্মবীর আমাদের মধ্যে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। যদি এই জাতিকে উঠিতে হয়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। তাঁহার নাম যেই প্রচার করুক, আমি তুমি বা অপর কেহ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে ধরিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে কি দৃষ্টিতে দেখিবে, তাঁহাকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তোমাদিগের এখনই গৃহা স্থির করা উচিত। একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক,—তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, ইহাঁর জায় পবিত্রভাবে কেহই জীবন যাপন করেন নাই। আর ইহা ত স্পষ্টই দেখিতেছে যে, এরূপ অত্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা ত কখনও পড় নাই, দেখিবার আশা ত দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবে পর দশ বৎসর বাইতে না বাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। হে ভদ্রমহোদয়গণ! এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্মের উন্নতির জন্য কর্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রমাত্র। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি বথার্থ বাহ্য ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও ভুল্য হইতে পারে না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তরে সেই সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্তমান আছেন, আর আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিম আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহা-যুগান্তর অবশ্যজ্ঞাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও হৃৎপ্রত



করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্ত প্রভুর কার্য আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কার্যের জন্ত শত সহস্র কর্মী হৃদন করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য করা ও আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

ক্রমশঃ এই ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে তোমরা নির্দেশ করিয়া-  
ছিলে যে, আমাদেরকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, তাহা আমা-  
দিগকে করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী  
জয় করিতে হইবে, ইহা হইতে নিম্নতর আদর্শে আমি  
কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয় ত

খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকের এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে  
পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদের আদর্শ করিতে হইবে।  
আমরা জগৎ জয় করিব কিম্বা মরিব। আর কোন পথ নাই। বিস্মৃতিই  
জীবনের চিহ্ন। আমাদেরকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে রাখিতে হইবে, হৃদয়ের  
প্রসার করিতে হইবে, আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে  
নতুবা আমরা হীনাবস্থ হইয়া পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের  
মধ্যে একটা কর, হয় বাঁচ না হয় মর।

সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশের ঘেঁষকলহের  
কথা কাহারও অবদিত নাই কিন্তু আমার কথা শুন, ইহা সব দেশেই  
আছে। রাজনীতি যে সকল জাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, সেই সকল জাতি

আমাদের বৈদেশিক নীতি।  
( Foreign policy )

আমাদের বৈদেশিক নীতি।  
( Foreign policy )  
অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ  
দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়,  
তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে,  
অমনি গৃহবিবাদ ধামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে কিন্তু উহা  
ধামাইবার আমাদের কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে  
আমাদের শাস্ত্রের সত্য প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক।  
ইহা যে আমাদেরকে এক অশুভ জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি  
আর প্রমাণান্তর চাও? তোমাদের মধ্যে বাহ্যার রাজনীতি-বোনা, তা-  
দিগকে আমি এই প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করিতেছি। অস্ত্রকার সভাই যে এ বিষয়ের  
চূড়ান্ত প্রমাণ।

এত বার্ষিকতার দিক্ হইতে বিদেশে বর্ষপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা দেখাইলাম। বার্ষিক কথা ছাড়িয়া দিয়াও উচ্চতর দৃষ্টি হইতে এই সময়্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতের পতন ও দুঃখদারিত্বের অন্ততম প্রধান কারণ বিদেশে বর্ষপ্রচার ঘাড়া এই যে, তিনি নিজ কার্যক্ষেত্রে সন্মোচন করিয়া- আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূর ছিলেন, আমূকের মত দরজার খিল দিয়া বসিয়া- হইবে।

ছিলেন, আর্থোত্তর অগ্ৰাণ্য সত্যপিপাসু মানবজাতির নিকট নিজ রক্তভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করেন নাই। ইহাই আমাদের অবনতির অন্ততম প্রধান কারণ যে, আমরা বাহিরে বাইরা অপূর্ণ জাতির সহিত আমাদের তুলনা করি নাই আর তোমরা সকলেই জান, যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন হইতে আজ ভারতের সর্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন অম্লভূত হইতেছে—তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অল্প পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ভূতকালে যদি এই শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকারে দেখা গিয়া থাকে, তবে এক্ষণে উহা মহা বস্তুর আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের বিদেশে যাইতে হইবে।

আর আদান প্রদানই অভ্যাসের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্য-গণের পদতলে বসিয়া সব জিনিষ, এমন কি, বর্ষ পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য উহাদের নিকট আমরা কল কল শিখিতে পারি পাশ্চাত্য জাতির নিকট শুধু আরও অগ্ৰাণ্য অনেক জিনিষ উহাদের নিকট শিখিলে চলিবে না, কিছু শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে।

শিখাইতে হইবে। আমরা উহাদিগকে আমাদের বর্ষ আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে। ভারতের অমূল্য রত্ন, তাহাদের অপূর্ণ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের জন্য জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ দুর্ভিক্ষের মধ্যেও বাহা সব্বত্র হৃদয়ে জ্বলিয়া আসছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে।

তোমাদের পূর্ণগুরুবর্ণের সেই অপূর্ণ রত্নরাজির জন্য ভারতবর্ষেই প্রদেশবাসীরা কিরূপ উদ্গীৰ্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিবে? আমরা

এখানে অনাগ্র বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, বাহা কিছু  
পতীর প্রকার বস্ত্র সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি,—একণে এই হাসিয়া  
উড়াইয়া দেওয়াটা একটা জাতীয় পাপের মধ্যে  
ভারতের ধর্মগ্রন্থের জন্ত দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এই  
ভারতের দেশীয় লোকে ভারতে বে সজীবন অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার  
অতিশয় আগ্রহবান। এক কণা লাভের জন্ত ভারতবর্ষভূত প্রদেশ-

নিবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী কিরূপ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে,  
তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? অতএব আমাদের কাছে ভারতের বাহিরে  
বাইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা বাহা কিছু  
দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্যরাজ্যের অপূর্ব তত্ত্ব-  
সমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করি। সকল  
বিষয়ে আমাদের শিক্ষা হইলে চলিবে না, কোন কোন বিষয়ে আমাদের শিক্ষা  
গুরুত্ব হইতে হইবে। সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখন বজুত্ব হয় না। আমরা  
বখন এক জাতি সর্ব বিষয়েই শিক্ষক ও অপর জাতি সর্বদাই তাহাদের  
পদতলে বসিয়া শিক্ষা লইতে উদ্বৃত্ত, তখন উভয়ের মধ্যে কখন সমান সমান  
ভাব আসিতে পারে না। যদি তোমাদের ইংরাজ বা মার্কিনগণের সহিত  
সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিক্ষিত  
হইবে, তেমন শিক্ষাইতেও হইবে। আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া  
জগৎকে শিক্ষাইবার জিনিষ তোমাদের মধ্যেই আছে। তাহাই একণে  
করিতে হইবে।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বলিতে হইবে। আমাদের বান্ধালি জাতিকে লোকে  
কল্পনাপ্রিয়, ভাবুক ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে; আমি উহা বিশ্বাস করি।

আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি  
'ভাবুক' বান্ধালী জাতিই  
সমগ্র জগতে ধর্মপ্রচার  
কার্যের উপযুক্ত।  
আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি  
বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু বজুগণ!  
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের

বিষয় নয়, কারণ, হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে  
তত্ত্বালোকের ক্ষুরণ হয়। বুদ্ধিরাগ, বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিষ হইতে  
পারে; কিন্তু উহা বেশি দূর বাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই  
পতীরতম রহস্তসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বান্ধালির দ্বারা, ভাবুক বান্ধালি  
দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে।

‘উজ্জ্বল জাগ্রত প্রাণ্য বরাগ্নিবোধত’—উঠ, জাগ বতদিন না অসিত  
বন্ধ লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তরুদেগ্রে চলিতে কান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ জাগ, কারণ, শুভ  
কলিকাতাবাসী যুবকগণ, মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এখনই আমাদের সকল বিষয়ে  
উঠো। সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর,

ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে ‘অতী’ এই বিশেষণ  
প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদেরিগকে—‘অতী’, নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই  
আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি  
এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত  
হইবে। “যুবা, আশিষ্ট, দ্রিষ্ট, বলিষ্ট, মেধাবী—তাহাদিগের দ্বারা এই  
কার্য্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবা রহিয়াছেন।  
তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে  
ইহাও অরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য ছিলাম—আমিও  
এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম।  
যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক  
কার্য্য করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।  
ভারতের অজ্ঞাত স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার  
মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে  
হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ! হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি  
জালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না, তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বঙ্গোদীন; কে কোথায়  
দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল অর্থ উপার্জন করি-

য়াছে জগতের যা কিছু উন্নতি সব, মানুষের শক্তিতে  
হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের  
শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে বাহারা সেই  
পরম সুন্দর কঠোপনিষদ্ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের  
সকলের অরণ আছে,—সেই রাজা এক মহাবক্তের  
অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাশ্রুপে ভাল ভাল অর্থ গবাদি

প্রদান না করিয়া অতি বৃদ্ধ; কার্য্যের অনুপযুক্ত অর্থগবাদি প্রদান করিতে-  
ছিলেন। ঐ উপনিষদে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহার পুত্র নটিকেভার

দ্বন্দ্বেরে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই শ্রদ্ধা শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করি। বলিব না ; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ণ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন ; এই শ্রদ্ধার প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি-শয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ।

শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের

মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি আমিও কিছু কার্য্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্তার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যু-তত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন। যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্তার মীমাংসার আর উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হৃত হইয়াছে ; তজ্জগুই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই শ্রদ্ধাব তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার অভাবেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বল হইবে আর ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা তাহাদেব শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মা, যাহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, তাহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে ; কেবল উহাকে উদ্ধুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, এখানেই অগ্ন্যস্ত্র দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, আত্মায় মধ্যেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত ; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব এই শ্রদ্ধাই আমি চাই। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক—এই

আমি বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস উপার্জন করারূপ মহান্ কাহ্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে ত্রয়ানক এক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাভীর্থ্যের অভাব—এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর বাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যেরও অন্তিম

আমি যে কার্যের সূচনামাত্র  
করিয়াছি, বঙ্গীয় যুবক-  
গণকে তাহা সম্পাদন  
করিতে হইবে।

লুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের

মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত

গ্রহণ করিবে এবং এই কার্যের এতদূর উন্নতি ও

বিস্তার সাধন করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা

কখন ভাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি

বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর। বঙ্গীয় যুবক-

গণের স্বক্কে অতি গুরুত্বের সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবক-

দের উপর এত গুরুত্বের পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর

ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার

হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে,

বাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই সদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর

হইতেই শত শত বীর উঠিবে, বাহার। আমাদের পুরুষগণের প্রচারিত

জনসাধারণের মধ্য  
হইতেই মহাপুরুষ  
জন্মিয়া থাকেন।

সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও

শিক্ষা দিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—

এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে।

তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে। অতএব

একবার আর তোমাদিগকে সেই মহা নীতি— উদ্ভিষ্ট জাগ্রত প্রাণ্য বরান্

নিবোধিত” স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইওনা,

কারণ, মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে,

সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ

জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে হইতে আর ইতিহাসে একবার

বাহা ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। কোন কিছুতেই ভয় পাইও না।

গোমরা অতুচ্ছ বস্তুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেট মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার নির্ভাঁক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব "উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্তু আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কেবল আপনাদিগকে ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা—আমার প্রবল আত্মিক ইচ্ছা এই, বাহাতে আমি জগতের, সর্ব্বোপরি, আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের বৎসামাত্ত সেবায় পর্য্যন্ত লাগিতে পারি।

স্বামীজি কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে আর একটা বক্তৃতা করেন। উহার সমগ্রটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

### সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত ।

দূরে, অতি দূরে, বথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি, কিঞ্চদত্তীর ক্রীণ রশ্মিজাল পর্য্যন্ত প্রবেশে অসমর্থ—অনন্তকাল ধরিয়া স্থিরভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে, বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে বেদান্তের নীরব প্রতাপ। কখন কিছু নিম্প্রভ কখন অত্যাঙ্কুল কিন্তু চিরকাল অনির্ব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয় সমগ্র চিন্তাজগতে উহার পবিত্র রশ্মি—নীরব অনন্তভাব্য শাস্ত অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি—বিকীরণ করিতেছে: উষাকালীন শিশিরসম্পাতের স্তায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে। এ সেই উপনিষদের তত্ত্বরশ্মি, এ সেই বেদান্ত দর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। অনুমানবলে এ ভাবাবিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ নির্দিষ্ট সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের বাহ্য

কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই বেদান্ত-সমুদ্র হইতে তরঙ্গরাশি উখিত হইয়া কখন পূর্বে কখন পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্তিয়কে বাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তাগতি নিয়মিত করিয়াছে।

সাম্বাদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। আর সাম্ব্য ও ভারতীয় অন্ত্য সকল ধর্ম বা দার্শনিক

বেদান্তই হিন্দুধর্মের  
অন্তর্গত সকল সম্প্র-  
দায়ের ভিত্তি।

মতই উপনিষদ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের

উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বা আধুনিক কালে

ভারতে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্তমান থাকিলেও

ইহাদের সকলেরই মূল ভিত্তি উপনিষদ বা বেদান্ত।

ভূমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদী হও বা অন্য যে কোন বাদী হও, তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই মতকে 'সনাতন' মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আর, জৈন বৌদ্ধগণ পর্যন্ত, উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান। আর আমরা সাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, এই অনন্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহান অশ্বখরক্ষপ্রায় হিন্দুধর্ম, বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অমুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরা আমাদের বেদান্তেরই উপাসক; আর হিন্দু বলিলেই বেদান্তী বুঝাইয়া থাকে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় প্রোত্ববর্ণের সমক্ষে বেদান্তপ্রচার যেন আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু ইহাই এক মাত্র প্রচারের বস্তু।

ভারতে বেদান্তপ্রচার ঘাই  
সকল সম্প্রদায়ের সম্মুখ  
হইবে।

বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক

হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে

এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই

উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত কিন্তু

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই।

অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্যন্ত উপনিষৎসমূহের মধ্যে যে



অপূর্ব সময় রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মূনিগণ পরস্পর পরস্পর মতভেদ হেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক সময়ে এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, একসময়ে ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, বাহার মত অপর হইতে কিছু পৃথক নহে, সে মূনিই নহে। “নাস্যো মূনির্বাণ্য মতং ন ভিন্নং।” কিন্তু এখন গুরুপ বিরোধে আর চলিবে না। এখন উপনিষদ্ মন্ত্রসমূহের মধ্যে গুরুরূপে যে সমুদয় ভাব বিদ্যমান, সেই সময় ভাবের উচ্চমরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দৈতবাদী, বিশিষ্টাদৈতবাদী, অদৈতবাদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় মধ্যে যে সময় রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতে নয় সমগ্র জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ভাব বিদ্যমান, তাহা দেখাইতে হইবে।

আর আমি ঈশ্বররূপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, বাহার সময় জীবনই যেন মহা সময়রূপ ছিল।

মাহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন যেন সহজপথে  
সময়সার্থ্য মনীর গুরু উপনিষদ্‌মন্ত্রের জীবন্ত বিকাশরূপ। উপনিষদের  
ঈশ্বরাকৃতিদেব। ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে যেন মানবরূপ ধরিয়া প্রকাশ

হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কি না, কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায় সমুদয় যে পরস্পর বিরোধী নহে, উহার যে পরস্পর সাপেক্ষ, একটী যেন অপরটির চরম পরিণতি স্বরূপ, একটী যেন অপরটির সোপানস্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদৈত তত্ত্বমসিতে পর্য্যবসান, ইহা দেখানই আমার জীবনব্রত।

এমন সময় ছিল, যখন ভারতে কর্মকাণ্ড প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের

বর্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্তনা ঐ বৈদিক  
বৈদিক অপেক্ষা বৈদান্তিক কর্মকাণ্ডসূত্রে নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু  
নামস্ত হিন্দুর অধিক- তথাপি বেদের কর্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায়  
তর উপযোগী। অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুশাসন

অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়মিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন

কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসমীক্ষণ আধিকাংশ স্থলে তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী। অতএব বৈদান্তিক কল্পকাণ্ডের অনুবর্তী এই অর্থে আমাদের বৈদিক নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দু নামে বাহ্যিক পরিচিত, তাহাদিগকে বৈদান্তিক আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি তোমাদিগকে পূর্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে।

বর্তমান কালে ভারতে যে সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের  
মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ—  
দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী।

পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদায়

যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন

এবং তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধদ্বৈত,

বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে

চান, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। মোটের উপর উহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী না হয় অদ্বৈতবাদী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়।

আরও, আধুনিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কতকগুলি নূতন, অপরগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে পূর্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শঙ্করাচার্য্যকে অপর শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রামানুজ অনতিপ্রাচীন ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অত্যান্ত দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার সমুদয় উপদেশের সারাংশ, এমন কি, সম্প্রদায়ের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত ভারতের অত্যান্ত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইবে, উহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধন প্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে।

অত্যান্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে দক্ষিণাত্যের আচার্য্যগণের মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের মত ইহাঙ্গলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটি সম্প্রদায় আছে। যথা,—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী

সিংহহে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ বিষ্ণু নামের পরিবর্তে শিব নাম বসাইয়াছে মাত্র আর জীবাত্মার পরিমাণ বিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অত্যাশ্চর্য সর্ব বিষয়েই রামানুজমতাবলম্বী। রামানুজের মতানু-বর্ত্তিগণ আত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাকে বিড়ু অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈত-মতানুবর্ত্তী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অনেকগুলি ছিল। এরূপ অসংখ্য করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্যে শঙ্করেরই উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় ; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, যাহারা এই মায়াবাদ বিশ্বাস করিত না ; এমন কি, তাহারা শঙ্করকে ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া তিনি বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন। যাহাই হউক, বঙ-মাশকালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী আর শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আমাদের বাঙ্গালা-দেশে এবং কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বড় বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্বাতন্ত্র্যগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটি কেন্দ্র বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অনেকস্থলে ইহার প্রভাব বড় কম নহে।

এক্ষণে আর একটি কথা বুক্তিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ কেহই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন শঙ্কর বা রামানুজ কেহই নাই। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বোধা-নূতন তত্ত্বের আবি-য়নের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই কারক নহেন। বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘ভগবদ্বোধায়ন-

কৃত্যং বিস্তীর্ণং ব্রহ্মতত্ত্ববৃত্তিঃ পূর্বাচার্য্যাঃ সংচিন্তিপুং তদনুভূতানুসারেণ তত্ত্বা-করাণি ব্যাখ্যাত্তন্তে’ ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই আমরা

দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আশি সমগ্র ভারতে ইহার অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়ন ভাষ্য ব্যতীত অল্প কোন ভাষ্য মানিতেন না; আর যদিও তিনি সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই কিন্তু তিনিও কখন বোধায়নভাষ্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষার বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্য্যন্ত লইয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও যে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন, এইরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার ভাষ্যের কয়েকস্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু, তিনি যে মতাবলম্বী সেই অদ্বৈতমতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন, বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশে অধিক অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন জিনিষ প্রচার করেন নাই। রামানুজ যেরূপ বোধায়ন-ভাষ্য অবলম্বনে তদীয় ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্য রচনায় তদ্রূপ করিতেছেন; তবে কোন ভাষ্য অবলম্বনে তিনি উহা করিতেছেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

তোমরা এই যে সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, উপনিষদে তাহাদের সকল গুলিবই ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই

উপনিষদ ভারতীয় দর্শন-  
সমূহের ভিত্তি।

দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অজ্ঞাত দর্শনসমূহ উপনিষদ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু

ব্যাসপ্রণীত বেদান্তদর্শনের জ্ঞান আর কোন দর্শনই ভারতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্য দর্শনের চরম পরিণতি মাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনন্তক ও দার্শনিক বিষয়ে ভারতেতিহাসে কপিলের মত বড় লোক জন্মান নাই। জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন

সুপরিচিত দার্শনিক মত বিস্তারিত, সেখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্রবর্ষ প্রাচীন হইতে পারে তথাপি তদ্ব্যয় সেই কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমাময় অপূৰ্ণ প্রতিভাসম্পন্ন কপিলের—প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও তাঁহার দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের নিজ বঙ্গদেশে আমাদের নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দার্শনিক জগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি গুরুতর পারিভাষিক শব্দনিচয় (যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমর্থ জীবন কাটিয়া যায়) লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদাস্তিকদিগের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা জায় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের বিচারপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার জায় মালাবার দেশের কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই ত গেল অজ্ঞাত দর্শনের কথা। ব্যাস-প্রণীত বেদান্ত দর্শন কিন্তু ভারতে সর্বত্র দৃঢ় প্রতিষ্ঠা আর উহার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিরত করা, তাহা সাধন করিয়া উহা ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই বেদান্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে, আর শঙ্করাচার্য্য যেমন একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার হৃদয় প্রশংসনের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক হৃদয়যোগে গাঁথিয়া একটা মালা প্রস্তুত করা মাত্র। তাঁহার হৃদয়গুলির প্রামাণ্য ততটুকু, বতটুকু তাহারা উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে ; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে এই ব্যাসহৃত্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এখানে যে কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাসহৃত্ত।

ব্যাসহৃত্তের একটী নূতন ভাষা জিহিয়া সম্প্রদায় পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষাকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতবৈধ দেখা যায়। সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক সেই ব্যাসহৃত্ত এক্ষণে ভারতে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থের আসন

প্রণয় করিয়াছে আর ব্যাসস্বত্রের উপর একটি নূতন ভাষ্য না লিখিলে ভারতে কেহই সম্প্রদায় স্থাপনের আশা করিতে পারে না ।

ব্যাসস্বত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য । শঙ্করাচার্য্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন । এই মহাপুরুষ তাঁহার মহান্ জীবনে যে সকল বড় বড় কাষ করিয়া-  
গীতা ।

ছিলেন, তন্মধ্যে গীতা প্রচার ও গীতার অতি সুন্দর একটি ভাষ্য প্রণয়ন অগ্রতম । আর ভারতের সনাতনপন্থাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই তাঁহার অনুসরণ করিয়া গীতার এক একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন ।

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক । কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন । উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই আধুনিক । যথা আল্লোপনিষদ্ । উহাতে উপনিষদের সংখ্যা—প্রামাণিক আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে রজসুন্না বলা ও অপ্রামাণিক উপনিষদ্ হইয়াছে । গুনিয়াছি, ইহা নাকি আবুকের রাজত্ব কালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য রচিত হইয়াছে । সংহিতা ভাগে আল্লা বা ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবসন্ধানে এইরূপ উপনিষদ্ সমূহ রচিত হইয়াছে । এই রূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ রজসুন্না হইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য বাহাই হউক । এই জাতীয় আরও অনেক গুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে । স্পষ্টই বোধ হয়, উহার সম্পূর্ণ আধুনিক আর এইরূপ উপনিষদ্ রচনা বড় কঠিনও ছিল না । কারণ, বেদের সংহিতা ভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, উহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না ! কয়েক বৎসর পূর্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত পাণিনি ও মহাভাষ্য পড়িতে আরম্ভ করি । কিন্তু কিয়দূর পাঠে অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম মাত্র । ব্যাকরণে একটি সাধারণ বিধি করা হইল, তার পরেই বলা হইল, বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে । সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, যে কোন ব্যক্তি বাহা কিছু লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে । কেবল ষাটের নিরুক্ত থাকতেই একটু রক্ষা । কিন্তু ইহাতে কতকগুলি একা-

ধ্বংস শব্দরাশির সন্নিবেশ আছে যাত্র। যেখানে এতগুলি সুবোধ, সেখানে তোমার বস ইচ্ছা খুঁসি উপনিষদ্ রচনা করিতে পার। একটু সংস্কৃত জ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গুটিকত শব্দ তৈয়ারী করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের ত আর কোন ভয় নাই, তখন রজস্বলাই হউক বা যে কোন স্নলাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পার। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে আর গুনিয়াছি, এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষদ্ রচনা হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃই খাঁটি জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। শব্দর, রামানুজ ও অজ্ঞান বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেই গুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের দুই একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদ্ সমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র সূতরাং আমার ত্রায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও উহার সকল তত্ত্ব বলিতে উপনিষদ্ অপূর্ণ কাব্য স্বরূপ গেলে বছরবছর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। প্রথমতঃ, জগতে ইহার ত্রায় অপূর্ণ কাব্য আর নাই। বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ণ কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু উপনিষদের কবিত্ব আর এক ধরনের। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদ সংহিতার নাসদীয় স্তকের বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রায়ের গভীর অন্ধকারবর্ণনায় এক সেই শ্লোক আছে—“তম আসীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রে” ইত্যাদি। “যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।” এটি পড়িলেই অনুভব হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ণ গাভীর্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারতবহির্ভূত প্রদেশে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও গভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতবহির্ভূত প্রদেশে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাবের বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বপক্ষসহায়ে আপনায় বহির্দেশে সূদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ

আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেঙ্গ-  
সংহিতার এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার বৈকল্প অপরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়া  
পাঠকবর্গের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে, আর কোথাও এরূপ দেখিতে পাইবে  
না। সংহিতার এই “তম আসীৎ তমসা গৃঢ়ং” বাক্যটী স্বরণ রাখিয়া তিন জন  
বিভিন্ন কবির অঙ্ককারের বর্ণনার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের  
কালিদাস বলিয়াছেন, “সুচীবৈধ্য অঙ্ককার”, মিল্টন বলিতেছেন, “আলোক নাই,  
কুশ্মান অঙ্ককার।” কিন্তু এখানে সংহিতাকার কি বলিতেছেন? সংহিতাকার  
বলিতেছেন, “অঙ্ককার অঙ্ককারের দ্বারা আবৃত, অঙ্ককারের মধ্যে অঙ্ককার  
লুকায়িত।” গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। বধন  
হঠাৎ নূতন বর্ণাগম হয়, তখন সমস্ত দিগন্ত অঙ্ককারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং  
সঞ্চরণীল শ্রাম জলদজাল ক্রমশঃ অস্ত্র জলদজালকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে।  
বাহা হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ণ বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃ-  
প্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ বলে  
মানবজীবনের মহান সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও  
টিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় যেমন  
জীবনসমস্যা এবং জগৎকারণীভূত বস্তু সম্বন্ধীয় পারমাণবিক তত্ত্বসমাধান  
মাননে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণও  
তাহাই করিয়াছিলেন আর ইউরোপীয়গণের ত্যায় তাঁহারাও বিফলমনোরথ  
হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়ে আর কিছু চেষ্টা করিল না :  
যেখানে ছিল, সেখানাই পড়িয়া রহিল। বহিঃগতে জীবন মরণের  
মহা সমস্যা সমূহের সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাহারা  
আর অগ্রসর হইল না ; আমাদের পূর্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়া-  
ছিলেন কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতা জগ-  
তের সমক্ষে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন। উপনিষদ্ নির্ভীকভাবে  
বলিলেন ;—

“বতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।”

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি।”

“মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া বথা হইতে ফিরিয়া আসে।”

“সেখানে চক্ষুও বাইতে পারে না, শব্দও বাইতে পারে না।”

এইরূপ ও অনুরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা সমাধানে



ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির উপর পড়িলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার জন্ত তাঁহাদের নিজ আত্মা সমীপে গমন করিলেন, তাঁহারা অন্তর্মুখী হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন আশাবাশীলতায় না, স্মরণে তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া সেই জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন—তথায় তাঁহারা উত্তর পাইলেন।

‘তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানং অন্যান্যবাচো বিমুক্তং’

আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর। তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্তার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের

উপনিষদে সগুণসমস্যার  
সমাধান বহিঃপ্রকৃতি হইতে  
নহে, অন্তর্জগতের বিশেষণে,  
'নেতি' 'নেতি' বিচারে।

আলোচনা করিয়াই বিবেচনায় "পরমাত্মাকে এবং  
জীবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি  
আমাদের কর্তব্য এবং এতদবলম্বনে আমাদের  
পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এই সমুদয় অবগত হইলেন।

আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার ত্রায় জগতের  
মধ্যে গাভীরূপ কবিতা আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে  
চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না। এমন কি, তাঁহারা আত্মার  
বর্ণনায় নির্দিষ্টগুণবাচক শব্দ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন  
আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্ত ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লাভের চেষ্টা রহিল না।  
বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা  
লোপ পাইল; তৎপরিবর্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে,  
সেই শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেরেই যেন আমাদের কাছে এক নূর অতীন্দ্রিয়  
রাস্তা অগ্রসর করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপনিষদের সেই অপূর্ণ শ্লোকটির  
কথা স্মরণ কর।

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং

নেমা বিদ্যাতে তাস্মি কুতোহম্ময়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং

অন্ত ভাসা সর্ববিদং বিভাতি ॥”

জগতে আর কোন কবিতা ইহাশেক্ষ্য গভীরতাবদ্যোতক ?

“তথায় সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারাগ নহে, এই বিদ্যায় তাহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই মর্ত্য অগ্নির আর কথা কি ?” এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ণ কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটী কি অপূর্ণ ও সর্লভসুন্দর ! ইহাতে কি অপূর্ণ শিল্পকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে ! ইহার আরম্ভই অপূর্ণ ! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে প্রকার আবির্ভাব, তাহার যমসদনে গমনেচ্ছা আর সেই ‘আশ্চর্য্য’ তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্মমৃত্যুরহস্যের উপদেশ দিতেছেন ! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে ?—মৃত্যুরহস্য ।

উপনিষদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা বাহাতে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—উহার কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও

উপনিষদের উপদেশ ব্যক্তি-  
বিশেষের জীবনের উপর  
নির্ভর করে না।

আমরা উহাতে অনেক আচার্য্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি বটে ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে না। একটী মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও জীবনের

উপর নির্ভর করে না। এই সকল আচার্য্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্তির জায় রক্তমঞ্চের পশ্চাভাগে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সভা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না ; কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ণ মহিমাময়, জ্যোতির্ময়, তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশ জন বাজবল্য আশ্রুক বাক্ কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি ত রহিয়াছে। তথাপি ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীন কালে যে কোন মহাপুরুষ বা আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে। উপনিষদ্ অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার সপক্ষ। অপরদিকে আবার উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

কিন্তু উহা ব্যক্তিবিশেষের  
উপাসনার বিরোধী নহে।

উপনিষদের ঈশ্বর যেমন নিগূর্ণ অর্থাৎ ব্যক্তি-  
বিশেষ ঈশ্বরের অতীত তত্ত্বমাত্রেরই বিশেষভাবে  
সমর্থক, তদ্রূপ সমগ্র উপনিষদই ব্যক্তিনিরপেক্ষতা-

রূপ অপূর্ণ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানী, চিজ্ঞানী, দার্শনিক ও

বুদ্ধিবাগিন উহা হইতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্বমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন আর তাহাতে আধুনিক নৈজ্ঞানিকেরও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টীয়ানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানগণের পক্ষে যেমন কোরাণ,

উপনিষদই আমাদের প্রামাণ্য বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পার্শীদের যেমন জৈন-বেস্তা, আমাদের পক্ষেও সেইরূপ উপনিষদ। এই গুলিই আমাদের শাস্ত্র, অপর কিছু নহে। পুরাণ, উপনিষদ প্রমাণের অধীন।

তন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ, এমন কি ব্যাসহৃত্ত পর্যন্ত প্রামাণ্য বিষয়ে গোণ মাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ বেদ। মছাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি যতটুকু উপনিষদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণকে নির্দয় ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে এই বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কিন্তু ভারতের দুর্দৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমান কালে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সামান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এক্ষণে উপনিষদের উপদেশের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালার কোন ক্ষুদ্র পল্লীগামে হয়ত কোন বিশেষ আচার ও মত প্রচলিত, সেইটাই যেন বেদবাক্য, এমন কি, তাহা হইতেও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর “সনাতনমতাবলম্বী” এই কথাটির কি অদ্ভুত প্রভাব! একজন গ্রাম্যালোকের নিকট কৰ্মকাণ্ডের সমুদয় বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি একটিও বাদ না দিয়া যে পালন কবে, সেই খাঁটি সনাতন-পথাবলম্বী, আর যে না করে, সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃভূমিতে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতানুসারে চলিতে উপদেশ দেন। যে না চলে, সে তাঁহার মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইট স্মরণ করা বিশেষ আবশ্যিক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ ও শ্রৌত সূত্র পর্যন্ত বেদ প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা খুসি তাই বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ বা অন্ত্যস্ত শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে শাস্ত্র আখ্যা না দিয়া পুরাণ বলাই উচিত। কারণ উহাতে জলপ্লাবনের ইতিহাস, রাজা

ও রাজবংশীয়গণের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি ত পুরাণের লক্ষণ, সুতরাং যতটা বেদের সহিত মেলে, উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে অনেক নীতি উপদেশ আছে সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টীয়ান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়ছিল,

বেদের ঐতিহাসিকতাই তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর উহার সত্যতার প্রমাণ।

দিয়াছিলাম, আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বলিয়া উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের নহে। আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতাই হার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সন্ধিত অন্ত্যান্ত শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

এক্ষণে আমরা উপনিষদে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাণের শোক দেখা যায়। কোন কোনটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, কোন কোনটি বা অদ্বৈতবাদাত্মক। কতকগুলি বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও উপনিষদ সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি বলিয়া প্রধান প্রধান বিষয়ে উপনিষদের মুখ্য মতবাদসমূহ।

তাহারা একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে সকলে একমত। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়ের একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, তৎপশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন। জীবাশ্ম সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে এইটী বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাশ্ম কিছু প্রভেদ করা হয় নাই কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞান মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাশ্মের হস্তে বদ্ধস্বরূপ। ঐ বদ্ধ সাহায্যে উহা শরীর অথবা বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। আরও সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাশ্ম অনাদি অনন্ত। ৩৩দিন না সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতেছেন, ততদিন তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম হয়।

আর একটি মুখ্য বিষয়ে সকলেরই একমত আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ যে, তাঁহারা জীবাত্মাতে পূর্ণ হইতেই সকল শক্তি অঙ্কিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনস্পিরেশন (Inspiration) শব্দ দ্বারা ইংরাজীতে যে ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বুঝায়, কোন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই বিদ্যমান আত্মাতে পূর্ণ হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত।

সর্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগীনা তোমাকে বলিষ্মেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি বাহা তিনি লাভ করিতে চাহেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, তাহাণা পূর্ণ হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্য্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধারের অপুটতা হেতু উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উৎকৃষ্টতর শরীর পাইলেই সেট শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে কিন্তু উহারা পূর্ণ হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার সূত্রের এক শ্লে বলিয়াছেন, “নিমিত্তম-প্রয়োজকং প্রকৃतीনাং বরণভেদস্য ততঃ ক্ষেদ্রিকবৎ”। যেমন কৃষককে তাহার ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কেবল তাহাকে তাহার ক্ষেত্রের আল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিকটস্থ জনপ্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন তাহার নিজ বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ণ হইতেই বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ

এই ভয়ানক মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা পাশ্চাত্যমত উহার সম্পূর্ণ সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা একগ ভয়াবহ বিপরীত—‘আমরা জন্মপাপী’।

মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারেনা, তাহাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ইহা ভাবিয়া দেখে না, যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ প্রকৃতি কখন পরিবর্তিত হইতে পারেনা। প্রকৃতির পরিবর্তন এই বাক্যটাই স্ববিরোধী। যাহার পরিবর্তন হয়, তাহাকে আর প্রকৃতি বলা যায়

না। এই বিষয়টী আখ্যায়িকাকে অরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দৈতবাদী, অদৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদীরা সগুণ, কেবল সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমি এই সগুণ কথাটী তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই

সগুণ বলিতে দেহধারী সিংহাসনোপবিষ্ট জগৎ-ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের শাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। সগুণ ঈশ্বরধারণা বিভিন্ন হইলেও অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আন সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, স্রষ্টা, পাতা ও সংহতা স্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উহাকে সগুণ-নিগুণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর অদৈতবাদী তাঁহার প্রতি সৎ চিত্ত আনন্দ বাতীত অতীত কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন। শঙ্কর ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু উণনিষদ্ সমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, নেতি, নেতি অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে একমতালম্বী।

এক্ষণে দ্বৈতবাদীদের মত একটু আলোচনা করিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমি রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের বর্তমান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের লোক ভারতের

অজ্ঞাত দেশের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ সম্বন্ধে রামানুজের মত।

অতি অল্পই সংবাদ রাখেন; আর সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের চৈতন্য ব্যতীত সকল বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। আর দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। কারণ চৈতন্যও দাক্ষিণাত্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ ভুক্ত (মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়) ছিলেন। যাহা হউক রামানুজের মতে নিত্য পরার্থ ত্রিনী—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়প্রপঞ্চ। জীবাত্মা সকল নিত্য

আর নিত্যকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকালই পৃথক থাকিবে। আর এই জড় প্রপঞ্চ—এই প্রকৃতিও চিরকালই পৃথকরূপে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জড়প্রপঞ্চও তদ্রূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্গামী আর এই অর্থে রামানুজ স্থানে স্থানে পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মা সকলও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন তদ্রূপভাবে অবস্থান করে। পরকালের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে কোন কার্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতার সঙ্কোচ হয়, তাহাই অসৎ কন্ম আর যাঁহার দ্বারা উহার বিকাশ হয়, তাহাই সৎকার্য্য। যাহাতে আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, তাহাই ভাল আর যাহাতে উহার সঙ্কোচের সহায়তা করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে আত্মার কখন সঙ্কোচ কখন বিকাশ হইতেছে, অবশেষে ঈশ্বর-রূপায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব আর ঐ ভগবৎরূপা লাভের জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারা ই উহা লাভ করে।

শ্রুতিতে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, “আহারশুদ্ধৌ সহশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্থিতিঃ” যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয় আর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্থিতি অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্থিতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটী রামানুজ ও আহারশুদ্ধি। লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহা বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—এই সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি। আমরা জানি, সাংখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্মিত হইয়াছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, ঐ তিনটী গুণ কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ হইলে এই সত্ত্ব পদার্থ নিম্নলিখিত হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করাই বেদান্তের এক মাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশ স্বভাব আর যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তদ্রূপ আত্মাচৈতন্যও সহজেই

সব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ গিয়া কেবল সব দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিগত প্রকাশিত হইবে; অতএব এই সব লাভ করা অত্যাশঙ্কক। আর শ্রুতি এই সব লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন, “আহার শুদ্ধ হইলে সব শুদ্ধ হয়।” রামানুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন আর ইহা তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বনসূত্র স্বরূপ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার শব্দের অর্থ কি, এইটা আমাদেরকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কাবণ রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অত্যাশঙ্কক বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জাতিদোষ। অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে। যে গুলি স্বভাবতঃই অশুদ্ধ যথা পৈয়াজ রসুন প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়দোষ—যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাত্মা নিজে দেখিয়াছি, যাহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, তাঁহাদের এ ক্ষমতা ছিল; তাহারা যে ব্যক্তি খাদ্য আনিয়াছে, এমন কি, যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন আর আমি নিজ জীবনে একবার নয় শত শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ—খাদ্যদ্রব্যে কেশ কীট আবর্জনা দি কিছু পড়িলে তাহাকে নিমিত্তদোষ বলে। আমাদেরকে এক্ষণে এই শেষ দোষটী নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দোষটী বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষনিম্মুক্ত খাদ্য আহার করিগে পারিলে সবশুদ্ধি হইবে।

তবে ত ধন্যটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিগত খাদ্য খাইলেই ধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই তা ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্দল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না

শক্তি ও আহারশুদ্ধি।

পারে? অতএব শঙ্করাচার্য্য এই আহার শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারূপি আহৃত হয়।



উহা নির্মল হইলে সব নির্মল হইবে, তাহার পূর্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা পাইতে পার। যদি কেবল পবিত্র ভোজনের দ্বারা সব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মন্ত যোগী হয় কি না। একরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

নিত নহেনসে হরি মিলে ত জলজন্তু হই

ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাঁদর হই

তিরণ ভখনকে হরি মিলেত বহু হয়ে হয় অজ্ঞা

ইত্যাদি।—

বাণ হউক এই সমস্তার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য, শররাচার্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিগুহ ভোজনে বিগুহ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়ই চাই।

সামঞ্জস্য।

তবে গোল এই টুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমানকালে আমরা শঙ্করাচার্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল ‘খাদ্য’ অর্থটী লইয়াছি। এই কারণেই যখন আমি বলি, ধর্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি তোমরা আমার সহিত মাল্লাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা বাঙ্গালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মাল্লাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবারদাবার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা ইহাও দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতেই বাঁচাইলেই শোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে—মাল্লাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ কিন্তু তাহারা তাহা নহে। অবশ্য, আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মাল্লাজী বস্তু রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অংশ স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও “উন্টা সমঝলি রাম” করিও না। আজ কাল

এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব বর্ণাশ্রম ধর্ম।

গোল উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙ্গালীরাই সর্বাধিক অধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই

জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জান বল দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্ল্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি ত চাতুর্ল্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, ‘ম’থা নেই তার মাথা ব্যথা,’ এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও তজপ। এখানে ত চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায় এবং হিন্দুধর্মের নিয়মালুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিতে আদেশ না করেন? আর যদি এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রালুসারে যে দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস কবা উচিত নয় অতএব তোমাদের এখনই তল্লিতাল্লা ঝাধিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা স্নেচ্ছ খাদ্য আহার করে ও স্নেচ্ছরাজ্যে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন; তাণ কি তোমরা জান? তোমরা ত বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহা করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুযানল। তোমরা অচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কার্য্যে কেন কপটাচারী হও? যদি তোমরা তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেন্ট-ব্রাহ্মণবর্ষ্যের মত হও; যিনি আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সহিত গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন ও স্নেচ্ছ খাদ্য ভোজনের জন্ত পরে তুযানল করিয়াছিলেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্র জাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে যাও! আর যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ওরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সক্ষম নহ, তবে তোমাদের দুর্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্বলতা ক্ষমা কর, অত্যাচার জাতির উন্নতির যতদূর পার সহায়তা কর। তাহাদিগকে বেদ পাড়িতে দাও। ক্ষণতের অত্যাচার স্থানের আর্থ্যগণের মত সং আর্থ্য হও। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রকৃত আর্থ্য হও।

যে জঘন্য রামাচার তোমাদের দেশকে নাশ করিয়া ফেলিতেছে, উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অত্যাচার স্থান বিশেষ ভাবে দেখ নাই। যখন আমি আমার স্বদেশে প্রবেশ করি, উহার পূর্বসন্ধিত

জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমরা দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার বামাচার।

সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্রন্থ সকল তাহাদের কার্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বীভৎস কার্য সকল করিয়া থাকে! বাঙ্গলা দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা জ্ঞান। বামাচার তত্ত্ব সকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র। এই তত্ত্ব সকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে। হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সাহুবাদ বামাচার তত্ত্বরূপ ভয়ানক জিনিষ তোমাদের পুত্র-কন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐ গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে? যদি হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা—পড়িতে দাও।

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাশ্মা সকল চিরকাল জীবাশ্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ; তিনি পূর্ণ হইতেই অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই, তিনি আপনা হইতেই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীদের মত।

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে  
সৃষ্টিতত্ত্ব।

কতকগুলি অবিভক্ত দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে; তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর নিজ হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির-পৃথক্। আর সকলই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উপাদান করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্ত্তাব পরিভাগ করিয়া অনন্ত প্রাপ্ত হইয়া নিরঞ্জন লাভ করিবেন। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্তমান ভারতে যে এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়

দেখিতে পাও, তাহারা সকলই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়া-বশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা বিশেষ কঠিন। এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্তার বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কান্তের দর্শনে কতকটা সূক্ষ্ম মত দেখিতে পাইবে।

তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের লেখা পড়িয়াছে, তাহা-দিগকে একটা বিষয়ে সার্বধান করিয়া দিতেই হইবে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কান্তই প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার প্রথম আবিষ্কর্তা। তিনি দেশকালনিমিত্তকে মায়া-র সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শঙ্করভাষ্যের ভিতর আমি এই ভাবের দুই একটা স্থল দেখিতে পাইয়া বহুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কান্তের পূর্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈত বেদান্তীদিগের এই মায়াবাদ মতটী একটু অপূর্ণ ধরনের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, ভেদ এই মায়া-প্রসূত।

এই একত্ব, এই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আর এখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরবন্দন।

সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই ত্যাগ বা বৈরাগ্য—  
সবই মায়া।  
মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া যদি ক্ষমতা থাকে ত তাহা-  
দিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছে।

জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে, সমুদয়ই ভ্রান্তিবিজৃঙ্ঘণ, মায়া মাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রের ভোজন কর; মহারাজচক্রবর্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা

অতি দরিদ্র ভিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে! তাহারা যতদূর সাধ্য, সেই ক্ষমতার পরিচালন করিয়াছে; যতদূর সাধ্য, ভোগ করিয়াছে—কিন্তু পর যুদ্ধভেই তাহারা মরিয়াছে। আমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিচার সন্তানগণের পরমাণুঃ অতি অল্প।

এখানে আবার আর একটা বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক জ্ঞান দার্শনিকগণের মতের স্তায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে বীজাবস্থায়ই নষ্ট করা হইয়াছিল, উহার অঙ্কুর উদগত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া উহার অমঙ্গলময়ী শাখাপ্রশাখাকে

আমাদের এই মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা কুজ্‌খটিকাময় বিণ্ডুলভাবাপন্ন আর সাকার ব্যাপ্তি উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা, সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে কাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কল্পজালে আবৃত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণ বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাই-তেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন ইন্ড্রিয়ের বিষয় সন্যোগ করিতেছি!

অপর দিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তের

আপনাকে ব্যক্ত করিতে রূখা চেষ্টা মাত্র। এই

বৈরাগ্যতত্ত্ব।

জগতের সর্বশক্তিমান কারণ স্বরূপ তুমি, তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র মৃৎ-পদ্বলে প্রতিবিম্বিত করিবার রূখা চেষ্টা করিতেছ! কিছু দিনের জন্ত ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে

আসিয়াছিল, সেই ধানেই ফিরিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ধর্ম সাধনের হ্রস্বপাত হইল বৃষ্টিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম বা নীতির হ্রস্বপাত মাত্র হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। “ত্যাগ কর,” বেদ বলিতেছেন, “ত্যাগ কর”। ত্যাগ কর—ইহা ব্যতীত অল্প পথ নাই।

“ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া

ত্যাগনৈকেন অমৃতত্বমানুঃ।”

সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, এক মাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ইহাই ভারতীয় সকল শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহা ত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জগৎ সংসারের সহিত সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ কলির ‘জনক’ গণ।

করিতে হইয়াছিল, আর ঠাণ্ডা অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমরা সকলেই জনক বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। তাহার জনক বটে কিন্তু তাহার কতকগুলি হতভাগা ছেলের জনক মাত্র—তাহারা তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও অসমর্থ! ঐ টুকুই তাহাদের জনকত্ব, পূর্বকালীন জনকের ছায় তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এই ভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটুকুম করিয়া সোজা পথে এস দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পার তবেই তোমার ধর্ম হইবে। যদি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের যত পুস্তকালয় আছে, তাহার সকল গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমার ভিতর যদি ঐ কর্মকাণ্ড থাকে, তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমার ভিতর ধর্মের বিকাশ কিছু মাত্র হয় নাই।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত ত্যাগকেই আদর্শ করিতে গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোস্পদত্ব হইয়া যায়—“ব্রহ্মাণ্ডং গোস্পদায়তে”। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা।

ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত

তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে ; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে । হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর । তুমি যদিও দুর্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো করিও না । বল আমি দুর্বল—আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটতাব আশ্রয় করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না । অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত—নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা । যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল যে আমি দুর্বল । কারণ, এই ত্যাগটা বড়ই মহান আদর্শ । যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে ।

সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্ত । কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রাম বিজয় ক্রীত হয় । একটি ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন সকল

ত্যাগরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাতীয় বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে তাহাদের প্রধান আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । বোধাই প্রেপিস-জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার ডেন্সির বন্ধুভাচার্য্য সম্প্রদায় একমাত্র তাহা করেন জ্ঞান খুটা সন্ন্যাসীকেও নাই । আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে মানিতে হইবে ।

পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায় । এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভগ্নমাথা উর্দ্ধবাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল । কারণ, যদিও ঐ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে গল্পবাহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত শুবিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জ্ঞান ইহার প্রয়োজন । আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে । প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত জয় করিবে । এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও

গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত, যথায় অতি প্রাচীন কাল হইতে কৰ্ম-কাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছিল, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সৰ্ব্বত্যাগ করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসমূহে জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে, কতকগুলি ব্যক্তির পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, হইতে পারে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চিত আছেন, যাহাদের নিকট ধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র রহিবেনা, যাহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সৰ্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটি বিষয় যাহাতে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, তাহা আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাও একটি প্রকাণ্ড বিষয়। এই ভাবটী ভারতের বিশেষ সম্পত্তি—তাহা এই যে, ধর্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। “নামমাশ্বা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া প্রত্যক্ষাহুত্বিহ ধর্ম।

ন বহুনা শ্রুতেন”। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করেন যে, শাস্ত্রপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বরূপা বাক্যব্যয়ে বা বক্তৃতা দ্বারা আত্মলাভ হয় না, উহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে উহা সংক্রমিত হয়। শিষ্যের যখন এই অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাঁহার নিকট সমুদয় পরিকার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন।

আর এক কথা। বাঙ্গলা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমিও তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে কুলগুরু প্রথা।

বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা কর। যিনি বেদের রহস্য জানেন—গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য জানেন।

‘যথা ধরুচন্দনভারবাহী ভারন্ত বেষ্টা ন তু চন্দনস্ত।’

‘যেমন চন্দনভারবাহী গর্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি অবগত নহে,’ এই পণ্ডিতেরাও তক্রপ। ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন



থকাইবে না। তাহারা যদি অল্পতব না করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি শিখাইবে? বালক বয়সে এই কলিকাতা সহরে আমি ধন্যদ্বৈষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বস্তুতা শুনিবার পর আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বর দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমায় বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব। শাস্ত্রের যথেষ্ট অর্থ করিতে পারিলেই সে প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হইল না।

‘বার্ঠেখরী শঙ্করী শাস্ত্রব্যাত্যানকৌশলং।

বৈদুৰ্য্যং বিদুৰ্য্যং তদ্বদুৰ্য্যং ন তু মুদুৰ্য্যং’ ॥

নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্ত, মুক্তির জন্ত নহে।

‘শ্রোত্রিয়’—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, ‘অবুজিন’—নিষ্পাপ—‘অকামহত’—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শাস্ত্র,

তিনিই সাধু, বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন প্রকৃত ‘গুরু’ কে?

রুদ্ধে পুষ্পপত্রোদয় হয়, অথচ উহা যেমন রুদ্ধের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রকার প্রত্যাশার চাহে না, কারণ, উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদান স্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

“তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।

অহেতুজ্ঞানপি তারয়ন্তঃ ॥”

তাঁহারা স্বয়ং জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিই গুরু আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

“অবিজ্ঞান্যামন্তরে বর্জমানাঃ

স্বয়ং ধীরাং পণ্ডিতশ্রমজানাঃ।

জন্মজন্মানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ

অক্লেবনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ ॥”

নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে

সাহায্য করিতে যায়। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের দ্বায় তাহার উভয়েই ধানায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাটি হিন্দু, তোমরা সনাতন মার্গের পক্ষপাতী। আমি তোমাদের তোমাদিগকে সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা অধিক

বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা আজকালকার গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্যোধের মত কার্য্য করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীৰ্য্যবান, স্থির, অকপট হৃদয় হইতে উদ্ভিত, উহার প্রত্যেক সুরটাই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল। উহার কারণপরম্পরা বিচারের আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই এই জাতীয় ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীৰ্য্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। যাও, যাও—সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীৰ্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীৰ্য্যবান হও, সেই প্রাচীন নিষ্করুণীর জল আবার প্রাণ তরিয়া পান কর আব ভারতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র গতি।

অদ্বৈতবাদীর মতে—আমি অবাস্তব প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, বিষয় বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে আশ্বিনোপের তাৎপর্য্য।

এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি—যাহা হউক অদ্বৈতবাদীর মতে আমাদের যে এই ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, উহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের নিকটই এই কথাটা ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাকেও বল, সে ‘ব্যক্তি’ নহে, সে ঐ কথাতে এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, আমার আমিও—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার ‘আমিত্ব’ বলিয়া কিছুই নাই। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার পরিবর্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে,

তখন একরূপভাবে চিন্তা করিয়াছ ; এখন তুমি যুবক, এখন একরূপ ভাবিতোছ ; আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে, তুমি আর একরূপ ভাবিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি হয়, তবে আর তোমার ‘আমি’ কোথায় ? এই ‘আমি’ বা ‘ব্যক্তি’ তোমার দেহগতও নহে, মনোগতও নহে। এই দেহ মনের পারে তোমার আত্মা—আর অবৈতবাদী বলেন,—এই আত্মা ব্রহ্মরূপ। হুঁটা অনন্ত কখন থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন—তিনি অনন্তরূপ।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী—আমরা সব জিনিষই বিচার করিয়া বুঝিব। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে ? —যুক্তি বিচারের অর্থ—অল্প বিস্তর শ্রেণীভুক্ত করণ—ক্রমশঃ পদার্থনিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পঁছান, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবেই উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণানুসন্ধান করিয়া যাও, কিন্তু বৃত্তাবস্থা না তুমি সেই চরম অনন্তে পঁছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অবৈতবাদী বলেন, এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। আর সবই মায়া, আর কিছুই সত্য নাই। যে কোন জড়বস্তুই হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ বাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম ; আর নামরূপাদি আর বাহা কিছু—সবই মায়া। ঐ নামরূপ তুলিয়া লও—তাহা হইলেই আর তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু আমরাগকে এই ‘আমি’ হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি ইহা উহা করিতে পারিনা কেন ? কিন্তু এখানে এই শব্দটী অর্থব্যবহৃত হইতেছে। তুমি যখন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে কর, তখন তুমি আর আত্মরূপ ব্রহ্ম নহ—যাহার কোন অভাব নাই—বিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মরূপে আমরা সকলেই এক।

অন্তর্যামী দৈতবাদী ও অবৈতবাদীর মধ্যে এইটাই বিশেষ পার্থক্য। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্যের জ্ঞান বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজ মত পোষকতার

জন্ম হলে হলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, বাহা আমার মনে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও ঐরূপ শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, বাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের বৈত ও অবৈত মতে পার্থক্য—  
 ঈশ্বরাত্মক জীবনে উভয় পণ্ডিতদের ভিতরেও এই বারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে একটি মতের সমন্বয়।

মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই মিথ্যা—বদিও তাঁহারা প্রতি হইতে পর্যন্ত এই তত্ত্ব পাইয়াছেন এবং যে অভ্যুত তত্ত্ব ভারতকে এখনও জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে যে—  
 ‘একং সবিপ্রা বহুধা বহন্তি’—প্রকৃত তত্ত্ব—প্রকৃত সত্য একটী—সামুগ্ধ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর এই মূলতত্ত্বটাকে কার্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির সমগ্র জীবন সমস্যা। ভারতের কয়েকজনমাত্র পণ্ডিত—আমি পণ্ডিত অর্থে প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি—ব্যতীত আমরা সকলেই সর্বদাই এই তত্ত্ব ভুলিয়া বাই। আমরা এই মদান্ তত্ত্বটা সর্বদাই ভুলিয়া বাই আর অধিকাংশ পণ্ডিত—আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের মত এই যে,—হয় অবৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাবৈতবাদ, নতুবা বৈতবাদ সত্য আর তুমি যদি বারানসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া বস, তবে তুমি আমার কথাই প্রমাণ পাইবে। দেখিবে,—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের ত এই অবস্থা। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহবৃক্ষের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে—সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আশোচনা করিলেই বোধ হয় যে, এই উভয় মতই আবশ্যক—উহার। গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্য-কেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের জ্ঞান। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের দৃষ্ট দৃষ্ট তত্ত্বসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্য-কেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন উহা আরও উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। পক্ষেত্রিাবদ্ধ জীব মতাবতই বৈতবাদী হইয়া

থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সত্ত্ব ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিশুদ্ধ আর কোন ভাব দেখিতে পাইব না। রাধাকৃষ্ণ বলেন, ‘যতদিন তুমি আপনাকে দেহ, মন বা জীব বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জীব, জগৎ এবং এই উত্তরের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে। কিন্তু মহাব্যাকীর্ষনে এমন সময় কখন কখন আসিয়া থাকে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যেখানে মন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হুম্মাহুৎস হইতে হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, যখন যে সকল বিভিন্ন বস্তু আমাদের কাছে আবদ্ধ রাখে, আমাদের কাছে ভীত ও ছর্সল করিয়া ফেলে, সব চলিয়া যায়। ঈশ্বর ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেমাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রূক্ষণি তে স্থিতাঃ ।’

বাহ্যের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহার। এখানেই সংসার জর করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সর্বত্র সম, সুতরাং তাঁহার। ব্রহ্মে অবস্থিত।

‘সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যস্মানাস্মানং ততো যাতি পরাং পতিং ॥’

ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না—সুতরাং পরম পতি প্রাপ্ত হন।

## গীতাতত্ত্ব ।

[ স্বামীজি কলিকাতার অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলম-বাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, যাহারা পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসব্রত প্রাপ্ত হন। স্বামীজি ইহাদিগকে ধ্যান ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে কর্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতা-ত্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা হইয়াছিল। উহা গীতাতত্ত্ব নামে ৩য় বর্ষের উদ্বোধনে প্রকা-

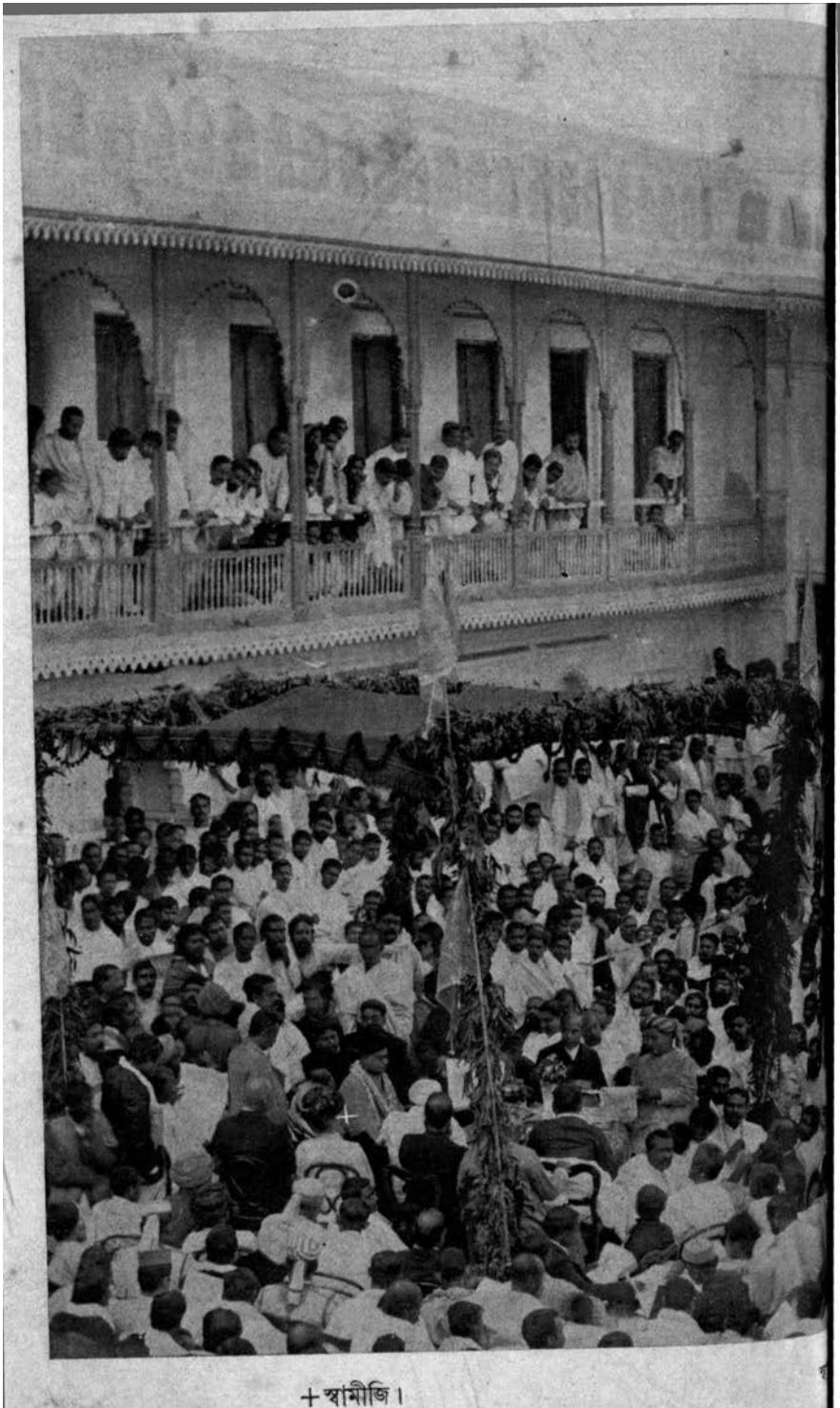
শিত হয়। ঐ বর্ষের উদ্বোধন এক্ষণে অপ্রাপ্যপ্রায় বলিয়া উহা আমরা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।]

“গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বৃষ্টিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় জানা অত্যাৱশ্যক। ১ম, গীতাটী মহাভারতের ভিতর প্রকৃষ্ট অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ অর্থাৎ উহা বেদব্যাসপ্রণীত

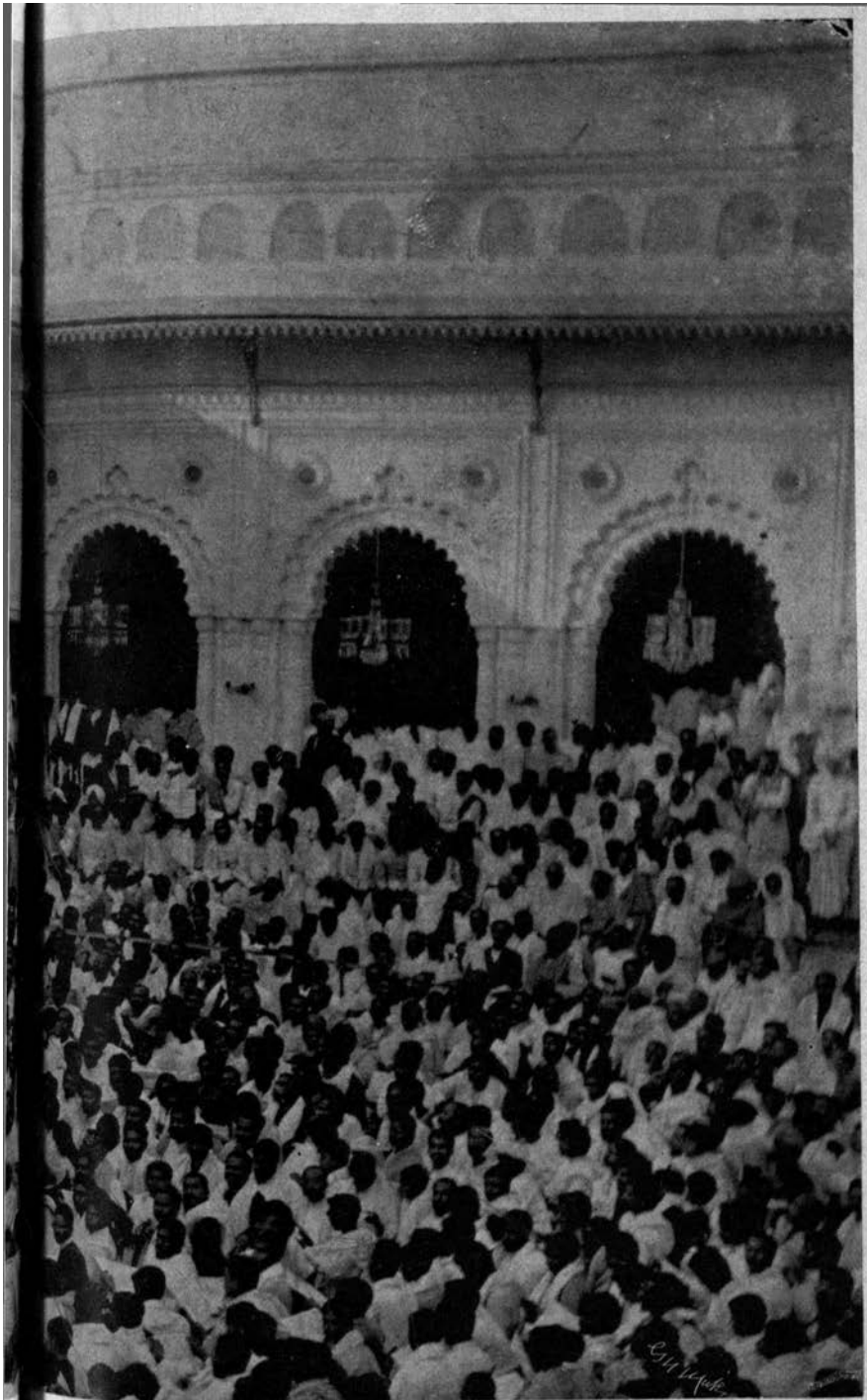
কি না। ২য়, কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না ?

৩য়, যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বার্থে ঘটয়াছিল কি না ? ৪র্থ, অর্জুনাদি স্বার্থে ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না। প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি দেখা যাউক। ১ম—বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা বৈশ্যায়ন ব্যাস কে ইহার প্রণেতা ? ব্যাস একটী উপাধি মাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ব্যাস নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—এই নামটীও একটী সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্বে গীতাগ্রন্থখানি সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। এ কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়নভাষ্য ছিল, যাহা হইতে রামানুজ ত্রীভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শঙ্করের ভাষ্যও যাহার নাম ও যাহার ভাষ্যের অংশবিশেষ পাওয়া যায়, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজ ও অপর লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

২য়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই :—ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ যোৱনামা কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ, দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা



+ স্বামীজি ।



কলিকাতার অভিনন্দন।



বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটাকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঝাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীলা আদিই যে ঐরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রযুক্তি অতি সাংগাঠাই ছিল। স্মৃতরাং বাঁহার বাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়েছেন। আর, পূর্বকালে লোকের নামবশের আকাজ্জা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিস্থ ঐতিহাসিকের বড় বিপদ। পূর্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছু মাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র আদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অমৃত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, “শতাব্দুবৈ পুরুষঃ।” আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? স্মৃতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় খুব সম্ভব এই জ্ঞাত যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদ্র মহাতারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতন ভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক একটা সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক এক খানি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টি লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গেল। সেইরূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ওয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি, বাগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-লেখক (Short-hand writer) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত

টুকিয়া লইয়াছিলেন ? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক মাত্র । ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—সদস্য প্রযুক্তির সংগ্রাম ; এ অর্থেও অসঙ্গত না হইতে পারে । ঐ—অর্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্ভেদ এই—শতপথ ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ । উহাতে একস্থলে সমস্ত অশ্বমেধবজ্রকারি-গণের নামের উল্লেখ আছে । কিন্তু সে সকল স্থলে অর্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পারীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে । এদিকে মহাতারতা-দ্বিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধ বজ্র করিয়াছিলেন ।

এখানে একটা কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম-সাধন শিক্ষার কোন সংশ্লেশ নাই । ঐ গুলি যদি আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না । তবে এত

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে :—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না । এদেশে এ সম্বন্ধে বড় সাহায্য ধারণা আছে । অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটা ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটা মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছু মাত্র লোষ নাই, অর্থাৎ, The end justifies the means. এই কারণে অনেক তত্ত্বে ‘পার্কীং প্রতি মহাদেব উবাচ’ দেখা যায় । কিন্তু আমাদের উচিত—সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা । কুসংস্কার বাহুবকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, বীণাখিষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন । তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে ।

একণে কথা হইতেছে,—গীতা জিনিষটীতে আছে কি ? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা । যেমন, জঙ্গলের গীতা ও উপনিষদের সম্বন্ধ । মধ্যে মধ্যে অপূর্ণ সুন্দর গোবাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা পাতা সব সমস্ত । আর গীতাটা কি ?—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দর রূপে সাজান—বেন কুলের মালা বা সুন্দর কুলের তোড়া । উপনিষদে প্রকার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিবেই হয় । গীতার কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে

ও এই ভক্তির ভাব পরিকৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্ম-শাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বের যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর বাহ্য

গীতার প্রচারিত নূতন  
ভাব সম্বন্ধ।

কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সময়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা

তাহা সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিকাম কর্ম—এই নিকাম কর্ম অর্থে আজ কাল অনেক অনেক রূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিকাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা হ্রদয়শূন্য পণ্ডরা ও দেওয়াল গুলিও নিকামকর্মী। অনেক আবার জনকের উদাহরণে নিকেকে নিকামকর্মী রূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তাহা পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকরূপে পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিকামকর্মী পণ্ডরও জড়প্রকৃতি বা হ্রদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এক্ষণে প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সময়ের ভাব ও নিকাম কর্ম—এই দুইটিই গীতার বিশেষত্ব।

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। ‘তৎ তথা কৃপয়া বিষ্টং’ ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কৈব্যাং মাংস গমঃ পার্থ। উপদেশ দিতেছেন, ‘কৈব্যাং মাংস গমঃ পার্থ,’—

এই স্থানে অর্জুনকে ভগবান যুদ্ধে প্ররুতি দিতেছেন কেন? অর্জুনের বাস্তবিক সঙ্কল্প উদ্ভিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্ররুতি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সঙ্কল্পী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহার অস্ত সময়ে বৈরাগ্য শাস্ত্র, বিপদের সময় সেইরূপ বীর। অর্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্ররুতি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার

দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সঙ্কল্পী, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচি ভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরম-হংস। কারণ, শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্নতপিণ্ডাচরণ হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুঁছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি বৃহৎ স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে তাহার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলিলেই হয়। সঙ্ক ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ—সঙ্কগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভাল বাসেন। এখানে দয়াক্রম আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, ‘নৈতত্ত্ব্যুপপদ্যতে’—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকারী করিয়া তুলিয়াছ—এ’ত তোমায় সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, ‘ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ।’ জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই ‘ভয়’। যে কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্বেক্ত করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা তোমায় শরীর মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। ‘ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ,’ তুমি বীর, তোমায় এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার—‘ক্লেব্যং মান্স গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্ব্যুপপদ্যতে,’ তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উন্টাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান্,—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে বৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার। এই একটী শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতা পাঠের কল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত।

## আলমোড়া ।

স্বামীজি কলিকাতা হইতে দার্জিলিঙে গমন করিয়া তথায় ছুই মাস বাপন করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক দিন বাস করিবার পরই কিন্তু হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়া সহর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। আলমোড়ার নিকটবর্তী লোদিয়া নামক স্থানে এক সুবহৎ জনতা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ক্রমাগত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। স্বামীজি অস্বারোহণে আলমোড়া সহরে প্রবেশ করিলেন। বাজারের দ্বান্তায় কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়া উহা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনাসমিতির তরফ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত ঘোষী হিন্দীতে একটা অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

### আলমোড়া অভিনন্দন ।

“মহাশয়,

পাশ্চাত্য দেশে আধ্যাত্মিক দীক্ষিত সাধন করিয়া আপনি ইংলণ্ড হইতে আপনার মাতৃভূমি ভারতে আসিবার জন্ত যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া অবশি আমরা স্বভাবতঃই আপনার দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি। সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কৃপায় অবশেষে আমাদের বাসনা সফল হইল—আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত। ভক্তরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন,—‘যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে নিশ্চিত তাহাকে পাইবে।’ আজ আমরা তাঁহার সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমরা আজ আপনাকে আন্তরিক ভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্ত এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে এই সহরে আসিয়া পুনরায় \* আমাদের দর্শন দিলেন, তাহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনার দয়ার জন্ত যে আপনাকে ক্রিয়াকর্ম বহুবাদ দিব, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বহু আপনি! বহু আপনার পূজ্যপাদ গুরুদেব, যিনি আপনাকে যোগমার্গে দীক্ষিত করেন। বহু এই

---

\* স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে যাত্রায় অনেক পূর্বে হিমালয় ভ্রমণ করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন।

ভারতভূমি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আৰ্য্যবংশীয়গণের নেতা রহিয়াছেন। আপনি অতি অল্প বয়সেই আপনার সারল্য, অকপটতা, চরিত্র, সঙ্গভূতাম্বুজম্পা, কঠোর সাধন, অমায়িক ব্যবহার ও জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা সমগ্র জগতে সেই অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন, যাহা লইয়া আমরা এতদূর গৌরব অমুভব করিতেছি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পর এদেশে আর কেহ কখন যে চেষ্টা করেন নাই, প্রকৃত পক্ষে আপনি সেই গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় আৰ্য্যগণের একজন বংশধর তপস্যার বলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৃধমণ্ডলীর সমক্ষে অত্যন্ত ধর্ম্ম হইতে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবে? চিকাগোর ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে আপনি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা একরূপ দক্ষতার সহিত সমর্থন করিলেন যে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই মহতী সভায় বিদ্বান্ বক্তাগণ নিজ নিজ ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারই জয়লাভ হইল। অন্য কোন ধর্ম্ম যে নৈদিক ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না, ইহা আপনি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকার নানা স্থানে এই প্রাচীন জ্ঞানের বার্তা প্রচার করিয়া আপনি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীন আৰ্য্যধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও আপনি সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন—এক্ষণে উহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

এত দিন পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান সভ্যজাতিসমূহ আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আপনি আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর দ্বারা তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। এখন তাহারা জানিয়াছে যে, যে সনাতন ধর্ম্মকে তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ ‘পণ্ডিতম্মন্য-গণের চুলচেরা বিচারের ধর্ম্ম অথবা নিকোমদিগের জ্ঞাতকতকগুলি রূপা বাগ্‌জাল’ বলিয়া মনে করিত, তাহা প্রকৃত পক্ষে রত্নের ধনি। বাস্তবিকই বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতাশ্চপি।

একশস্ত্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণোহপি তৎ ॥

আপনার ন্যায় সাধু ও ধার্ম্মিকগণের জীবনই জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর। বর্তমান ভারতের এই হীনাবস্থা সত্ত্বেও আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক সন্তানগণকে পাইয়াই তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন। অনেকেই সাগর পার হইয়া

এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আপনাব পূর্ণস্কৃতিবশে আপনি সমুদপারে গিয়া আমাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আপনি সমগ্র মানবজাতিকে কায়মনোবাক্যে ধর্মশিক্ষা দেওয়া আপনার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন। আপনি সর্বদাই ধর্মশিক্ষাদানে প্রস্তুত।

আপনি হিমালয়ে একটা মঠ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি আর আমরা অকপটভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনার এই উদ্দেশ্য সফল হয়। আচার্য্যপ্রবর শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের পর সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে একটা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঠায় যদি আপনারও কামনা সফল হয়, তবে ভারতের প্রভূত কলাপ হইবে। এই মঠ স্থাপন হইলে কুমায়ুনবাসী আমরা বিশেষভাবে ধর্মবিষয়ে লাভবান হইব—আমাদের মধ্য হইতে সনাতন ধর্মের ক্রমশঃ তিরোধান আমাদের কাছে আর দেখিতে হইবে না।

অরণ্যভীত কাল হইতে এই হিমালয় তপোভূমিরূপে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় সাধুগণ এই স্থানে ধ্যান ধারণা ও তপস্যানিরত হইয়া জীবনযাপন করিয়াছেন। এখন সে সব অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অন্তরের দহিত প্রার্থনা করি যে, এই মঠ স্থাপনের দ্বারা আপনি অল্পহৃৎপূর্বক আমাদের পুনরায় সেই ভাব উপলব্ধি করাইবেন। এই পবিত্র ভূমিই এক সময়ে প্রকৃত ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল—কালপ্রভাবে সেই ধর্ম ও সাধনা লোপ হইতে বসিয়াছিল। আমরা আশা করি, আপনার মহতী চেষ্টা দ্বারা ইহা আবার ইহার প্রাচীন ধর্মগৌরব লাভ করিবে।

আপনার আগমনে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া লোকহিতবতে নিযুক্ত থাকুন। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি দিন দিন বাড়িতে থাকুক—যেন আপনার চেষ্টা দ্বারা ভারতের এই ছরবছা শীঘ্র অপনীত হয়।”

লালা বদরিশাহ হইয়া পণ্ডিত হরিরাম পাণ্ডে আর একটা অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। স্বামীজি যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, তত দিন এই শাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন। আর একজন পণ্ডিত একটা সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

## আশমোড়া অভিনন্দনের উত্তর ।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যাম করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজ্ঞানী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি । এই সেই পবিত্র ভূমি, যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু জীবনের শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয় । এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, ইহার গভীর গহবরে, ইহার দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতী সমূহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বাংশি চিত্তিত হইয়াছিল—যাহার কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতে পর্য্যন্ত একরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারক্ষম পুরুষগণ যাহাকে অতুলনীয় বলিয়াছেন । ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি—আর তোমরা সকলেই জান, আমি এখানে চিরবাসের জন্ত কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের কোড়ে

বৈরাগ্যভূমি হিমাশয় ।

আমার জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইব । সম্ভবতঃ বজ্রগণ, পূর্ব পূর্ববারের মত এবারও বিফলমনোরথ হইব, নির্জনে নিস্তরুতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয় ত আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপট ভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাই নহে, একরূপ বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা এইখানেই আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিবে । এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে সামান্য কার্যের জন্ত তোমরা রূপা করিয়া আমায় যে প্রশংসাবাদ করিয়াছ, তাহার জন্ত তোমাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । কিন্তু এক্ষণে আমার মন কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্যসম্বন্ধে কিছু ভাবিতে চাহিতেছে না । যেমন এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়ন-গোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি—বৎসর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে বৃষ্ণুদ খেলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল আর কি কায আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কার্য করিবার সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়ে আলোচনার মন না গিয়া এখন আমার মন— হিমাশয় যে এক সম্মিত সত্য অনন্তকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের



হাওয়াতে পর্যাস্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগনীর আবর্তসমূহে আমি যে এক ভয়ের মূহু অক্ষুট ধ্বনি শুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে ।

‘সর্বং বস্তু ভয়ায়িতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ।’

এই জীবনে সকল জিনিষই ভয়ের কারণ—কেবল বৈরাগ্যবলেই নির্ভীক হওয়া যায় ।

হাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি । এখন বিন্দুরিত বর্ণনার সময় কা সুযোগ নাই । অতএব উপসংহারে বলিতেছি যে, এই হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান আর মানবজাতিকে এই ত্যাগ হইতে উচ্চতর ও মহত্তর আর কিছু শিক্ষা দিবার আমাদের মাই । যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন সেইরূপ ভবিষ্যতে জগতের সর্বস্থান হইতেই বীর-হৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্ম্মে ও আমার ধর্ম্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে—এক সনাতন ধর্ম্মমাত্র বিদ্যমান—অন্তরে ব্রাহ্ম-ভূতি—আর বাহ্যে কিছু সব রূপ । এইরূপ সত্যপিপাসু জীবগণ সংসার যায়ামাত্র আর ঈশ্বর, কেবল ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই রূপা জানিয়া এখানে আসিবে ।

বহুগণ, আপনারা অমুগ্রহপূর্বক আমার একটি সংকল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়া আশায় বাধিত করিয়াছেন । আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি

হিমালয়ে মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য ।  
কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে ; আর অগ্ণাত স্থান অপেক্ষা এই স্থানটাই এই সার্বভৌমিক ধর্ম্ম-শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নিব্বাচিত

করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি । এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত । যদি ভারতের ধর্ম্মতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে । অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া চাইই চাই—এ কেন্দ্র কর্ম্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিষ্কলতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে আর আমি আশা করি, একদিন

না একদিন আমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমি আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া তোমাদের সহিত এসকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এক্ষণে তোমরা আমার প্রতি যে সঙ্গদয় ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতি সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না—আমি মনে করিতে চাই—আমাদের ধর্মের প্রতি-নিধি বলিয়া তোমরা আমার প্রতি একরূপ সঙ্গদয় ব্যবহার করিয়াছ—প্রার্থনা করি—এই ধর্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এক্ষণে আমরা যেক্রপ পবিত্র ভাবাপন্ন এবং ধর্মভাবে মাতোয়ারা রহিয়াছি, এইরূপই যেন সব্বদা থাকিতে পারি।

—

স্বামীজির আলমোড়া হইতে চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিলে তাঁহার আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে হংলিশ রূবে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে হিন্দীতে ও রূবে ইংরাজীতে বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইল। অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে, হিন্দী ভাষা অসম্পূর্ণ ভাষা—সুতরাং উহাতে বক্তৃতা দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু স্বামীজি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ও ক্রমশঃ সুস্পষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন—তখন সকলের ভ্রম বিদূরিত হইল—সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—ভাষা যেন স্বামীজির হস্তে যম্ববিশেষ হইয়া যথেষ্ট পরিচালিত হইতেছে; তিনি নূতন নূতন বাক্য, এমন কি, নূতন নূতন শব্দ পর্য্যন্ত গঠন করিয়া অনর্গল নিজভাব বাক্ত করিতেছেন। যঁাহারা হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং যঁাহারা জানিতেন—হিন্দী ভাষা ওজস্বিনী বক্তৃতার কিরূপ অল্পযোগিনী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামীজি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতে যেক্রপ কৃতকার্য হইলেন, একরূপ আর কেহ কখন হন নাই—তদুপাধাই নহে, তিনি তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান

আছে—আর তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই,—যদবলম্বনে হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে ।

বক্তৃতার বিষয় ছিল—“বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক” ( Vedic teaching in theory and practice ) । বাছাবাছা উচ্চশিক্ষিত প্রায় ৪ শত শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল । তাঁহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন ।

ইংলিশ ক্লাবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন । গুর্খা রেজিমেন্টের কর্নেল পুলি সভাপতি হইয়াছিলেন । প্রথমে ‘জাতীয় দেব’ উপাসনার উৎপত্তি ও দেশ বিজয় দ্বারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন । বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্বামীজি আশ্চর্য তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন । পাশ্চাত্যপ্রণালী—যাহা বাহ্যজগতে জীবনের গুরুতর সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে যায়, তাহার সহিত প্রাচ্য প্রণালীর—যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জগতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তুলনা করিলেন । স্বামীজি বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগতের অনুসন্ধান প্রণালীর আবিস্কর্তা—আর ঐ প্রণালীর সহায়তায়ই তাঁহারা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারহস্য আবিস্কার করিয়া সমগ্রজগৎকে উহা প্রদান করিয়াছেন । ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামীজি আশ্চর্য সহিত পরমাশ্চর্য সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন । যখন এই একত্বের বিষয় বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মুহূর্তের জ্ঞাত বোধ হইল—বক্তা, তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে । যেন ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘উহা’ কিছুই জ্ঞান নাই । যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ক্ষণকালের জ্ঞাত সেই আচার্য্যবর্ষের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া মজ্জমুগ্ধবৎ রহিলেন ।

যাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতা অনেকবার শুনিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে অনেকবার এইরূপ অমূল্যভূতি হইয়াছে । ক্ষণকালের জ্ঞাত তিনি যেন আর স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন না—যিনি অবহিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহারা তাঁহার প্রত্যেক কথা লইয়া মনে মনে ভালমন্দ

---

সমালোচনা করিতেছে—সে সময়েও জন্ম যেন সব বিভিন্নতা, ব্যক্তির অন্ত-  
 হিত হয়—নামরূপ উড়িয়া যায়—কেবল এক চৈতন্যমাত্র বিরাজিত থাকেন—  
 বাহ্যতে বস্তু, শ্রোতা ও বাক্য যেন এক হইয়া গিয়াছে ।

---

## পঞ্জাব ও কাশ্মীর ।

আড়াই মাস আলমোড়ায় থাকিয়া স্বামীজি নিমন্ত্ৰিত হইয়া পঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজী বক্তৃতা অতি অল্পই হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সকলের রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাগত ভদ্রলোক-গণের সহিত যথেষ্ট চর্চা হইত এবং যেখানে যাইতেন, তথায়ই তিনি ছাত্র-গণের ভিতর বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সময়কার স্বামীজির ভ্রমণের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ স্বামীজির ভবিষ্যৎ বিস্তারিত জীবনচরিতলেখকের কিছু কাজে লাগিতে পারে এবং স্বামীজির ভক্তগণেরও এ বিষয়ে কৌতুহল চরিতার্থ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্য্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক এবং স্বামীজির একটী বিশেষ ভক্তের ডায়েরি হইতে কয়েকদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

১৮৯৭—১০ই আগষ্ট, স্থান বরেলি, প্রিয়নাথ বাবুর বাংলা। প্রাতঃকালে দুটী ভদ্রলোকের সহিত অল্পক্ষণ সদালোচনা। পশ্চাৎ আর্য্যসমাজীয় অনাথালয় দর্শন। ভোজনান্তে লেবুমিশ্রিত চিনির সরবৎ পান। ছয় মাসের মধ্যে একরূপ সরবৎ আর পান করেন নাই। অপরাহ্নে সমাগত লোকের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা। সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর, শরীর দুর্বল।

১১ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে দুটী ভদ্রলোককে তত্ত্ব উপদেশ। অপরাহ্নে লোকগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা, পশ্চাৎ ছাত্রসভার সংস্থাপন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতে অল্প জ্বর। এই দিন দিবাভাগে আহারের পর স্বামীজি অচ্যুতানন্দকে বলিলেন যে, আমি ৫৬ বৎসর জীবিত থাকিব।\*

১২ই আগষ্ট, স্থান ঐ। শরীর অসুস্থ তথাপি দুইটি মুন্সেফ এবং অগ্রাণ্ড ভদ্রলোকের সহিত গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা। আহারান্তে জ্বর—অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই জ্বরের কতক শান্তি হইলে সমাগত অনেক সন্তানু ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ। পরে রাত্রি ১১টার সময় ২য় শ্রেণীর রেলগাড়িতে অস্থানীয় পমন।

---

\* ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির দেহত্যাগ হয়।

১০ই আগষ্ট, স্থান অঝালা ছাউনী । প্রাতঃকালে ৭টার সময় ট্রেন অঝালা ছাউনীতে আসিল । কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য ঠেঁশনে আসিয়াছিলেন, অধশকটে আকড় হইয়া বাংলায় আগমন । সেভিয়ার সাহেবের ( ইনি এই ভ্রমণের সময় স্বামীজির সহিত অনেক স্থানেই ছিলেন ) সহিত কথোপকথন এবং অত্যাশ্চর্য ভদ্রলোকের সহিত বার্তালাপ । শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মুখ হাস্যমুগ্ধ ।

১৪ই আগষ্ট, স্থান ঐ । প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত অল্প আলোচনা । ভোজনান্তে স্কীরোদ বাবু এবং অত্যাশ্চর্য ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলোচনা । শরীর পূর্ণাপেক্ষা ভাল দেখিয়া সজ্জিগণ সকলেই আনন্দিত ।

১৫ই আগষ্ট, স্থান ঐ । প্রাতঃকালে অল্প আলোচনার পর ভ্রমণ করিতে করিতে সেভিয়ার সাহেবের বাংলায় আগমন । ঐ সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন কিন্তু বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই । অপরাহ্নে আর্য্যসমাজীদের সহিত ধর্ম্মালোচনা । রাত্রিতে প্রচারকার্যের কথোপকথন । শরীর পূর্ণাপেক্ষা সুস্থ ।

১৬ই আগষ্ট, স্থান ঐ । প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা । অপরাহ্নেও ঐ । রাতে মুসলমান, বান্দা আর্য্যসমাজী এবং হিন্দু এই সকল বিভিন্ন-বতাবলম্বী অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইল । লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটী কনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বস্তুতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন । শরীরের অবস্থা মাঝামাঝি ।

১৭ই আগষ্ট স্থান ঐ । প্রাতঃকালে সমাগত আর্য্যসমাজীদের সহিত বিশেষ শাস্ত্রালোচনা । আর্য্যসমাজিগণ নানাবিধ কূট প্রশ্ন কথিতে লাগিলেন কিন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামীজি সকলকেই নিরস্ত করিলেন । ভোজনের পর শরীর আবার অতিশয় অসুস্থ হইল, উদরে বেদনাবোধ হইতে লাগিল । ক্ৰোধাধি সন্ধ্যার পর এক জুড় সভার উপস্থিত হইয়া দেড়ঘণ্টা বাৎ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনোপদেশ দিলেন । রাত্রে অনাহার ।

১৮ই আগষ্ট, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা । আহাঃ! সমাগত লোকগণের সহিত কথোপকথন । রাত্রে তিন জন ভদ্রলোকের সহিত ইউরোপ

আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথা—বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন । শরীর পূর্বদিন অপেক্ষা সুস্থ ।

১৯শে আগষ্ট, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা । পশ্চাৎ হিন্দু-মহামেডান স্কুল দর্শন । ভোজনান্তে শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রলোক-গণের সহিত অল্প আলোচনা । সন্ধ্যার পর আর্য্যসমাজী দ্বারকানাথ উকিল প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত দেশভক্তি, সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিদ্যায় সবিশেষ আলোচনা । দ্বারকানাথ বাবু স্বামীজির কথাবার্ত্তায় বড়ই শ্রীতিলাভ করিলেন । শ্রাম বাবু অম্বালাতে স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রতি বড়ই সম্ভাবহার করিলেন ।

২০শে আগষ্ট—

পূর্বাহ্নে বেলা ৯টার সময় মেলে অম্বালা হইতে সেতিয়ার দম্পতীর সহিত অমৃতসর আগমন । ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন । ৪।৫ ঘণ্টা ব্যারিষ্টার তোড়রমলের বাটীতে থাকিয়া পশ্চাৎ কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্ত ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন—সঙ্গে কেবল সেতিয়ার-দম্পতী । ১৫দিন তথায় বাস করিয়া পুনরায় অমৃতসহরে আগমন, ২দিবস অবস্থান । এখানে রায় মূলরাজ প্রভৃতি আর্য্যসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনা ।

অনুমান ৩১শে আগষ্ট অমৃতসহর হইতে মেলে রাওলপিণ্ডি আগমন । ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা স্বামীজির জন্ত বগি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু স্বামীজি রাওল-পিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেতিয়ারদম্পতীর সহিত টঙ্কায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন । স্বামীজির অত্যন্ত সঙ্গিগণ পশ্চাৎ একায় গেলেন । মরিতে উকিল হংসরাজের বাটীতে অবস্থিতি । ওখানকার দাঙ্গালী বাবুগণ স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিলেন । তাঁহাদের গৃহে যাইয়া স্বামীজি অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন । মরিতে অনুমান ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আসা হইল । স্বামীজি সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরামুখে যাত্রা করিলেন । মরি হইতে অনুমান ৬ই সেপ্টেম্বর সকলে টঙ্কায় চড়িয়া ৮ই তারিখে বারামুলা আগমন । তথা হইতে তখনই নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগর যাওয়া হইল । রাস্তায় সঙ্গিগণের সহিত নানাবিধ চর্চা—বড়ই আনন্দ । ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে

চিকিৎসক ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিত। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজিকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার মিত্রেরও আলাপ হইল। তিনিও স্বামীজির সহিত সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। কাশ্মীরী অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া নানাবিধ সংস্কার করিতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজবাড়ী দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় কোন পাঞ্জাবী রাজকর্মচারী আসিয়া তাঁহাকে অভ্যস্তরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার রাজার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি উত্তর করিলেন, হাঁ। এই অবসরে ডাক্তার মিত্র উপর হইতে নীচে আসিয়া স্বামীজিকে বলিলেন, কাল রাজা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তার বাবুর সহিত অশ্রান্ত নানাবিষয়ের আলোচনা, ভ্রমণাদি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, স্থান জীনগর, কাশ্মীর। প্রাতঃকালে নানাবিধ চর্চা। বেলা ২টার সময় রাজভবনে গমন। রাজা স্বামীজিকে যথোচিত সমাদর করিলেন—স্বামীজিকে চেয়ারে বসাইয়া কর্মচারিগণের সহিত স্বয়ং নীচে আসনে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে চর্চা হইল প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত। পশ্চাৎ স্বস্থানে গমন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকের সঙ্গে চর্চা—পশ্চাৎ ভ্রমণ।

১৫ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ।

প্রাতঃকালে শঙ্করাচার্যের পর্কত দর্শন, প্রত্যাগমন করিয়া লোকের সহিত আলোচনা। পশ্চাৎ ভোজনান্তে পুনর্বার সমাগত লোকের সহিত চর্চা। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব পর্য্যন্ত চর্চা হইল। পশ্চাৎ ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পব কতকগুলি পণ্ডিত এবং অপরাপর লোকের সহিত চর্চা। এদিন একটী পাঞ্জাবী সাধু আসিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে নৌকাযোগে হ্রদ ভ্রমণ—আনন্দের কথাবার্তা। ৫টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন। সন্ধ্যার পূর্ব হইতে প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত সমাগত পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকদের সহিত ইংরাজীতে ও হিন্দীতে বর্ধচর্চা, শঙ্কাসমাধান, পশ্চাৎ সজীত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত পাঞ্জাবীদের সহিত বর্ধচর্চা—পশ্চাৎ উহাদের সহিত হাউসবোটের বন্দোবস্তের জন্ত গ্লিডার জয়-কৃষ্ণের বাটী গমন। তিনি যথোচিত সমাদর পূর্বক হাউসবোটের বন্দোবস্ত



করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, আর বাহা কিছু আবশ্যক হয়, আপনি আজ্ঞা করুন। স্বামীজি বলিলেন, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। রাস্তায় পঞ্জাবী দের সহিত ধর্মচর্চা হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমাগত রাজা অমরসিংহের উজিরের সহিত নানাবিধ চর্চা। প্রসঙ্গক্রমে হাউস বোটের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি এখনই উহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অপরাহ্নে গবর্ণরের সেক্রেটারি বোট লইয়া আসিলেন—তাহার সঙ্গে কথাবার্তা। পরে ভোজন, অল্প শয়ন, পরে কথাবার্তা। অপরাহ্নে চর্চা এবং সঙ্গীত। সায়ংকালে এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ভোজনার্থে গমন। তথায় নানাবিধ শাস্ত্রচর্চা ঐ স্থানে অনেক গণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও মালাদ্বারা স্বামীজিকে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে আসিয়া বাস-পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। বাস্তবিকই ইহারা স্বামীজিকে যথোচিত ভক্তি করিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চর্চা—ভোজনান্তেও চর্চা। সন্ধ্যার পূর্বেই নৌকায় নিমন্ত্রণে গমন। নিমন্ত্রণকারী অতি সম্ভ্রান্ত বংশের। ইনি নানা উপাদেয় দ্রব্যাদি আহার করাইলেন এবং ছবি ও পুস্তক দেখাইলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চর্চা। নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত। ভোজনান্তে পুনরায় কথাবার্তা। দিনের শেষভাগে অহারোহণে ভ্রমণ, প্রত্যাগমন করিয়া—বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা। সন্ধ্যার পরে রাজা রামসিংহের মোসাহেবের বাড়ীতে ভোজনার্থে নৌকায় গমন। তথায় ভদ্রলোকগণের সঙ্গে কথাবার্তা, ভোজনান্তে সেতার এবং। পশ্চাৎ ঘোটে আসিয়া শয়ন।

২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪টার সময় শ্রীনগর হইতে গমন। প্রাতঃকালে নানাবিধ কথাবার্তা, পুস্তক পাঠ প্রভৃতি—নৌকায়ই আহার। পামপুর নামক স্থানে রাত্রিবাস। তথায় কশর খেত দেখা এবং বাজারে ভ্রমণ।

২১শে সেপ্টেম্বর—নৌকায় ভ্রমণ—প্রাতঃকালে পুস্তক পাঠ। কথাবার্তা—ভোজনান্তে পাঞ্জাবী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়ের চর্চা।

২২শে সেপ্টেম্বর। নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ দর্শন। বাজার ভ্রমণ—সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প ধর্মচর্চা।

২৩শে সেপ্টেম্বর অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া

পদব্রজে মার্ত্তণ্ডে গেলেন। রাত্তায় ২জন পাণ্ডাকে সহপদে দিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডে বাইরা সন্মগত পাণ্ডাদের সহিত নানাবিধ চর্চা।

২৪শে সেপ্টেম্বর মার্ত্তণ্ড ধর্মশালা—প্রাতঃকালে তথা হইতে অক্ষয়বল ( আচ্ছাবল ) বাত্রা। রাত্তায় লোকেরা একটী মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত আর এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামীজি ঘোড়ায় চড়িলেন। এখানে নানাবিধ চর্চা হইল।

ইহার পরের কয়েক দিনের ডায়েরি হারাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়া স্বামীজি অনেকটা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া নামিয়া মরিতে আসিলেন। সেভিয়ার দম্পতী তথায়ই বরাবর ছিলেন।

১২ই অক্টোবর, স্থান মরি—সেভিয়ার সাহেবের বাঙ্গালা। কথাবার্তা ইত্যাদি।

১৩ই ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত কথাবার্তা ইত্যাদি পশ্চাৎ নিবারণবাবুর বাটীতে গমন। সমাগত লোকের সহিত চর্চা। তথায় রাত্রি অবস্থান।

১৪ই ঐ স্থান ঐ—নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত কথাবার্তা। অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া স্বামীজিকে একটা অভিনন্দন দিবার সংকল্প করিয়া তাঁহার অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজিও তাহাতে সন্মত হইলেন। রাত্রে অভিনন্দন-সভা আহুত হইল। অভিনন্দন পড়া হইল। স্বামীজি তাহার উত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল।

১৫ই ঐ স্থান ঐ। নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চা, অপরাহ্নে সেভিয়ারের বাঙ্গালায় গমন, কথাবার্তা ইত্যাদি।

১৬ই ঐ—প্রাতঃকাল ৯টার সময় টঙ্গাযোগে রাওলপিণ্ডি যাত্রা। রাত্তায় নানাবিধ কথাবার্তা। প্রায় ৫টার সময় উকিল হংসরাজের বাটীতে গমন। সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই সমাগত লোকের সহিত নানাবিধ চর্চা। আধ্যাত্মজিজ্ঞাসু স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত সদালাপ, স্বামীজি তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। জজ নারায়ণ দাস, ভক্তরাম ( তাঁহার ভ্রাতা—ব্যারিষ্টার ) প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই ঐ, স্থান রাওলপিণ্ডি—হংসরাজের বাড়ী । প্রাতঃকালে সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চা । পশ্চাৎ ভোজনাদি ছাউনিতে নিমাইয়ের বাড়ী গমন । তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্তা । প্রায় ৩টার সময় তথা হইতে প্রত্যাবর্তন । একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্ত সূজানসিংহের বাগানে গমন । জজ রায় নারায়ণ দাসের প্রস্তাবে এবং উকিল হংসরাজের অনুমোদনে সূজানসিংহ সভাপতি হইলেন । সভায় প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । বক্তৃতা ৫টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হইল । ভাষা ইংরাজী—বিষয় হিন্দুধর্ম । স্বামীজি বেদ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন । কখন বীরদর্পে আত্মার অমন্ত মহিমা ও সর্বশক্তিমন্তর কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহাতেজের, মহাশক্তির সঞ্চার করিতেছেন, কখন বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষ প্রয়োগে শ্রোতৃবৃন্দের হস্তরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছেন । স্বামীজির বক্তৃতায় সকলের হৃদয় উদ্বোধনাপূর্ণ হইয়া উঠিল । বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন । রাতে ভক্তরামের কুঠিতে নিমন্ত্রণ । সঙ্গে জজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ প্রভৃতিও গেলেন ও ভোজনাদি করিলেন । তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্থানে আগমন । প্রকাশানন্দের সহিত রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত চর্চা ।

১৮ই ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে রায় নারায়ণ দাস এবং বাবা কেমসিংহের পুত্রের সহিত চর্চা—প্রকাশানন্দের সহিত কথাবার্তা । ভোজনান্তে অল্প শয়ন । শয়নান্তে সঙ্গিগণকে অতিশয় শিরঃপীড়ার কথা জানাইলেন ।

গত দিন হইতেই শিরঃপীড়া ভোগ করিতেছিলেন—এখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায় ব্যস্ত করিলেন । তথাপি লোকের সঙ্গে হস্তবদনেই কথাবার্তা চলিতে লাগিল । বাহিরের লোকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না । সন্ধ্যায় পূর্ব হইতেই জজ ও কেমসিংহের পুত্রের আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন—তঁাহাদের সহিত নানাবিধ কথাবার্তা—রাতে উহাঁদের সহিত একত্রে ভোজন এবং আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কাসমাধান । রাত্রি ১১টার সময় শয়ন । প্রকাশানন্দ ঐ সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত ।

১৯শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সেক্সিয়ারের বাগালায় গমন, তঁাহাদের সহিত কথাবার্তা । পশ্চাৎ কালীবাড়ীতে আগমন—সঙ্গে প্রকাশানন্দ ।

তথায় পরস্পর চর্চা, ভোজন। ভোজনান্তে এক শিখের সহিত অনেক চর্চা। সে সময় অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটা ছোটখাট সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামীজি অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ স্বামীজি ইহাঁদিগকে প্রচারকার্যের জন্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তাঁহার। সন্মত হইলেন। রাত্রি ৮টার পর সেভিয়ারের বাংলায় যাইয়া তথায় ভোজন ও শয়ন।

২০শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে ৯টা পর্য্যন্ত সেভিয়ার দম্পতীর সহিত কথাবার্তা। পশ্চাৎ হংসরাজের বাড়ীতে আগমন—কথাবার্তা, ভোজন ইত্যাদি। ভোজনান্তে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজির দ্বনৈক গুরুভাই এক বগি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক পীড়িত হইয়াছেন এবং তোমায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক। দয়াল স্বামী তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে প্রকাশানন্দ, নিমাই প্রভৃতি। তথায় সেই বাবু পাঁচটা প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই পাঁচটা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়া যাইব—স্বামীজি সেই প্রশ্নগুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে তিনি অতিশয় কৃতার্থ হইলেন। সেখানে জলখাবার খাওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ৮০টার সময় হংসরাজের বাড়ী আগমন। হংসরাজের সহিত আনন্দের কথাবার্তার সহিত ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া—তাঁহারই বগিতে চড়িয়া কালীবাড়ী গমন। তথায় দুটা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত হস্তরসের কথাবার্তা করিয়া অল্প শয়ন।

পশ্চাৎ রাত্রি ১২টার পূর্বে ষ্টেশনে গমন। তথা হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রা। উজিরাবাদ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাইয়া স্বামীজি তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েকজনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। স্বামীজি উজিরাবাদ হইতে জম্মুর ট্রেণে উঠিলেন ও পরদিন ২১শে অক্টোবর বেলা ১২টার সময় জম্মুতে নামিলেন। একটা বাঙ্গালী রাজকর্মচারী বগি লইয়া উপস্থিত ছিলেন—সেই বগিতে স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাদের জন্য পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জম্মুরাজের অভ্যর্থনা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহেশবাবুর পূরণ অভ্যর্থনার জন্ত উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফল ও মিছরি হস্তে লইয়া মহেশবাবু উপস্থিত হইলেন এবং

যথোচিত সমাদরপূর্বক স্বামীজির সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে অল্প শয়ন। শয়নান্তে রাজা অমরসিংহের কৰ্মচারীর সহিত কথাবার্তা, তাঁহার সঙ্গে অন্য তিনজন লোকও ছিলেন। ইতিমধ্যে ২ জন বাঙ্গালী আসিলেন—উঁহাদের সহিত রাজার লাইব্রেরি দেখিতে চলিলেন। রাত্তায় অত্যাশ্চর্য লোক আসিয়া মিলিল। শরীর সুস্থ ছিল না—পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন।

২১শে অক্টোবর, স্থান জম্মুরাজনির্ধারিত গৃহ। প্রাতঃকালে মহেশ বাবুর সহিত কথাবার্তা এবং সমাগত পঞ্জাবীদের সহিত চর্চা। স্নানান্তে একটা পঞ্জাবী উকিলকে উপদেশ দেওয়া। আহার ও বিশ্রামান্তে মহেশ বাবুর বাটী গমন, তাঁহার গুরু কৈলাসানন্দের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা। মহেশ বাবুর সহিত কার্যসম্বন্ধে পরামর্শ (স্বামীজির কাম্মীরে একটা মঠ সংস্থাপন করিবার সংকল্প ছিল)। পশ্চাৎ রেসিডেন্টের বাটী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন, কথাবার্তা ও ভোজন। পশ্চাৎ সমাগত রাজকৰ্মচারী রূপারামের সহিত ও তাঁহার সঙ্গে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্তা। পশ্চাৎ শয়ন।

২২শে অক্টোবর, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে মহেশ বাবুর সহিত কথাবার্তা। ভোজনান্তে রাজদত্ত বগিতে বেলা ১১টার সময় রাজদর্শনার্থ গমন। মহারাজ—ভ্রাতৃদ্বয় ও প্রধান প্রধান কৰ্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। প্রথমতঃ মহারাজ সন্মাসধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামীজিও যথোচিত উত্তর দিলেন। পশ্চাৎ প্রসঙ্গক্রমে বহিরাচারের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। স্বামীজি কহিলেন—নানাবিধ কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকায় ৭ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবাসী বিজাতীয়দের দাসত্ব করিতেছে। যাহা বথার্থ পাপ ও সকল অনর্থের মূল—যথা ব্যভিচারাদি—তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না—এখন যা কিছু অপরাধ, সবই থাকিয়া লইয়া। সমুদ্রযাত্রাপ্রসঙ্গে স্বামীজি বলিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং বর্ণা, সিলোন প্রভৃতি স্থানে এখন অনেকে বাণিজ্য করিতেছে। আর বিদেশযাত্রা না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। পরে বিলাত আমেরিকার প্রচারসম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। উপসংহারে স্বামীজি বলিলেন, দেশের কল্যাণের জন্ত যদি নরকে ঘাইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। প্রায় ৩টার সময় কথাবার্তা শেষ হইল। কথাবার্তায় মহারাজ প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট

হইলেন। বগিতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছোট রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার নূতন ভবনে গমন। বগি পৌঁছি-  
বামাত্রই রাজা স্বামীজিকে প্রণাম পূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক  
কথাবার্তা।

২৩শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত বিশেষ চর্চা।  
ভোজনান্তে প্রধান কর্মচারী ভাগরায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য  
তাঁহার বাটীতে গমন—সঙ্গে মহেশ বাবু। অল্পমান ১১০ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া  
আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকের অনেক চিঠি আসিল—পড়িতে লাগি-  
লেন। এই সময়ে শিয়ালকোট হইতে অনেক ভদ্রলোক তথায় যাইবাব  
নিমন্ত্রণ করিতে ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে অগ্রসর করিয়া আসিলেন। শীঘ্রই কতক  
চিঠি পড়িয়া স্বামীজি তাঁহাদের সহিত চর্চা করিতে লাগিলেন। প্রায় ২১০  
ঘণ্টা চর্চার পর তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাৎ মহেশ বাবুর  
অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী ২ জন আসিলেন। স্বামীজি বক্তৃতাস্থানে  
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বগিতে চড়িয়া তথায় গেলেন। বক্তৃতান্তে  
স্বস্থানে পদব্রজে আগমন। ভোজনসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্তা।

ঐ দিন মহারাজ আগামী দিনে বক্তৃতা দিবার কথা বলিলেন আব  
ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত স্বামীজি জম্মুতে থাকিবেন,  
ততদিন যেন একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন বক্তৃতা করেন। তিনি অনুরোধ  
করিলেন, স্বামীজি যেন এখানে অন্ততঃ ১০।১২ দিন থাকেন।

২৪শে ঐ, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে পদব্রজে নদী দেখিতে যাওয়া—নদীতীরে  
জলের কল দেখা। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন, সমাগত লোকজনের সহিত কথা-  
বার্তা, ভোজন। পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে গান করিতে লাগিলেন। লোকের  
সহিত কথাবার্তা। সন্ধ্যার পর বগিতে চড়িয়া সহরের দীপমালা দেখা।  
পশ্চাৎ স্বস্থানে না যাইয়া মহেশ বাবুর বাটী পর্য্যন্ত গমন। মহেশ বাবুর  
জ্বর হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া একটা বাঙ্গালী মাষ্টার ও অচ্যুতকে  
আর্য্যসমাজের দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্তান্ত উপদেশ। পঞ্জাবী লোকের  
অনভিজ্ঞতার বর্ণন।

ঐ দিন প্রাতঃকালে অচ্যুতের সহিত বেদান্তের চর্চা করিতে করিতে  
অকাট্য যুক্তি দ্বারা বুঝাইলেন,—অনন্ত নিরপেক্ষ সত্তা, কখন সান্ত জ্ঞান  
হইতে পারে না।

ঐ দিন বক্তৃতা স্থানে যাইয়া পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণের সহিত ধর্মসম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন । সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের কোন কারণে আসা হইল না । প্রায় ৫।০ টার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইল । বেদ হইতে পুরাণ পর্যন্ত সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়া ভক্তি, হাশু প্রভৃতি রসসম্বলিত মনোহর বক্তৃতা করিলেন । প্রায় ২ ঘণ্টা বক্তৃতা—পশ্চাৎ লাইব্রেরি দেখিয়া পদব্রজে স্বস্থানে আগমন ।

২৫শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে পদব্রজে ভ্রমণ ও রাজার পশুশালা দর্শন । সমাগত লোকগণের সহিত ধর্মচর্চা ও গূঢ়তত্ত্ব সমূহের মীমাংসা ।

২৭শে ঐ স্থান ঐ—পদব্রজে বনভ্রমণ, পথে সঙ্গিগণের নিকট মহারাজীয় জাতির ইতিহাস বর্ণন । ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত ধর্মচর্চা, মহেশ বাবুর বাটী গমন ও কার্য সম্বন্ধে কথাবার্তা । প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মচর্চা, সঙ্গীতাদি ।

২৮শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণ, পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজনীতিসম্বন্ধে অনেক গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ । উপদেশের শুল্ল মর্ম এই,—সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত, বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত । গুণগত ও বংশগত জাতিভেদের তুলনা করিলে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় । বংশগত জাতি থাকিলে কোন ব্যক্তি যতই গুণবান্ বা ধনবান্ হউক, স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে পারে না ; স্মৃতরাং তাহার জাতি তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু ভাগী হইয়া থাকে । গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না । বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা । মানবশ্রেণী প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করা মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মাছুক বা না মাছুক, যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া যাইব । নিজের বাল্যকালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন । এহ সকল কথাবার্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল । এই সময়ে লাহোর হইতে সেভিয়ার সাহেবের পত্র আসিল । পত্র পড়িয়া জেসিরাম নামক জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক তাহাদিগকে খুব যত্ন করিতেছেন জানিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন । পশ্চাৎ আহারাদির পর মহেশ বাবুর বাটীতে গমন ও আগামী দিবসই চলিয়া

হাইবেন, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। মহেশ বাবু আরও ২৩দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

২৯ শে ঐ স্থান ঐ—চচ্চা।। রাজা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা।

স্বামীজি জন্ম হইতে শিয়ালকোটে আসিয়া ২টী বক্তৃতা দিলেন। একটী ইংরাজীতে ও অপরটী হিন্দীতে হইল। আমরা উহার মধ্যে হিন্দী বক্তৃতাটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ দিলাম।



### শিয়ালকোটে স্বামীজির বক্তৃতা ।

#### ভক্তি ।

জগতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম রহিয়াছে, তাহাদের সকলের উপাসনাপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক।

সকল ধর্মই ভক্তি স্বীকার করিয়া থাকে।

নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নিষিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক।

আবার এমন ধর্মও আছে, যাহাতে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। সত্য বটে, এই সকল প্রবল বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু যদি সেই সকল ধর্মের মূল তথ্য, সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে, তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্মও আছে, যাহা ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানেন না। কিন্তু দেখিবে, তাহারা সাধুসহানুভূতিগণকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্মই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

ভক্তি সকল ধর্মেই রহিয়াছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষের উপর অর্পিত। সর্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান লাভ করিতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, অল্পকাল অবস্থা হওয়া চাই, নানাবিধ বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য না হইলে



এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ানুরাগবিরহিত না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তি অতি সহজেই লাভ হইয়া থাকে। সকলেই এই ভক্তি লাভ করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি এক দিন খাইতে না পায়, তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, দস্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কি যন্ত্রণা হয়! সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত, যাহার হৃদয় ভগবানকে প্রিয়তম জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এইরূপ ব্যাকুল হয়। ভক্তির এই মহৎ গুণ যে, একমাত্র উহা দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।

“নাম্যামকারি বহুধার্পিতসর্বশক্তিঃ” ইত্যাদি।

হে ভগবান, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বর্তমান। আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু বিচার করিবার নাই। মৃত্যু যখন স্থান কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বরের নাম করিবার স্থানকাল বিচার কি হইতে পারে?

ঈশ্বর বিভিন্নসাধক কর্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টমাত্র, বাস্তব ভেদ নহে। কেহ কেহ মনে করেন, আমার সাধনপ্রণালীই অধিক কার্য্যকর, অপরে আবার তাঁহার নিজ সাধনপ্রণালীকেই শীঘ্র মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ উভয়ের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উভয়ই একই প্রকার। শৈবগণ শিবকেই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন; বৈষ্ণবেরা একমাত্র তাঁহাদের সর্বশক্তিমান বিষ্ণুতেই অনুরক্ত আর দেবীর উপাসকগণ

জগতের মধ্যে দেবীই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য কিন্তু এক। শালিনী—এ কথা ব্যতীত অল্প কোন কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। যদিও দ্বেষভাব পরিত্যজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বলিয়াছেন,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভ্যর্থনা: পরামর্শময়।

তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥

আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীপতি যিনি, তিনিই সীতাপতি ; তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব ।

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন । এই সকল বিভিন্নতাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে । সে কখন ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না । জগৎ যে কখন একধর্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ । দীক্ষার করুন—জগৎ যেন কখন একধর্মাবলম্বী না হয় । তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে । সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে । আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাহার ভাবানুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন,

তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে । তাহাকে বিভিন্নতা প্রয়োজন ।

সেই ভাবের বিকাশ সাধন করিতে হইবে । কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে ; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে, তাহাও হারাইবে ; সে একেবারে অকস্মিক হইয়া পড়িবে । যেমন এক জনের মুখ আর এক জনের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনকে প্রকৃতি আর এক জনের সহিত মেলে না । আর তাহাকে তাহার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি ? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—যদি উহাকে একটী নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু উহাকে উহার নির্দিষ্ট খাত হইতে সরাইয়া অন্য দিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে—কি ফল হয় । উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতোবেগও হ্রাস হইয়া যাইবে । এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—ইহাকে নিজ ভাবানুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে । যে দেশে এইরূপ সকলকেই এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায় । ভারতে কখন এরূপ চেষ্টা হয় নাই । বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্মই স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কার্য সাধন করিয়া গিয়াছে—সেই জন্যই এখানে প্রকৃত

বন্দ্যভাব এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্মে বিরোধ নিম্নলিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন মনে করিতেছে, সত্যের চাবি আমার নিকট, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপটী, কারণ, তাহা না হইলে সে আমার কথা গুনিত।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্বশক্তি-

মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পার? সকলকে একধর্মী-  
বিভিন্নতা না থাকিলে মানুষ বলস্বী করিবার ক্ষমতা অনেক প্রকার উদ্যোগ ও  
চিন্তাশক্তির অভাবে পণ্ড-  
তুল্য হইয়া যাইবে। চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

এমন কি, তরবারিবলে সকলকে একধর্মীবলস্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানে একবাড়ীতে দশটি ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটা ধর্ম কখন থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মানব চিন্তায় সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না; এমন কি, সে মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। মন্ব বাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য শব্দের অর্থ মনন-শীল। যখনই মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিও চলিয়া যায়, তখন তাহাতে আর একটা সাধারণ পণ্ডতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন ভারতের কখন এরূপ অবস্থা না হয়।

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, তজ্জন্ত এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব।

অবশ্য বহুত্ব বা বিচিত্রতা বলিলে ইহা বুঝায় না  
ধর্ম যেন আচারপুত হয়।

যে, উহার মধ্যে ছোট বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়, তাহাপি এই বিচিত্রতা থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্মেই ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই ঐ ঐ ধর্ম লোকের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধর্ম অস্ত্রায় কার্যোৎসাহ পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর আর

‘না’ ব্যতীত কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্মকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই ভাল; কারণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় আর আচারকে যেন ধর্ম হইতেও উচ্চাসন প্রদান করা হয়। এখানে ইহাও বলা কর্তব্য যে, আচার অর্থে বাহ ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল এবং শাস্ত্রোক্ত অত্যাশ্রয় বস্তুর সংযোগে শরীরের শুদ্ধিবিধান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধি করিতে হইলে মিথ্যাভাষণ, সুরাপান ও অত্যাশ্রয় গর্হিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। শুদ্ধ মস্তপান, চৌর্য্য, দ্যুতক্রীড়া, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য্য হইতে বিরত হইলে চলিবে না। ঐগুলি ত তোমার কর্তব্য। উহার জ্ঞাত তুমি কোনরূপ প্রশংসার ভাগী হইতে পার না। নিজের প্রতি এই কর্তব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার জ্ঞাত চেষ্টা করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজননের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে—কেবল ইহাব সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্বে আহার সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ স্বরূপ এই স্পষ্টাস্পষ্ট বিচারমাত্র দোষিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে ত্রিবিধ দোষ কথিত হইয়াছে। (১) জাতিদোষ—যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ, লঙ্গুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতিদুষ্কৃত্যাদি থাকে। ঐ সকল খাদ্য অধিক পরি-

আহারের নিয়ম।

মাণে খাইলে কামরিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত অসৎকর্ম্ম সকল করিতে থাকে। (২) আব-  
জ্ঞনা কীটাদিপূর্ণ স্থানে আহার; ইহাকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষ বর্জনের জ্ঞাত আহারের নিমিত্ত এমন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে, যেস্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। (৩) আশ্রয়দোষ—অসৎব্যক্তি কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্রতাবোধ আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্ৰিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

এখন এ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল এইটুকুতে ঠেকিয়াছে যে,

আমাদের আপন। আপনি লোক না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে ব্যক্তি হাজার ঝানী ও উপযুক্ত লোক হউক। ময়রার দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম যে কিরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে, মাড়ি সব চারি দিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে—রাস্তার ধূলা উড়িয়া মিঠাইয়ের উপর পড়িতেছে আর ময়রারপোরও কাপড়খানা এমনি যে, চিম্টি কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, খরিদাররা সকলে মিলিয়া বলুন না, দোকানে গ্রাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না? এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও অগ্ন্যাগ্নি প্লেগের বীজ আনিতে পারিবে না। পূর্ষকালে লোকসংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে—অগ্ন্যাগ্নি অনেক প্রকার পরিবর্তনও ঘটয়াছে। আমাদের এতদূর উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতি হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন, জলে গুথু ফেলিও না, আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। এই সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বাহশৌচের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন। কিন্তু এখন তাহা সব চলিয়া গিয়াছে। এত কারণেই যদি কেহ আমাকে ‘হিন্দু কে’ এই প্রশ্ন করে, তবে আমাকে নিপাক হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্রকৃত হিন্দু কাশ্যকেও দেখিতে পাই না। প্রকৃত হিন্দুর উচিত গুণসম্পন্ন যখন কাশ্যকেও দেখিতে পাই না, তখন বাধ্য হইয়া যে আমার সহিত এক সঙ্গে খায় অথবা আমার পায়ের নিচিহ্ন করে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। অতএব দেখেছ, এখন কেবল এই স্পষ্টাঙ্গাঙ্গ বিচার রহিয়াছে, মন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, লোকে আসল জিনিসটাই ভুলিয়াছে। চোর, লম্পট, মাংসাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাহে লইব, কিন্তু যদি একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভাল লোকের সঙ্গে বসিয়া খায় তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইহাতেই আমাদের দেশে ষোরভর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটী স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে আর

অলং সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্যশৌচ । আভ্যন্তর শুদ্ধি আশু কঠিন । আবশ্যক—সত্যাদিতা, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অতাবগন্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ।

কিন্তু আমরা সচরাচর করিয়া থাকি কি ? লোকে নিজের কোন কাজের জন্ত কোন বড় লোকের বাড়ী গেল এবং তাঁহাকে গরিবনাভাজ (গরিবের বন্ধু) প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিল । কিন্তু কোন গরিব সে বড় লোকের বাটীতে আসিলে তিনি হয়ত তাহার গলায় ছুরি দিতে প্রস্তুত । অতএব একরূপ ধনী ব্যক্তিকে গরিবনাভাজ বলিয়া সম্বোধন করা ত স্পষ্টতঃই মিথ্যা কথা । আর ইহাতেই আমাদের মনকে মলিন করিয়া ফেলিতেছে । এই জগতই শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া সত্য-

ভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশ বর্ষ, সত্যবাদিতা ।

কাল যদি তাঁহার মনে কখনও কুচিন্তার উদেক না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে । সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি আর যিনি নিজের অন্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারই ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয় । তুমি যে ধর্ম্মেরই সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখনা, দেখিবে—সকল ধর্ম্মেই ভক্তিরই প্রাধান্য আর সকল ধর্ম্মেই বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে । যদিও যাহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানগণ বাহ্যশৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোন রূপে কিছু না কিছু বাহ্যশৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে—তাহারা দেখিতে পায়, সর্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন ।

যাহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটা মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরের ভিতর একটা বাক্স রাখা হইত আর ঐ বাক্সের উপর ঈশ্বরের আবাহন হইত । ঐ বাক্সের উপর দুইটা স্বর্ণীয় দূতের মূর্তি রক্ষিত হইত । অনেক দিন হইল, যাহুদীদের

প্রতিমাপূজা ।

সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরণেই নির্মিত হইয়া থাকে আর এখন খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে ঐ বাক্সে এক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকসমূহ রাখা হয় । রোমান

ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহা বা যীশুর মূর্তি এবং তাহার পিতামাতার প্রতিমূর্তি পূজা করিয়া থাকে। গ্রেটেষ্টান্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ রূপে উপাসনা করিয়া থাকে। পারসী ও ইরাণিদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানগণ ভাল ভাল সাধু লোকের মূর্তি পূজা করিয়া থাকেন আর প্রার্থনার সময়ে কাবার দিকে মুখ ফিরান। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বহু সহায়তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন হৃদয় হৃদয়তর বিষয়-সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসত্ত্বো ভ্যামভাবস্ত মধ্যমঃ ।

স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাদমা ॥

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ—অধম, এবং বাহ্যপূজা অধমাদম।

কিন্তু এখানে এই কথাটী বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাদম হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই। সকলেরই উচিত—সে যা হা পারে, তাহাই করা। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্ত অথ কোনরূপে উহা করিবে। এই হেতু যে প্রতিমাপূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপানে পর্য্যন্ত আত্মাহরণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার উহা চাইই চাই। ষাঁহার সমর্থ তাহারা ঐ সকল ব্যক্তির চিন্তের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন—তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু বিবাদের প্রয়োজন কি ?

শাস্ত্র বলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাদিত্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভক্তি সম্ভব। পরাভক্তি লাভ হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যান। কখন

কখন লোকে ধন বা পুত্রলাভের জন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত কে ?

উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা স্মৃতিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তাঁহাকে সোণা করিতে পাবে, অমনি তাহার নিকট দলে দলে লোক ছুটতে থাকে। তথাপি তাহারা আপনাদিগকে

ভাগ্যবত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—পুত্রপাতের জন্ত; উহা ভক্তিপদবাচ্য নহে। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—পুত্রপাতের জন্ত; উহা ভক্তিপদবাচ্য নহে। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—স্বর্গপাতের জন্ত; উহা ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। এমন কি, যদি কেহ নরকবৃত্তি হইতে নিস্তার লাভের জন্ত তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাকেও প্রকৃত ভক্তি বলা যাইতে পারে না। ভয় বা কামনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন,—

‘ন ধনং ন জনং ন চ সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীধরে ভবতাক্তিরহৈতুকী স্বয়ি ॥

হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মাতৃসম্বন্ধে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সমুদয় দর্শন করে তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে। তখনই সে আত্মকৃত্ত্ব পরিত্যক্ত সৰ্ব্ব বস্তুতেই বিকৃত্ত্ব অবতীর্ণ দেখিতে পারে, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বৃত্তিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখনই, কেবল তখনই সে আপনাকে হানের হীন জানিয়া—প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহাব তখন আর বাহ্য অলঙ্কারাদি এবং তীর্থ ভ্রমণাদি প্রয়োজ্য থাকে না, সে প্রত্যেক মানবকেই যথার্থ দেবমন্দির স্বরূপ বিবেচনা করে।

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানাবিধে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিপাতের জন্ত যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন

আমরা উহার কোনটাই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে শ্রদ্ধাভক্তি অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হই না। দুষ্টাস্তরূপে ও উহা প্রকৃত হইবে। দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়া

ধাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব ? পিতা শব্দে সচরাচর বাহ্য বুদ্ধি, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতেই আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটি শব্দের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য আশোচনা



করি, তবে দেখিব, ঐ দুইটা শব্দের যথার্থতা সাধকিতা আছে । ঐ দুইটা শব্দ অত্যন্ত ভালবাসা দৃঢ়ক—প্রত্যন্ত ভগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন—ঐ ভালবাসা হইতেই ঐ দুইটা শব্দ নিঃসৃত হইয়াছে । রাসগানার রাধাক্রমের উপাখ্যান অলোচনা কর । ঐ উপাখ্যানে কেবল ভক্তের প্রকৃত ভাব বাক্ত হইয়াছে সংসারের আর কোন যেমই নব নারীর পরস্পর প্রেম হইতে আধক নহে । যেখানে এইরূপ ভালবাসা হয়, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, আর কোন আশঙ্কিত থাকে না—কেবল এক অচ্ছিন্ন বন্ধনে উভয়কে ওয়া বন্দি রাখে । পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা ভয় মিশ্রিত কাণ্ড, তাহাতে তাহাদের প্রতি প্রকার ভাব থাকে । ঈশ্বর কিছু ফল কামনা থাকুন বা নাই থাকুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা হউন বা নাই হউন, এ সকল জিনিষ আমাদের কি লাভ ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা সুতরাং এ সকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া আমাদের তাহাকে উপাসনা করা চাই । যখন মাতুষের সকল বাসনা পূরিয়া যায়, যখন সে অথ কোন বিষয়ের চিন্তা করে না, যখন সে ঈশ্বরের জন্ত উন্নত হয় তখনই মানুষ ভগবানকে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে । সংসারে প্রেমিক যেমন তাহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, এইরূপ ভাবে আত্ম-দিককে ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে । কৃত স্বাঃ ঈশ্বর-রাধা তাহার প্রেম উন্নত । যে সকল গ্রন্থে রাধাক্রমের উপাখ্যান আছে, সেই সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তাহা পরে বিবেচনা—কিভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে । কিন্তু এ অপূর্ণপ্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে ? অনেক ব্যক্তি আছে যাহাদের অন্তরের অন্তঃকণ্ঠটা পর্যন্ত পাপে পূর্ণ—তাহারা পবিত্রতা বা নীতি কামাকে বনে, জানে না । তাহারা কি এই সব তত্ত্ব বুঝিবে ? তাহারা কোন মতেই এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না । যখন লোকে মন দিতে সমুদয় অসং চিন্তা দূর করিয়া দিয়া নিঃশব্দ পবিত্রতার বায়ু সেবন করিতে থাকে, তখন তাহারা মুখ হইনেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষারও বহুত্ব খেদ করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু এ রূপ লোক সংসারে কয়জন—কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব ?

এমন কোন ধর্ম নাই, যাঁহা অসংসারকে কলুষিত না করিতে পারে । আনন্দের দোহাই দিয়া লোক অনাগ্রাসেই বলিতে পারেন, আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তখন দেহ ব্যতীত বাক্য না কেন, আত্মা তাহাতে

ধর্মমাত্রই ভাল, কেবল ভর-  
জ্ঞানবশতী অসং লোকের  
ছাড়াই উগা কলুষিত হয়।

কখনই লিপ্ত হন না। যদি লোকে যথার্থভাবে  
ধর্মের অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু কি মুসলমান  
কি খ্রীষ্টিয়ান—যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকই হউক  
না, সকলেই পবিত্রতার অবতারস্বরূপ হইত।

কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোকে মন্দ হইয়া থাকে—ইহা অস্বীকার করিবার  
যো নাই। কিন্তু সকল ধর্মই অসাপুলোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও কতক  
গুলি ব্যক্তি এমন আছেন, যাহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই উদ্ভক্ত হন—ঈশ্বরের  
শুণগান কীর্তন করিতে করিতে যাহাদের চকুতে প্রোয়াগ্নর আবির্ভাব হয়।  
এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

সংসারী লোক ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার নগদা মুটে স্বরূপ  
জ্ঞান করে। সে বলে, ‘ধন্য পিতঃ, আজ আমার দুপয়সা দিয়াছ—তজ্জ  
তোমার ধন্যবাদ দিতেছি।’ এইরূপই কেহ বলে,—‘ও ঈশ্বর, আমাদেশ ভরণ-  
পোষণের জন্ত আমাদিগকে আর্থায় প্রদান কর। কেহ বলে—‘হে প্রভো, অমুক  
অমুক কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইতেছি, ইত্যাদি। এইরূপ  
ভাবসমূহ একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র আকর্ষণী

শক্তি রহিয়াছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে  
ঈশ্বর পরম প্রেম স্বরূপ। সূর্য্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলই বিচরণ করিতেছে।

সেই আকর্ষণী শক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকলবস্তু—ভালমন্দ বাহ্যিকিছু—সবই  
ঈশ্বরানুগ্ৰহে চলিতেছে। আমাদের শরীরের মধ্যে বাহ্যিকিছু বাটতেছে,  
ভালই হউক, মন্দই হউক, সবই তাঁহার দিকে লইয়া বাইতেছে। একজন  
আর একজনকে কোন স্বার্থের জন্ত ভাল বাসিতেছে। বাহ্যিকিছু, নিজের  
জন্তই হউক আর অপরের জন্তই হউক, ভালবাসাই উহাদের সকলেরই মূল  
অভিগন্ধি। ভালই হউক, মন্দ হউক, ভালবাসাই সকলের প্রেরক। যদি  
জিজ্ঞাসা করা যায়, ঈশ্বর কি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমের  
অবতারস্বরূপ। সকলের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ, অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর প্রত্যেক  
বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত কোন বিশেষ  
সাধনপ্রণালী তিনি চান না। লোকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে তাঁহার  
দিকে চলিয়াছে। কোন রমণী যে তাহার স্বামীকে ভালবাসে, সে জানেনা যে,  
তাহার স্বামীর মধ্যে সেই মহা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—তাহাই, তাহাকে  
তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে। আমাদের চাই কেবল এই প্রেমের

ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে দৃষ্টা পাতা আদি মনে করি, ততদিন তাঁহার বার্ষপূজার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন ঐ সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের অবতারস্বরূপ চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে সকল অবলোকন করি, তখনই আমরা স্থায়ী ভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

শিয়ালকোটে স্বামীজির নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত। একদিন পার্শ্বপ্রদেশ হইতে ২ জন সাধুনী স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজির একটা বালিকা বিতালয় স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়ালকোটবাসীকে ঐ প্রস্তাব জ্ঞাপন করাইলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকগণেরদ্বারা একটা কমিটিও গঠিত হইল। এইস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বামীজি বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষা রমণী শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা হয়, উহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন আর যে কোন উপায়ে মহিলাগণ এই কার্যের উপযুক্ত হন, তাহারই আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায়ই হিন্দু বিধবাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্তা মীমাংসিত হইবে।

— :: —

## লাহোর।

এই নবেম্বর স্বামীজি সঙ্গিগণসহ শিয়ালকোট হইতে অপরাত্ন গাংটার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভা ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজা ধ্যানসিংহের গাবেলিটা লাহোরের মধ্যে। এই হাবেলিতেই বহুতা শুনিবার জন্য সর্বাধিক লোকের স্থান হয়। স্বামীজির শুভাগমন হইল। তথায় আসিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ ভোজনান্তে টিবিউনের তদানীন্তন সম্পাদক ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাটীতে গিয়া রাত্রি অবস্থান করিলেন।

আর্য্যসমাজও স্বামীজিকে অভ্যর্থনার ক্রটি করিলেন না। দয়ানন্দ এঙ্গলো-বেদিক্ কলেজের অধ্যক্ষ লাল হংসরাজ প্রভৃতি বড় বড়

আর্য্যসমাজীগণ সর্বদা অসুস্থ। তাঁহার সহিত নানারূপ চর্চা করিলেন। আর্য্যসমাজীরা বেদকে বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন আর ইহাও বলেন—যে বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই হইতে পারে। স্বামিজির মত কিন্তু বেদের উপনিষদভাগই বিশেষ প্রামাণ্য—এবং ঐ উপনিষদের ব্যাখ্যা—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, বৈতবাদী প্রভৃতি সমপ্রকার বাদিগণ আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোন হানি না, এবং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে—কারণ, মানুষকে জোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব দীর্ঘকালী হইয়া থাকে সেহ উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, দুইটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির তারতম্যানুসারে ঐ উভয়টাই সত্য হইতে পারে।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বরসঙ্কল্পীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-ধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্বত্র, সর্বশক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নিওণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মূর্তিপূজকেরও প্রত্যুদ্যেগ তাঁহাদের শরদ্রসম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামীজি অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিগকে বিজয় ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ বাতীত আর কোন মত টিকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তার পর দেখাইলেন—নিরাকার অথচ দণ্ডন ঈশ্বরের ধারণা—আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনা শক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। আর যদি আমাদের অক্ষমতা বশতঃ আমরা কল্পনাশক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম তখন যাঁহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাঁহারা যদি ইঞ্জিয়ার সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈশ্বরোপলব্ধি সহজে করিতে পারে, তবে তোমার তাঁহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায় মত সাধনা কর—কিন্তু অপর দুর্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশের দ্বারা স্বামীজি আর্য্যসমাজের গোঁড়ামী দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ২ ঘণ্টা ও অপরাহ্নেও প্রায় ১০ ঘণ্টা ধ্যামসিংহের হাবেলিতে সমাগত প্রায় ১৫০।২০০ পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের সহিত এতদ্রূপ নানাবিধ চর্চা হইত। এতদ্ব্যতীত স্বামীজির আবাস স্থান নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্ধ্যসমাজের মত—বেদের এক প্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে—সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নানাবিধ যুক্তিলাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন—হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছেন—অবশেষে স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, লালাজি আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি Fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (বাস্তবিক বিশেষকৈ অবতার বলিয়া আর তাঁহার আশ্রয় লইলেই যুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি গীর্ষ সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অজ্ঞাত গুরুভাইগণ সকলেই বন্ধপরিচর, একমাত্র আমি ঐরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণামুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু এই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। বাহা হউক, আমি চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি ইহাতে কোন ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গোঁড়ামি প্রচার করিব।

এইস্থানে প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজির সম্বন্ধীয় দুই একটা ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিতে চাই। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায়। স্বামীজির জনৈক শিষ্য যিনি এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।

স্বামীজি তাঁহার জন্মক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আশ্রয় করিতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বামীজি, আপনাকে মানে না। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভাল! লোক হইতে হইলে যে আমার বানিতে হইবে, ইহার মানে কি? সঙ্গীটা নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

এই সময় লাহোরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। এক দিন কোন কার্যোপলক্ষে উহার অন্ততম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু আসিয়াছেন। স্বামীজি দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ভায়ে খেলাধুলি ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহার এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ণ তেজ, প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন বললিয়া গেলেন—স্বামীজি যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্তা কহিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও যেন ততদূর সমুচিত হইয়া বাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামীজিকে সম্বোধিয়া অতি দীনতর বলিলেন, ‘ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব?’ স্বামীজি অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—‘ইঁারে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি? আমি কি হয়েছি? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।’ স্বামীজি এমন ভাবে কথাবার্তা বলিলেন যে, মতি বাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।

স্বামীজি লাহোরে ১০।১১ দিন যাত্রা ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল—আমাদের সমস্যাসমূহ (The problem before us)—কিন্তু স্বামীজি বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া এত অধিক লোকসমাগম হইল যে হলের ভিতর বক্তৃতা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে ফাঁকায় বক্তৃতা হওয়া স্থির হইল। কিন্তু লোকের গোলমালের দরুন স্বামীজি যতদূর সাধ্য উচ্চৈশ্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভার নিস্তব্ধতা আনয়নে সক্ষম হইলেন না। সেই জন্ত প্রায় বেড় বক্টা বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ করা হইল। বক্তৃতার বিষয় বাহা ছিল, তাহা সমুদয় বিস্মৃত করা হয় নাই, এইজন্য ইহা ‘হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি’ (Common Basis of Hinduism) নামে প্রকাশিত হয়। আমরাও উহা ঐ নামে প্রকাশিত করিলাম।

‘শক্তি’ নামক দ্বিতীয় বক্তৃতাটা মতিবাবুর সার্কাসপ্রদর্শনে হইয়াছিল। আমরা এইবক্তৃতার সম্পূর্ণ রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এইবক্তৃতা

সম্পূর্ণ হইতে না হইতে স্বামীজি কোন কারণে বক্তৃতা বন্ধ করেন। সুতরাং ইহাতে ভক্তির উচ্চাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ পান নাই। স্বামীজি হউক, স্বামীজি এই বক্তৃতার প্রসঙ্গক্রমে বলেন—‘সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম এই—বাহার বাহা সাধ্য, তদনুসারে রাস্তায় বাহির হইয়া একটা, দুইটা, ছয়টা, ষারটা যতগুলি পারে ‘সুধার্ত্ত নারায়ণ’কে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া খাওয়ান, পরাণ—এক কথায় লোকে প্রতিমার ঘেরপড়াতে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ববিধ উপায়ে তাহাকে পূজা করা। যাহুযই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সুতরাং যাহুযে ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—আর ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ সকল স্থলে দাতা অপেক্ষা গ্রহীতার আসন শ্রেষ্ঠ, কারণ, সেই সময়ের জন্য সে সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। স্বামীজি আরও বলেন, তিনি অনেক দেশে দান ধর্মের অমূল্যতা দেখিয়াছেন, কিন্তু যে ভাবে ঐ দানধর্ম অমূল্য হইয়া থাকে, তাহাই উহার অসাফল্যের কারণ। ‘ওরে বেটা, এই নে, যা—পালা।’ যতক্ষণ পর্যন্ত দান করিয়া নাম বশ লাভের বাসনা থাকে, সে দানকে দানই বলা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামীজির এই দুই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ধ্যানসিংহের হাবেলীতে তৃতীয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। এবারে সভায় গোলমাল না হয়, একমুখ বিনা মূল্যে টিকিট বিতরণের বন্দোবস্ত হইল এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইল। লাহোরের সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সার্বগর্ভ বক্তৃতাটি প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরিয়া হয়। সকলেই শেষ পর্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা শ্রবণ করেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি (বাহালী) এই বক্তৃতা শুনিবার পর বহুবাক্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—~~হাঁ, এই বক্তৃতা~~ ‘হ্যাঁ’ আছে। ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ “বেদান্ত” বক্তৃতা। আর এক দিন স্বামীজি লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটা সভা স্থাপন করিলেন। সভা স্থাপনের পূর্বে স্বামীজি অতি বিশদভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থন সভাটা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে হইল—অপরূহ পড়াশুনা হইতে অবকাশ পাইবার পর যুবকগণকে ‘দরিদ্রনারায়ণ’গণের সেবা করিতে হইবে—যাহাকে ~~সুধার্ত্ত~~ সুধার্ত্ত পায়, পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, ~~সুধার্ত্ত~~ সুধার্ত্ত ভাবে এইরূপ কার্য করিয়া যাইবার চেষ্টাই সভার উদ্দেশ্য হইল।

আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। সনাতন সভার সভ্যেরা এই কারণে স্বামীজিকে ‘শ্রাদ্ধ’ বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিবার জন্ত বিশেষ অমুরোধ করিতে লাগিলেন। নানা কারণে স্বামীজির এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতন সভার কর্তৃপক্ষগণের সনির্ভর অমুরোধে অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে সন্মত হইলেন। এই দিন পঞ্জাবিগণ আরও স্থির করিয়াছিল যে, স্বামীজিকে লইয়া নগরসংকীৰ্ত্তন করিবে। পঞ্জাবীদের সংকল্প ছিল যে, স্বামীজিকে তাজামে চড়াইয়া সঙ্কীৰ্ত্তনের সঙ্গে সহর প্রদক্ষিণ করাইবে। স্বামীজি তাজামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু নগরসঙ্কীৰ্ত্তনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্কীৰ্ত্তনের নিকট বলিয়াছিলেন, পঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় গুচ্ছ—যদি এইরূপ সঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এই জন্ত স্বামীজি সঙ্কীৰ্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং বাঙ্গালীগণকে নিশান প্রভৃতির আয়োজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক স্বামীজি সঙ্কীৰ্ত্তন সহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হানেলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্কীৰ্ত্তনের উদ্যোক্তৃগণ নাই। পরম্পরায় শুনা গেল, লাহোর সহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—তাহাও ব্যবহারভাবে এতদিন অমনি পড়িয়া খারাপ হইতেছিল। তাহাতে এক ঘা চাঁটি দিবামাত্র উহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। সঙ্কীৰ্ত্তন না হওয়াতে ‘শ্রাদ্ধ’সম্বন্ধে বক্তৃতাও স্বামীজি দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, আজ আর বক্তৃতা হইবে না। কয়েকজন ব্যক্তি স্বামীজির বাসস্থান পর্য্যন্ত গিয়া শ্রাদ্ধসম্বন্ধে স্বামীজির সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। স্বামীজিও শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিলেন।

আর এক দিন অপরাহ্নে একটা Evening Party হইয়া লাহোরের বাস্তব লোকগণের সহিত স্বামীজির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লাহোরের চিফ জষ্টিশ প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অত্যন্ত অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামীজিকে ও তাঁহার সঙ্কীৰ্ত্তনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ধাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চা হইত। অনেক প্রশ্নান প্রশ্নান ব্যক্তি স্বামীজির নিকট গুপ্তভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকটবর্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামীজি এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ



ফল মূল মিষ্টান্নাদি দ্বারা তাঁহারা স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামীজির মধুর অথচ শিক্ষাগ্রন্থ উপদেশাবলি শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

লাহোরের শিখ সম্প্রদায় একটা দেশের পরম কল্যাণকর অনুষ্ঠানে বদ্ধ পয়সিকর হইয়া ‘শুদ্ধিসভা’ নামক সভাস্থাপন করিয়াছেন। যে সকল শিখ কোন কারণে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ সে একরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণসহ এই সভায় গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা স্ত্রীহং কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ দুইজনকে গুরু করা হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা আত্মপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিদয়—অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখ ধর্ম্মদীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরু গোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থ সাহেবের পবিত্র মন্ত্র সকল পাঠ ও পবিত্র বারি সেচনে উহাদিগকে ‘গুরু’ করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়াপ্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামীজি শিখদিগের এইরূপ উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।

এইরূপে লাহোরে ১০।১২ দিন কাটয়া গেল। স্বামীজি সর্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ রোঁক দিতেন।

লাহোরে প্রথম বক্তৃতা।

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ।

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্য্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত—এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—আমাদের মহুমহারাজ যাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখান হইতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্ম প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অমুরাগ প্রসূত হইয়াছে—ভবিষ্যতে যাহা (ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী) সমগ্র জগৎকে তাহার গবল বস্তায় তপাইয়াছে। এই সেই ভূমি—যেখানে

ইহার বেগশালিনী স্রোতধিনিকুলের জায় চতুর্দিকে বিভিন্ন আবারে প্রবল ধর্ষাধুরাগ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বহু নির্যোযে উহার মহীরসী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই সেই বীরভূমি—যাহা বহির্দেশ হইতে ভারত বতবার পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত।

অসত্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা এত দুঃখ নির্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। এখানেই পরবর্তী কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ণ বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কবার্ট খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্য্যন্ত—আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ চিহ্ন-স্বরূপ অথচ মহামহিমাবিত গুরু গোবিন্দসিং জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্ত নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়া—যাহাদের জন্ত এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাও যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তখন মর্দ্যাহত সিংহের জায় দক্ষিণদেশে বাইয়া নির্জনবাস আশ্রয় করিলেন আর নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিলাষ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া, শান্তভাবে এ মর্ত্যধাম হইতে অপস্থত হইলেন।

হে পঞ্চদশ দেশের সন্তানগণ, এখানে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্য্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ, আমি অতি অল্পই জানি যে, তোমাদিগকে শিখাইব। আমি পূর্বদেশ হইতে পশ্চিম দেশীয়

ভ্রাতৃবর্গের সহিত সন্তাষণ করিতে আসিয়াছি আলাপ করিতে আসিয়াছি, পরস্পরের ভাব মিলাইবার নিকট কি ভাবে জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্ত আসিয়াছি।

নহে, আমি আমাদের মিলনভূমি কোথায়, তাহাই আন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াছি—বুঝিবার চেষ্টা করিতে, কোন্ তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাতৃত্বেরে আবদ্ধ থাকিতে পারি কোন্ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে—যে বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমা-

দিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে—তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। আমি এখানে আসিয়াছি—তোমাদিগের নিকট কিছু গড়িবার প্রস্তাব করিতে কিছু ভাবিবার পরামর্শ দিতে নয়।

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু জিনিষ গড়িবার জন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময়ে সময়ে সমালোচনা—এমন কি, কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্ত। অনন্ত কালের জন্ত কার্য—উন্নতির চেষ্টা—গঠন—সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য বিনাশ বা ভাঙ্গাচোরা নহে। প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া নাহে, গঠন।

আমাদের দেশের সর্বত্র সমালোচনার বজা বহিয়াছে—পশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় প্রদেশসমূহের উপর পড়িয়া আমাদের আনাচে কানাচে, গলি ঘুঁজি গুলিতেই অস্ত্রাস্ত্র স্থান অপেক্ষা যেন সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছে। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের সর্বত্র মহা মহা মনীষিগণ—শ্রেষ্ঠ গৌরবান্বিত সত্য ও ত্রায়াহুরাগী মহাত্মাগণ উঠিয়া—হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্বোপরি, ঈশ্বর ও ধর্মের জন্ত প্রবল অহুরাগ লইয়া—যেহেতু এই মহাপুরুষগণ এত গভীরভাবে দেশকে ভালবাসিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা দেশের জন্য এত গভীর ভাবে অগ্রতপ করিয়াছেন, সেই হেতুই—তাঁহারা দেশের বাহা কিছু মন্দ বুঝিয়াছেন, তাহাকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন; কিন্তু আজ আমাদের এক মহাবাহী বলিতেছে—যথেষ্ট হইয়াছে, সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রীভূত করিবার তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে আর সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন বাঁড়ী পরিকার হইয়াছে; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ সাক্ষ হইয়াছে; আর্ঘ্য সন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

ভদ্রযহোদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের সম্মুখে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত নহি। আমার বকে সকল সম্প্রদায়ই বহানু ও

মহিমায়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি আর  
হিন্দু। আমি সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য,

যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অহংএবং অদ্য-  
স্বার্থে আমার সঙ্কল্প এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব,  
যে গুলিতে আমরা সকলে একমত ; যদি সম্ভব হয়, আমাদের পরস্পরের  
সম্মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব আর যদি ঈশ্বরের রূপায় ইহা  
সম্ভব হয়, তবে অবিলম্বে উগ্ৰ অবলম্বন করিয়া কার্যে পরিণত করিতে  
হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনরূপ মন্দ অর্থে ব্যব-  
হার করিতেছি না, আর যাহারা বিবেচনা করে, ইহার কোনমন্দ অর্থ আছে,  
তাহাদের সহিতও আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাধারা  
কেবল সিক্কুনদের পরপারবর্তী লোকগণকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমা-  
দিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যা  
করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা নিগেঞ্জই  
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি—হিন্দু নাম সর্ববিধ মহিমায়, সর্ববিধ  
আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই উহা ঘৃণাহৃচক নামেই  
পর্যবসিত হইবে—উহাধারা পদদলিত, অপদার্ব। ধর্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে।  
যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝুক। এস আমা-  
দের কার্যের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা  
হইতে উচ্চতর শব্দ আবিষ্কারে সমর্থ নহে। যে সকল নীতি অবলম্বনে  
আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে,—তন্মধ্যে একটী এই যে, আমি কখন  
আমার পূর্বপুরুষগণকে শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর  
অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম ; কিন্তু আমি তোমা-  
দিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লইয়া  
আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে  
গৌরব অশ্রুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীত কালের আলোচনা  
করিয়াছি, ততই আমি অধিক পশ্চাদ্ধৃষ্টিপরায়ণ হইয়াছি, ততই আমার  
হৃদয়ে এই গৌরববুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের  
বৃদ্ধি ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর গুলি হইতে উত্তীর্ণ করিয়া  
আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণের মহান্ অতিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে  
নিবৃত্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আৰ্যদিগের সম্মানগণ, ঈশ্বরের রূপায়

তোমাদেরও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া ঘাউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক ।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের ঠিক মিলনভূমি কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্মরণ রাখিতেই হইবে । যেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে । যেমন একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে । আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ ভূতকর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহাষ্ট । প্রত্যেক জাতিকেই এক একটি

দৈবনির্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই আমাদের জাতীয়ত্ব

কোথায় ?

জাতিকেই ব্রতবিশেষের উদ্ঘাপন করিতে হয় । অতএব প্রথম হইতেই আমাদের কাছে আমাদের জাতীয় ব্রত কি, তাহা জানিতে হইবে, বিধাতা ইহাকে কি কার্যের জন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় উন্নতি ও অধিকারে, ইহার স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে হইবে, বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের ঐক্যতানে ইহা কোন সুর বাজাইবে, তাহা জানিতে হইবে । আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে—তুমি সাপটাকে বাহা ইচ্ছা করিতে পার, যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোন মতে মারিতে পারিবে না । আমরা অনেক রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি । তাহাদের শ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থাকিত । যতদিন এই পাখীটা মারিতে না পারিতেছে, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেল, তাহাকে বাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না । জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব আর তাহাতে যতদিন না বা পড়ে, ততদিন

সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসে এই অতি অদ্ভুত ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। বর্ষের জাতির আক্রমণ তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে। শত শত বর্ষ ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর রবে' ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, আর সকলেই ইহার আসন্ন বিনাশ জানিয়া বিষন্ন হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে যত অত্যাচার পীড়িত ও নিগৃহিত দেশের কথা শুনা যায়, তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাধিক অধিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও একরূপ তাহাই আছি, এখনও আমরা হুতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; শুধু তাহাই নহে—সম্প্রতি আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা নহে, আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব প্রদানে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিপ্লুতিই জীবনের চিহ্ন। আমরা আজ দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু আমাদের ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, উহার বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অজ্ঞাত জাতির মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় চিন্তা গুরুতর আসন পাইতেছে। ইহার কারণ এই,—ভারত সমগ্র জগতের উন্নতির সমষ্টিতে যে মহৎ দান করিয়াছে, মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত থাকিতে পারে, তন্মধ্যে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম অর্থাৎ দর্শন ও ধর্ম।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন—অজ্ঞাত সকলের স্তায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই একথা জানি আর সেই প্রকাশও মস্তিষ্কশালী অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—বেদের মধ্য হইতে সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে;—

‘সাপরা যয়া তদক্ষয়মধিগম্যতে ।’—

তাহাই পরা বিদ্যা যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে লাভ হয়। এই পরিবর্তনশীল, অশাশ্বত, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু চুঃখ শোকপূর্ণ এইজগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে; কিন্তু যিনি অপরিণামী, আনন্দময়, একমাত্র যথার শাস্ত্রের অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনন্ত জীবন ও পূর্ণতা, একমাত্র বাহ্যিক

নিকট বাইলে সকল হুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। বাহাই হউক, ইচ্ছা আমাদের পূর্বপুরুষগণ করিলে তাঁহারা অনায়াসে সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল ইচ্ছা করিলে বহির্জগতের উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা উহা অসার বুঝিয়া অন্তর্জগতে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্বোক্ত পথ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্বোক্ত পথ হইতে উহাতে অনন্তগুণে আনন্দ; ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা একদিক একনিষ্ঠ ভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এক্ষণে উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিত বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন ধর্ম ও হিন্দু এই দুইটি শব্দ একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘা দিবার যো নাই। বর্ষেরজাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্ষের ধর্মসমূহের আমদানি করিয়া—একজনও এই সাপের মাথার মশি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখীকে মারিতে পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই জাতির বিনাশ সাধনে সক্ষম। যতদিন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও হুঃখের অঘিরামির মধ্য হইতে প্রহ্লাদের জায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। অত্যাচার দেশে রাজনীতি চর্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার আত্মসজ্জিক সে একটু আধটু ধর্মের অহুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে এই ভারতে—আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ধর্মাহুষ্ঠান তার পর যদি সময় থাকে, তবে অত্যাচার জিনিষ

ভাহার সঙ্গে অঙ্কিত হয়—হানি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাঙ্গ করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই আমাদের প্রথমেই আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তিকে ঝুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির একত্রীকরণই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের এক মাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একবিধ আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতে জাতি গঠিত হইবে।

ভক্তমহোদয়গণ, এদেশে যথেষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতে আরও হইবে। কারণ, আমাদের ধর্মের ইহাই বিশেষ যে, মূল তত্ত্বগুলি এত উদার যে, যদিও উহা হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার বাহির হইয়াছে, কিন্তু উহারা এমন তত্ত্বসমূহেরই বিকাশস্বরূপ যেগুলি আমাদের মস্তকোপরি বিদ্যমান আকাশের জায় উদার এবং প্রকৃতির জুলা নিত্য ও সনাতন। অতএব সম্প্রদায় যে স্বাভাবতঃই চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতার জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একজন ব্যক্তি কিছু সব কায করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রায় শক্তিরূপী অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয় বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের তিতর সম্প্রদায় ভেদরূপ এই শ্রম বিভাগ অবশ্যস্তাবীরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সুপরিচালনের জন্ত সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর

বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক।

প্রাচীন শাস্ত্র সকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, এই সকল আপাতদৃষ্টে বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ সকলের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে, ঐ সকলগুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন,—‘একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি’, জগতে একমাত্র বস্তুই বিদ্যমান—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন, এই ভারতে যদি এখনও এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই ঘেষহিংসা



ধাকে, তবে কিছু আমাদেরকে, বাহারা সেই মহিমাযিত পূর্ণগুরুগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয় ।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান মতে আমরা সকলেই এক,—আমরা বৈষ্ণব হই বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বৈদান্তিকগণের বা আধুনিকগণের বাহাদেবই হউক, পদাঙ্ক-  
 হিন্দুসম্প্রদায়সমূহের সরণ করি, প্রাচীন গৌড়া সন্ন্যাসেরই হই অথবা আধু-  
 সন্মিলন ভূমি প্রথম নিক সংস্কৃত সম্প্রদায়েরই হই, যেই আপনাকে হিন্দু বলিয়া  
 বেদ । পরিচয় দেয়, সেই আমার বিশ্বাস কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস

করিয়া থাকে । অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা প্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত ; কারণ, আমরা সকলকেই আমার নিজে রতানে আনিতে পারি না—এরূপ চেষ্টাই পাপ—আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা লইতে হইবে বা সকলকেই আমার প্রণালী অবলম্বনে চলিতে হইবে, জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ । ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাহারা এখানে একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি । আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত, প্রকৃতির যেমন আদি নাই অন্ত নাই, ইহারও তরুণ আর যখনই আমরা এই পবিত্রগ্রন্থের পাদপদ্ম স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিবন্ধিতার অবসান হয় । আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসক—শেষ বিচারকর্তা এই বেদ । বেদ কি এই লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে । কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অগ্র অংশ হইতে পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে । কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদ বিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই অর্থাৎ এই সনাতন পবিত্র অপূর্ণ গ্রন্থ হইতেই আজ আমাদের পবিত্র, মহৎ, ভালো বাহা কিছু আছে, সব আসিয়াছে । বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তবুটাই এই ভারতভূমির সর্বত্র প্রচারিত হউক । ইহাই যদি হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধাত্যের অধিকারী, এবং বেদের যে প্রাধাত্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক । অতএব আমাদের সন্মিলনের প্রথম ভূমি বেদ ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী

শক্তি—বাহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগৎ-প্রকাশরূপ এই অদ্ভুত প্রণকরূপে বহির্গত হয়, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্নভিন্নরূপ হইতে পারে—কেহ বা হয়ত সম্পূর্ণ সমগ্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা আবার সমগ্র অঞ্চল অমানবভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নিষ্কর্ণ ঈশ্বর মানিতে পারেন আর সকলেই বেদ হইতে নিজনিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই সকল ভেদ সত্ত্বেও আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অতঃপর

দ্বিতীয়—ঈশ্বর।

কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অস্ত্রে সকলেই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে এই তব্ধীও ভারতভূমির সর্বত্র প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে ভাবই ভূমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু বেঙ্গপেই হউক, তোমায় ঈশ্বর প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। উহাদের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ধারণাটি অপরটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও, ইহার কোনটাই ধারাপ নহে। একটা উৎকৃষ্ট, অপরটা উৎকৃষ্টতর, অপরটা উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দনিচয়ের মধ্যে মন্দ শব্দটীর স্থান নাই। অতএব ঈশ্বরের নাম যিনি যে ভাবে ইচ্ছা প্রচার করেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্বাদভাজন। তাহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সম্মানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক—এই ঈশ্বরের নাম দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনি শ্রেষ্ঠ উচ্চতম সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় ভাব যাঁহা আমি তোমাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এই—জগতের অজ্ঞাত জাতির মত আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্বে স্রষ্ট হইয়াছে আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মাও এই জগতের সঙ্গে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত হইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি

তৃতীয়—স্বপ্নবাদ। অনন্ত; তবে কল্পান্তে এই স্থূল বাহু জগৎ স্ফাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার বাহির হইয়া প্রকৃতিনামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে আর এই তরঙ্গাকার গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

আরও সকল হিন্দুই বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি, তাহার অভ্যন্তরস্থ মন নামধেয় সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত মাহুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানব এইগুলি হইতেও শ্রেষ্ঠতর। কারণ, স্থূলদেহ পরিণামী, মনও তরুণ কিন্তু এতদুত্তরের অতীত আত্মা নামধেয় সেই অনির্বচনীয় বস্তুর [ আমি এই ‘আত্মা’ শব্দটির ইংরাজি অনুবাদ করিতে অক্ষম—যে শব্দের দ্বারা ইহার অনুবাদ করা যাক না কেন, তাহা ভুল হইবে ] আদি অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক অবস্থাটির সহিত উহা পরিচিত নহে। তারপর আর একটি বিশেষ বিষয়ে অন্তান্ত জ্ঞাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ, তাহা এই যে, আত্মা এক দেহ অবসানে অল্প এক দেহ ধারণ করে—এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না—তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর তাৎক্ষণিক জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রের সংসারবাদ বা পুনর্জন্মবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে

চতুর্থ—আত্মতত্ত্ব ও পূনর্জন্মবাদ। পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্যভেদ সম্পন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেট অনন্ত বহির স্ফুলিঙ্গ মাত্র হইতে পারে, অশ্রের মতে হয়ত উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এট আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে—আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, স্মৃতরাং কখনই উহার নাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে হইবে, অবশেষে মহাব্যাপারী ধারণ করিয়া পূর্ণ লাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদসাধক, ধর্ম্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্বতম আবিষ্কার-স্বরূপ তত্ত্বটির কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমানের মধ্যে বাহারা পাশ্চাত্যতত্ত্বাশির আলোচনার বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটা মৌলিক প্রভেদ—বাহা কিছু প্রাচ্য, তাহা হইতে বাহা কিছু পাশ্চাত্য—তাহাকে যেন এক কুঠায়াবাত্তে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তাহা এই যে,—আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি,—আমরা শান্তই হই, সৌর্যই হই, বৈষ্ণবই হই, এমন কি, বৌদ্ধ বা হৈননই হই,—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্বভাব, অনন্তশক্তি ও আনন্দময়। কোন দ্বৈতবাদীর মতে, আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দস্বভাব ভূত অসংকল্পিত সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার খুলিয়া বাইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে, আত্মা কিছুদিনের জন্ত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, এ ধারণাটীও আংশিক ভ্রমাত্মক—স্বাভাবিক আবরণ দ্বারাই আমরা ভাবি যে, আত্মা তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু পক্ষম—আত্মা সল পূর্ণস্বভাব। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমুদয় শক্তিই তখনও পূর্ণ প্রকাশ থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বঙ্গদৃঢ় প্রাচীর ব্যবধান। প্রাচ্য জাতি বাহা কিছু মহৎ, বাহা কিছু ভাল, তাহার জন্য অন্তরে অন্বেষণ করে। উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্ত চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি তাহার ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্মপুস্তক-সমূহ Inspired (in—ভিতরে, spirare—শ্বাসক্রিয়া করা—সুতরাং শ্বাস গ্রহণের স্থায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে।) আমাদের ধর্মশাস্ত্র সমূহ কিন্তু Expired (শ্বাস পরিত্যাগের স্থায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে) —ঐগুলি ঈশ্বর নিঃস্বসিত—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের হৃদয় হইতে উহারা নিঃসৃত হইয়াছে।

এইটাই একটা প্রধান বুঝিবার জিনিষ আর হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার ভাইগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে বায়বার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্ত অহরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিব্যরাত্র আপনাকে হীন ভাবে, তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিব্যরাত্র আপনাকে দীনদুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি ভূমি বল—আমার মধ্যেও শক্তি আছে,

তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে—আর যদি তুমি বল, আমি কিছু নই, ভাব যে, তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে, তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও ‘কিছু না’ হইয়া পড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটা তোমা-  
আত্মার আভাবিক পূর্ণত্বে দেব স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তি-  
বিশ্বাসের মহৎ ফল।

মানের সম্ভান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ-  
স্বরূপ। আমরা ‘কিছু না’ কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব, সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদেরকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ফলস্বৰূপ এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চালনীরূপ শক্তিই তাহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর করাইয়াছিল আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যেদিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের মধ্য দিয়া কার্য করিতেছেন? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্বব্যাপী অন্তর্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ মন আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পার? আমি হয়ত একটা ক্ষুদ্র জলবৃদ্ধ, তুমি হয়ত একটা পর্বতপ্রায় তরঙ্গ; হইলই বা। সেই অনন্ত সমুদ্র তোমারও যেমন, আমারও সেইরূপ আশ্রয়। সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন, আমারও তরঙ্গ অধিকার। আমার জন্ম হইতেই, আমারও যে জীবন আছে,—ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্বতপ্রায় উচ্চ তোমার জায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সম্ভানগণকে তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহাবিধায়ক উচ্চ, মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার আবশ্যিকতা নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে কোন বাদ শিক্ষা দাও; আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি—আত্মার পূর্ণস্বরূপ এই অদ্বৈত মতটী ভারতে সর্বসাধারণে—সকলেই ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল যেমন বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে উহা কখনই পরে পবিত্রতা লাভে সক্ষম হইবে না; কারণ যে স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহা লাভ

করিলেও আবার উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্ত সে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তথাপি চিরকালের জন্তই তাহাকে অপবিত্র থাকিতেই হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে, আর আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। অতএব আমাদের সকল দার্শনিকগণ বলেন, পবিত্রতাষ্ট আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে; পূর্ণতাই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নহে—আর এইটী স্বরণ রাখিও। যুক্ত্যকালে সেই মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যাবলি ও উৎকৃষ্ট চিন্তারাশি স্বরণ করিতে বলিতেছেন—এই স্মৃতির দৃষ্টান্তটী স্বরণ রাখিও।\* কই তিনি ত তাঁহার মনকে তাঁহার সমুদয় দোষদুর্জলতা স্বরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষদুর্জলতা, যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্বরণ কর—ইহাই ঐ দোষদুর্জলতা প্রতীকারের একমাত্র উপায়।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্বকথিত কয়েকটা ধর্মমত ভারতের সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে

এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার—প্রাচীন-  
প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত পন্থী বা নব্যপন্থী—সকলেই সম্মিলিত হইবেন; কিন্তু  
ধর্ম। সর্বোপরি, আর একটি বিষয় স্বরণ রাখা আবশ্যক—

আর আমি হৃৎকেন্দ্র সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই—তাহা এই যে, ভারতে ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি—তাহা না হইলে উহা ধর্ম নামেরই যোগ্য নহে। ‘এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত’, একথা আমাদেরকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না; কারণ, আমরা ও কথার বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠিত করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজ চেষ্টায় হইয়াছ। স্মৃতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী বাণী আবির্ভূত হইয়াছে—‘অনুভূতি’ আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, ‘এই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।’ খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—আগাগোড়া সত্য। ধর্ম সাফাং করিতে

\* ওঁ ক্রতো অর কৃতং অর ক্রতো অর কৃতং অর। (ঈশ উপনিষদ।)

হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল ভোতা পাখীর মত কতকগুলি মত মুখস্থ করিলেই চলিবে না। কেবল বুদ্ধির সার হইলে চলিবে না, ধর্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। এইজন্ত প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইহাই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে, তাহা নহে—আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তিসমূহ আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মার বিশ্বাসী, তাহা নহে আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন বর্তমান কালেও খুঁজিলে অনন্তঃ দশজনও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানব ঈশ্বর দর্শন করিতেছে, যতদিন না সে নিজ আত্মার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্বাগ্রে এই বিষয়টী আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে আর আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার হ্রাস হইবে। কারণ, সেই প্রকৃত ধার্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নত্বে সর্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়েন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

তাহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কেবল তাহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, একমাত্র তিনিই কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হন যিনি তাঁহাকে দেখেন, যিনি অতি নিকটতম এবং দূর হইতেও দূরবর্তী।

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্ম্মানুভূতি মনে করি; তাই

সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই সাম্প্র-  
দায়িকতা দূর করিবার  
প্রকৃত উপায়।  
বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা হইলে আমরা নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে

চেষ্টা করিব—আমরা ধর্ম্মের সত্য সমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেদেরই অন্ধকারে ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইতেছি। তাহা হইলেই সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। যখনই কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উত্তত হয়, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর ‘তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ ?’, ‘তুমি

কি আশ্বদর্শন করিয়াছ ?' যদি না করিয়া থাক তবে তোমার তাঁহার নাম প্রচারে কি অধিকার ? তুমি নিজেই অন্ধকারে রহিয়াছ,—আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ। অন্ধের দ্বারা নীরমান অন্ধের স্থায় আমরা উভয়েই যে থানায় পড়িয়া যাইব। অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও। তুমি যেপথে অগ্রসর হইয়া ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছ, তাহাদিগকেও সেই পথে অগ্রসর হইতে দাও ; তাহারাও নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ণ আনন্দের আশ্বাদ পাইবে। ভারতের প্রত্যেক ঋষি, যে কেহ সত্যকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে যাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাঁহারই সাক্ষাৎ পাইবে। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে ; কারণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ তিনি সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখনই, কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু' এই শব্দটি এবং প্রত্যেক হিন্দুনাথধারী ব্যক্তিকে প্রকৃতরূপে চিনিতে, হৃদয়ে ধারণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে ও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই, কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন ওই নামটি তোমার ভিতরে মহা বৈজ্ঞানিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে ; তখনই

কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে যখন  
 প্রকৃত হিন্দু কে— যে কোন দেশীয়, যে কোন ভাষাভাষী হিন্দুনাথধারী  
 গুরুগোবিন্দ সিং। হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে ;

তখনই, কেবল তখনই তুমি কেবল হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামধারী যে কোন ব্যক্তির চুঃখকষ্ট তোমার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেকোন উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে ; তখনই কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন সহ করিতে প্রস্তুত হইবে—ইহার মহান দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের সেই মহান গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার পূর্বেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্ত নিজ শোণিত পাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন—অবশেষে যাহাদের জন্ত আপনাতঃ এবং আপনার আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহাঁরাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—অবশেষে এই আহত



কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে দীরভাবে অপস্থত হইয়া দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমারা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিং হইতে হইবে। তোমরা তাঁহার ভিতর সহস্র সহস্র দোষ দর্শন করিতে পার, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে হিন্দুরক্ত ছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও। তোমাদিগকে প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেবগণের পূজা করিতে হইবে। যদিও তাহারা সর্বপ্রকারে তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করে, যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ কর। যদি তাহারা তোমায় তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দ সিংহের মত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিশ্চরতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এইরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

লোকে ‘ভারত উদ্ধার’ যেরূপে হয়, তাহার বাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারাজীবন কার্য্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—

‘ভারত উদ্ধারের প্রকৃত’  
উপায়।

আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। শুধু ভারতের নহে,—ইহার উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তিপরিপ্যস্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের অদৃঢ় বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অটালিকা পর্য্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্বের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—তাহারা জগতের নিকট বোষণা করিয়াছিল—মানব জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য ভাষায় মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে,—‘মামুষ আত্মা ত্যাগ করিল’ (A man gives up the ghost) আমাদের ভাষায় কিন্তু বলে, সে দেহত্যাগ করিল। পাশ্চাত্যদেশীয় লোকে নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই দেহকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তার পর তাহার একটি আত্মা আছে বলিয়া

প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি অধ্যায়-  
বাদ—পাশ্চাত্যের জড়বাদ  
—উহার দৃষ্টান্ত ।

উল্লেখ করে ; কিন্তু আমরা প্রথমতঃই আপনাকে  
আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তার পর আমার একটা  
দেহ আছে এই কথা বলি। এই দুইটা বিভিন্ন বাক্য  
আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও  
পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর কত পার্থক্য। এই কারণে যে সকল সভ্যতা দৈহিক  
সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদিরূপ বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা অল্পদিনমাত্র জীবিত  
থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অস্ত্রান্ত্র  
যে সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও  
জাপান—ইহারা এখনও জীবিত, এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরুত্থানের  
লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন রক্তবীজের ত্রায়—সহস্রবার তাহা-  
দিগকে নষ্ট কর—তাহারা আবার জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত  
হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার  
নষ্ট হইলে আর উঠে না ; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে  
চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্য্যধারণপূর্বক অপেক্ষা কর ; ভবিষ্যৎ গৌরব  
আমাদের জন্ত সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না ; অপর কাহারও অমুকরণ করিতে যাইও না। আমা-  
দিগকে এই আর একটা বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অমুকরণ  
সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে  
অন্ধ অমুকরণ পরি-  
ত্যাগ কর।

রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি  
আমি রাজা হইব ? সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দভ কখন সিংহ  
হয় না। অমুকরণ—হীন, কাপুরুষের ত্রায় অমুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ  
হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে  
স্বপ্না করিতে আরম্ভ করে, তখন বৃদ্ধিতে হইবে, সে শেষ ঘা খাইয়াছে আর যখন  
সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন তাহার বিনাশ  
আসন্ন বৃদ্ধিতে চাইবে। এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি ;  
তথাপি আমি আমার জাতির, আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অমুভব  
করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অমুভব করিয়া  
থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব্ব অমুভব  
করিয়া থাকি। আমি যে ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমাময় পূর্বপুরুষগণের  
বংশধর তোমাদের স্বদেশী, ইহাতে আমি গর্ব্ব অমুভব করিয়া থাকি। অতএব

তোমরা আত্মবিধানসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাবধীনে কার্য্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি, চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত হারাইবে।

তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজশক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদের নিকট অপরের নিকট শিথিল হইবে।

অথচ অপরের নিকট শিক্ষা  
করিতে হইবে।

কিন্তু যেমন বীজ মাটিতে পুতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রসসংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীকূহে পরিণত হয়, তখন কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, উহা তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এই পথের অনুসরণ কর। বাস্তবিক অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন,—

আদদীত পরাং বিজ্ঞাং প্রযত্নাদবরাদপি।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুহুলানপি ॥

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্বক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর কিন্তু সেইটা লইয়া নিজেকেই ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে

গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রত্ব  
অপরের নিকট ভাব লইয়া  
নিজভাবে উহা গঠন  
করিতে হইবে।

হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যাইও না; এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী

অপর জাতিবিশেষের পোষাকপরিচ্ছদ, আহারব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার; তাহা তোমরা বেশ জান। আর ঈশ্বরই জানেন, কত সহস্র

সহস্র বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় প্রবল জীবনশ্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; তোমাদের শোণিতে, ঈশ্বর জানেন, কত সহস্র সহস্র বর্ষের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি এই প্রবল শ্রোতস্বতীকে—যাহা প্রায় সমুদ্রে পঁহাঁছিয়াছে, তাহাকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকট লইয়া যাইতে চাও ? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই নষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনশ্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর গতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর ষাটকে সরল করিয়া দাও—তাহা হইলেই উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি নিজের সর্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্ত আমি পূর্বকথিত উপায়গুলি নির্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে—সেগুলি সময়ভাবে অঙ্গ রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম জাতিভেদ ও ধর্ম সমস্যা। না। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধীয় অদ্বুত সমস্যাটির কথা ধর। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক বিচার করিতেছি। আমি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। আমি এদেশের প্রায় সর্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই ইহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পর্য্যস্ত ধারণা করিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার চক্ষের সমক্ষে যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি এই সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তারপর আবার ভোজনপানাদি সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটা গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ ইহা যত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আর আশ্চর্যের বিষয়—আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে এই আহারাদির সম্বন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা ভোজনপানবিষয়ে প্রকৃত পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত ভোজনপান প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও অজান্ত কয়েকটি প্রশ্ন আছে, সেগুলিও আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই । আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার মনে কি উদয় হয়, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই । কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্মৃষ্কল ভাবে সভার কার্য্য আরম্ভ হইতেই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে । সুতরাং আমি আপনাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহ্বারের আর অধিক বিলম্ব করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না । অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিলাম । আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্মৃষ্কল হইতে চেষ্টা করিব ।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটা কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তৎসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে । ভারতে ধর্ম্ম অনেক দিন ধরিয়া নড়নচড়নহীন হইয়া

আছে—আমরা চাই উত্থাকে গতিশীল করিতে ।

গতিশীল ধর্ম্ম ।

আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই । অতীতকালে বরাবর যেমন ছিল, সেইরূপ ধর্ম্ম যেমন রাজ-প্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র ব্যক্তির পর্ণকুটীরেও যেন প্রবেশ করে । ধর্ম্ম—যাহা এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকারস্বরূপ—সকলেরই জন্মপত সত্ত্বরূপ—উত্থাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনাবেতনে বহন করিতে হইবে । ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলভ্য, ভারতের ধর্ম্মও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে । আর ভারতে আমরাই এই কার্য্যই করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং সামান্য সামান্য প্রভেদ লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না । আমি তোমাদিগকে কার্য্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে । আমি যেমন ভারতবাসীকে বারবার বলিয়াছি, যদি গৃহে শত শত শতাব্দীর অন্ধকার থাকে আর যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া ‘উঃ কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার’ বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার দূর হইবে ? আলো নিয়ে এস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে । মানুষকে সংস্কার করিবার ইহাই রহস্য । তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয় সমূহের আভাস দাও—আগে মানুষে বিশ্বাস কর । মানুষ হীন ও অবনত-

স্বভাব—একেবারে এই বিশ্বাস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি

মাছুষের উপর—থুব খারাপ মাছুষের উপরও—  
 কার্য্যপ্রণালী—সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস করিয়া কখন অক্লান্তকার্য্য হই নাই।  
 বিরোধ বর্জন, না ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্থলেই পরিণামে বিজয়লাভ হইয়াছে। মাছুষে  
 গড়িবার চেষ্টা ও মাছুষে বিশ্বাস কর—তা তিনি পণ্ডিতই হউন বা অজ্ঞ,

মুখ বুলিয়া প্রতীয়মানই হউন। মাছুষে বিশ্বাস কর—তা তাঁহাকে দেবতা  
 বলিয়াই বোধ হউক অথবা সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে  
 মাছুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর—তার পর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও  
 বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে  
 কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে  
 ইহা জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই—উচ্চতর  
 আদর্শের অভাব হইতেই হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়,  
 তাহার কারণ এই—সে সত্যকে লাভ করিতে পারে নাই। অতএব মিথ্যাকে  
 দূর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, তাহাকে সত্য বাহা, তাহা দিতে  
 হইবে। তাহাকে সত্য কি, তাহা জানাইয়া দাও। তাহার সহিত সে নিজ  
 ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে—ঐখানেই  
 তোমার কাষ শেষ হইয়া গেল। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি  
 তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে;  
 আলোক অন্ধকারকে অবশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের  
 সম্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে  
 চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই একমাত্র পথ—বিবাদ বিসম্বাদে কোন ফল  
 হইবে না অথবা তাহাদিগকে একথা বলিলেও চলিবে না যে, তাহারা বাহা  
 করিতেছে, তাহা মন্দ। তাহাদের সম্মুখে ভালটা ধর—দেখিবে—কি  
 আগ্রহের সহিত তাহারা উহা গ্রহণ করে। সেই অবিনাশী মানবদেহনিগাসী  
 ঐর্ষ্যরিক শক্তি জাগ্রত হইয়া কেমন বাহা কিছু উত্তম, বাহা কিছু মহিমান্বয়—  
 তাহাকেই গ্রহণ করিতে হস্তপ্রদারণ করে!

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি আমাদের  
 পূর্ব্বপুরুষগণের ঈশ্বর,—তাঁহাকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি বা গণপতি যে নামেই  
 ডাকা হউক না কেন, তাঁহাকে সবিচার বা নিরিকার, সগুণ বা নিগুণ  
 যেকল্পেই উপাসনা করা হউক না কেন, তাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

‘একং সদিপ্রা বহুধা বদতি’ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেমের সহিত আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভানীর্কাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার রূপায় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে বন্ধিতে সমর্থ হই, তাঁহার রূপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও প্রবল সত্য-মুরাগের সহিত পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাত কার্য্য করিতে পারি, আর যেন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহৎ কাৰ্য্যের ভিতর আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত গৌরবের বিলুপ্তি আকাজকা প্রবেশ না করে ।

## বেদান্ত ।

আমরা দুই জগতে বাস করিয়া থাকি—বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ । অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবেই উন্নতি করিয়া আসিতেছে । প্রথমেই বহির্জগতে গবেষণা  
মানবের বহির্জগৎ ও আরম্ভ হয় আর মানব প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি  
অন্তর্জগতে গবেষণা । হইতেই সমুদয় গভীর সমস্তার উত্তর লাভের চেষ্টা  
করিয়াছিল । মানব প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ

সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার সুন্দর ও মহতের জ্ঞাত যে পিপাসা, তাহার নিরন্তর চেষ্টা পাইয়াছিল ; মানব নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল আর সে যে সকল উত্তর লাভ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে সকল অত্যদ্বুত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অতি অপূর্ণ । বহির্জগৎ হইতে মানব যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছিল । কিন্তু যখন পরে তাহার নিকট অন্ত জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল । বেদের কর্ণকোণভাগে আমরা ধর্ম্মের অত্যদ্বুত তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যদ্বুত

তব্ধসমূহ দেখিতে পাই, আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে বেরূপ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অভিশয় প্রাপ্যম্পর্শী । তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রলয়বর্ণনাস্বক সেই অত্যদ্ভুত মন্ত্রটির কথা স্মরণ আছে । বোধ হয়, এরূপ মহান্ভাবদ্যোতিকা বর্ণনা আর কেহ কখন করিতে পারে নাই । তথাপি ইহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহান্ভাবের বর্ণনা—ইহা স্থূলেরই বর্ণনা—ইহাতে যেন এখনও জড়ত্ব কিছু লাগিয়া রহিয়াছে । উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সান্ত্বের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা ; উহা জড় দেহেরই অনন্ত বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে, উহা দেশেরই অনন্তত্বের বর্ণনা, চৈতন্ত্যের নহে । এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই । প্রথম প্রণালীটা ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে জগদ্বৃক্ষাণ্ডের প্রকৃত সত্য অণু-সন্ধান করা । জড় জগৎ হইতে জীবনের সমুদয় গভীর সমস্তা সমূহের নীমাংসার চেষ্টাই প্রথমে হইয়াছিল ।

‘যত্নেতে হিমবস্তো মহিষা’

‘এই হিমাঙ্কুর পর্বত যাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে ।’

এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত হয় না । ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল আর তাঁহাদেব গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন

বহির্জগতের গবেষণায় দিকে বাইল, অন্তর্জগতে অহুসন্ধান আরম্ভ হইল, অতীতি—অন্তর্জগতে অহুসন্ধান । জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ চিত্তে আসিলেন ।

এই প্রশ্ন চতুর্দিক্ হইতে স্রুত হইতে লাগিল,—  
মাহুঘের মৃত্যুর পর তাহার কি হয় ?

‘অন্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে ।’

‘কেহ কেহ বলে, মাহুঘের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেহ কেহ বলে, থাকে না ; তে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি ?’ এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই । ভারতীয় মন বাহ্য জগৎ হইতে বাহ্য পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই । উহা আরও অধিক অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তর দেশে গমন করিয়া নিজ আত্মার মধ্যে অহুসন্ধান করিয়া সমস্তার নীমাংসার চেষ্টা করিলেন—তাঁহারা উত্তর পাইলেন ।



বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত বা আরণ্যক বা রহস্য । এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম একেবারেই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে মুক্ত । এখানে আমরা একেবারেই দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক বিষয়-

সমূহ জড়ের ভাষায় বর্ণিত নহে, আধ্যাত্মিক ভাব-

উপনিষদের বিশেষত্ব । সমূহ—চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সুস্পষ্টতত্ত্বসমূহ

তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । এখানে

আর কোনরূপ স্কুলভাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতাড়া দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই । উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ—মহা সাহসের সহিত—এখনকার কালে আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে, কোনরূপ জোড়াতাড়া না দিয়া মানবজাতির নিকট এমন সকল মহত্তম সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা জগতে আর কখনও হয় নাই । হে আমার স্বদেশিগণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই ।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডও সুবৃহৎ সমুদ্রস্বরূপ । উহারও বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলে অনেক জন্ম প্রয়োজন । এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই

বলিয়াছেন যে, বেদান্ত বেদের বা ঋত্বির শিরঃ-

উপনিষদের অধিকতর প্রামাণ্য স্বরূপ আর সত্য সত্যই ইহা বর্তমান ভারতের

ও উহাদের প্রকাশ । বাইবেল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বেদের কণ্ঠ-

কাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন,

কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া ঋতি অর্থে উপনিষদ্—

কেবল উপনিষদই বুঝাইয়াছে । আমরা জানি, আমাদের সকল বড় বড়

দর্শনকর্তা—ব্যাস বা পতঞ্জলি বা গোতম, এমন কি, সকল দর্শনশাস্ত্রের

জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্য্যন্ত—যখনই তাঁহারা তাঁহাদের মতের কোন-

রূপ সম্বন্ধে প্রমাণ চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্ হইতেই

উহা পাইয়াছেন, আর কোথা হইতেও নহে ; কারণ, উহাদের মধ্যেই

সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্ত নিহিত রহিয়াছে ।

কতকগুলি সত্য আছে, যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্র

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সত্য । সেগুলি বিশেষ বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে-

সত্য । আবার আর কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানব প্রকৃতির

উপর প্রতিষ্ঠিত যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন সেগুলিও

ধাকবে। এই শেৰোক্ত সত্যগুলি সার্বজনীন ও সার্বকালিক আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে \*নিশ্চিত অনেক সার্বকালিক ও যুগধর্ম। পরিবর্তন ঘটয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ উপাসনা প্রণালী এ সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রোত সার্বজনীন সত্য সমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ণ তত্ত্বাংশি স্বমহিমায় অচল অজের ও অবিনাশী ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্মকাণ্ডেই পূর্ণ হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে, এমন কি, মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব, যাহা সকল ভারতীয় চিন্তা প্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্মকাণ্ডে বিরূত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত উপনিষৎপ্রচারিত সত্যসমূহের হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিকভাগের বীজ সংহিতায় বর্তমান। বিষয় বলিবার পূর্বে আমি আপনাদের সমক্ষে এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে চাই আর বেদান্ত শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহাও আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজ কাল আমরা একটি বিশেষ ভ্রমে প্রায়ই পতিত হইয়া থাকি—আমরা বেদান্ত শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইট সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আজকাল তিন প্রস্থান পড়িতে হয়।

প্রথমতঃ, প্রতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসহৃত্ত। আমাদের দর্শন শাস্ত্র সমূহের মধ্যে এই ব্যাসহৃত্তই সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অগ্ন্যজ্ঞ প্রস্থানত্রয়—বেদান্ত শব্দের দর্শনসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে প্রকৃত ভাষণার্থ। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, তাহা নয়, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ—যেন সত্যাত্মসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসহৃত্তে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ ও বেদান্তহৃত্তের মধ্যে উহাদের সংযোগস্থলস্বরূপ বেদান্তদর্শনের ভগবৎস্তু বিমিশ্র ট.কা.

বেদান্তের অপূর্ণ সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ শ্রীগীতা বর্তমান । এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ই হউক না কেন, সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসহৃদয়ে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ ধরিয়া থাকেন । আমরা দেখিতে পাই, কি শঙ্করাচার্য্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য্য, কি বল্লভাচার্য্য, কি চৈতন্য—যে কেহই নূতন সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিন গ্রন্থান লইয়া কেবল তাহাদের উপর একটা নূতন ঢাকা রচনা করিতে হইয়াছে । অতএব উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা মতের উপর মাত্র ‘বেদান্ত’ শব্দটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অত্যাশ্চর্য্য । বেদান্ত শব্দে প্রকৃত পক্ষে এই সকল মতগুলিকেই বুঝায় । অদ্বৈতবাদীর যেমন বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও তদ্রূপ । আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শব্দের দ্বারা বৈদান্তিক বুঝিয়া থাকি ।

আর একটা বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—এই তিনটা মত স্মরণাভীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত । শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেক দিন পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল—শঙ্কর মতই সনাতন । উহার একজন শেষ প্রতিনিধি মাত্র । রামানুজী মতও তাহাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্বে হইতেই যে উহা বিদ্যমান ছিল, তাহা উহাদের মতের ভাষ্য হইতেই আমরা জানি । অত্যাশ্চর্য্য যে সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় উহাদের পার্শ্বে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ । আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে । ঠিক যেমন আমাদের ষড়্‌দর্শন—ঐগুলিতে মহান্ তত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে । আরম্ভ অতি মূর্খবানিতে—শেষে এই সকল মত পরস্পর অদ্বৈতের বস্ত্র নির্যোষে পরিণতি—এইরূপই বিরোধী নহে । পূর্বোক্ত তিনটা মতেও আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যময় উচ্চ হইতে উচ্চতর, আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সমুদয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অন্তিম একত্বে পর্যাবসিত হইয়াছে । অতএব এই তিনটা পরস্পর বিরোধী নহে ।

অপর দিকে আমি তোমাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, ইহারা পরস্পর বিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদী—যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে ভাষ্যকারগণের একদেবী অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সেই-  
 সিদ্ধান্ত। শ্লোকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ, সেই-  
 শ্লোকের টানিয়া অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলির টানিয়া দ্বৈত অর্থ করিতেছেন! অবশ্য ইহারা মহাপুরুষ—আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ‘দোষা বাচ্যা গুরোরপি’—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়া-  
 ছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোন-  
 রূপ অসাধুতা অবলম্বন করিয়া ধর্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপেঁচ করিবার দরকার নাই, যে সকল শ্লোকের দ্বারা যে সকল ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শ্লোকের সাদাসিধা অর্থ বুঝা অতি সহজ আর যখনই তোমরা অধিকারভেদের অপূর্ণ রহস্য বুঝিবে, তখন ইহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বনিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ইহা সত্য যে, উপনিষৎসমূহের লক্ষ্য বিষয় একটী—“কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়”—“কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি”। আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অস্ত্রান্ত সকল বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট বিষয়ের জায় উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় চরম একত্র আবিষ্কারের চেষ্টা। কারণ, তোমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ভিন্ন জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্বানুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর লক্ষ্য এক হইলেও অধিকারভেদে যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্বানুসন্ধান ক্রতির বিভিন্ন উপদেশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় বিজ্ঞানের কার্য্য হয়,—তবে যখন এই অপূর্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ, নামরূপভিন্ন, জড়-  
 চৈতন্যময়, সর্বপ্রকারে নির্মিত, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটী হইতে

ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেক রূপটী অপরটী হইতে পৃথক্,—কত ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত লোক—এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একতাবিকার করিতে হয়, তাহা কি গুরুতর, ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, ভাবিয়া দেখ আর ইহাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অল্প দিকে আবার অরুক্ষতী জ্বায়ে প্রধোগ করিতে হইবে। অরুক্ষতী নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন রহস্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পরে ক্ষুদ্রতর অরুক্ষতী দেখাইতে হয়। এইরূপেই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্বে অন্তান্ত অনেক স্থলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্ত আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল আপনাদিগকে উপনিষদ্ দেখাইয়া দিলেই হইবে—তাহা হইলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ই দ্বৈতবাদ—উপাসনায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহাকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্ত, শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা—তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, যে আচার্য উপরোক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন যে, দ্বৈত প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে এই দুইটী ভাবটী পরিত্যক্ত হইয়াছে,—যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি—কোন ভেদ নাই, ‘তত্ত্বমসি য়েতকেতো’। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্তমান, ইহা পরিশেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপোষ নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য—এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে আর বর্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্যপ্রচার করিতে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই, আর দ্বৈতরূপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এক্ষণে পূর্ব প্রসঙ্গের অঙ্গুত্তি কর যাক। প্রথমতঃ, সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় সাহায্যে একমত, সেই জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্বুত আবিষ্করণ সমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, আমরা যাহা কখন স্বপ্নেও

ভাবি নাই, এমন অল্পত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। মানুষ অনেক দিন পূর্বেই শক্তিরহস্য আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব—প্রাণ ও আকাশ। বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা মানুষ অতি অল্প দিন হইল জানিয়াছে।

মানব এই সবে আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ, তাড়িত, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত শক্তি সকলকেই এক শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে—সুতরাং যে কোন নামেই অভিহিত করা হউক, সকলগুলিই এক শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। সংহিতাতেও সেই একই শক্তির বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তাড়িতই বল, চৌম্বকশক্তিই বল অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল, সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র আর সেই এক শক্তির নাম প্রাণ। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। বস্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয় মনে কর? কখনই নহে। যদি একেবারে শক্তিরাহির ধ্বংস হইত, তবে আগামী জগৎস্রষ্টার হেতু কি? এই পতিত চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। সৃষ্টি আর ইংরাজী creation এই দুইটি শব্দ একার্থক নহে। ইংরাজীতে সংস্কৃত শব্দগুলির ঠিক ঠিক অনুবাদ হয় না—যা তা করিয়া অনুবাদ করিয়া আমার বলিতে হয়। ‘সৃষ্টি’ শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় স্ফুটান্ স্ফুটন হইয়া যাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শাস্তভাবে থাকে—আবার ক্রমশঃ প্রকাশ হইবার উদ্বোধন হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর প্রাণরূপিণী এই শক্তিগুলির কি হয়? তাহারা আদি প্রাণে পরিণত হয় আর এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না আর সংহিতায় ‘অানীদবাতঃ’—গতিহীন ভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। যেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় অতিশয় কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ এই ‘বাত্ত’ শব্দ ধর। কখন কখন ইহা দ্বারা বায়ু বুঝায়, কখন কখন গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থে গোল করিয়া থাকে।

এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ভূতের কি অবস্থা হয় ? শক্তি সর্বভূতে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে সমুদয় ভূতের প্রকাশ হয়। এই আকাশই আদি ভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনই এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

‘যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।’

এই জগতে বাহ্য কিছু আছে, প্রাণ কল্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়।

জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির এই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিরূপে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অত্যাচ্ছ বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কল্পন হইলে বায়ুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি। তবে

ইহার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট যে সৃষ্ণতর হইতে  
‘মহৎ’ হইতে আকাশ ও স্থলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; সর্বশেষে  
প্রাণের উৎপত্তি। স্থলভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা বাহিরের

বস্তু আর ইহার পশ্চাতে সৃষ্ণতর ভূত রহিয়াছে।

এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে দুই তত্ত্বে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও একত্বে পৌঁছান হয় নাই। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে ? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্য্যবসান করা যাইতে পারে ? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই আর যদি উহাকে ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে যেমন উহা প্রাচীনদিগের ত্রায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্বব্যাপী নিঃশব্দ পুরুষ, যিনি পুরাণে ব্রহ্মা—চতুঃসুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে য়াহাকে মহৎ নামে নির্দেশ করা যায়। এখানেই ঐ উভয়ের মিলন। বাহ্য মন বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিস্করূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই মহত্ত্বেরই

কিয়দংশ। আর জগতের সমুদয় মস্তিষ্কে উপহিত মহৎকে সমষ্টি বলা যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বিশেষণেই শেষ হয় নাই, উহা আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা প্রত্যেকে গেন একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আর সমগ্র জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড আর ব্যষ্টিতে বাঁধা হইতেছে, তাহা সমষ্টিতেও ঘটতেছে, ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে আমরা অপর ব্যক্তির মনে কি হইতেছে, তাহাও জানিতে পারিতাম। এখন প্রশ্ন এই—এই মনটি কি। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশে জড় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে শারীর-বিধান শাস্ত্র যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্মের একটীর পর আর একটী দুর্গাধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যেরা আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না;

কারণ, তাহারা, প্রতি পদে আধুনিক শারীর-বিধানশাস্ত্র মনকে মস্তিষ্কের সহিত মিশাইয়াছেন দেখিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা ইহা বরাবর জানি। হিন্দুবালককে প্রথমেই এই তত্ত্ব শিখিতে হয় যে, মন জড়পদার্থ, তবে উহা সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে। ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; আর ইহা আত্মা নহে।

এই আত্মা শব্দটি আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে পারিতেছি না, কারণ, ইউরোপে আত্মা শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই

নাই; অতএব এই শব্দ অনুবাদের অযোগ্য।

আত্মা। জর্জন দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা শব্দটি

self শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু বতদিন না এই শব্দটি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন ইহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে selfই বল বা আর যাহা কিছু বল, আমাদের আত্মা ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র অথবা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় উহার অন্তঃকরণ স্বরূপে ব্যবহার করেন আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক বস্তুরসহায়ে দেহের দৃশ্যমান বস্তুগুলির উপর কার্য্য করেন। এই মন কি? এই সে দিন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চক্ষুঃ প্রকৃতপক্ষে



দর্শনেন্দ্রিয় নহে, কিন্তু ইহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্তমান আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি। মাথুকের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবেনা। তোমাদের দর্শন এই স্বতঃ-

সিদ্ধ লইয়াই প্রথমে অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরীন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্তী মস্তিষ্কেन्द्रসমূহের। তুমি তাহাদিগের বাহ্য ইচ্ছা নাম দিতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয় অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরাজীতে mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শাবীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া তোমায় বলেন যে, মস্তিষ্কই mind এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা করণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—তাহাদিগকে তুমি অনায়াসেই বলিতে পার যে, তোমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন; ইহা তোমাদের ধর্ম্মের অক্ষরপরিচয় মাত্র।

বেশ কথা, এক্ষণে আমরাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপা-

মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার দানস্বরূপ। ইহা মহতেরই অংশ স্বরূপ—মনের এই শব্দ গুলির তাৎপর্য বিভিন্ন অবস্থা সমূহের সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শাস্ত

একটি হ্রদকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ কর। ইহাকেই চিত্ত বলিয়া কল্পনা কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি ঘটিবে? প্রথমতঃ, জলে যে আঘাত দেওয়া হইল, সেইটিই যেন একটা ক্রিয়া হইল; তার পরেই জল উখিত হইয়া প্রস্তরটির দিকে প্রতিক্রিয়া করিল আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটিকে হ্রদের স্বরূপ ধর আর বাহ্য বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাবলি। যখনই উহা এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বহির্বস্তুর সংস্পর্শে আসে— বাহ্য বস্তুগুলিকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—

তখনই একটি কম্পন উৎপন্ন হয় । উহা মন—সংশয়ান্বক । তার পরেই একটি প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়ান্বক বুদ্ধি আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান একত্র উদয় হয় । মনে কর, আমার হস্তের উপর একটি মশক আসিয়া দংশন করিল । এই বাহ্যবস্তুর আঘাত আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—আমাদের মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই মন । তার পরেই একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের ভিতর এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটি মশক বসিয়াছে, আমার তাহাকে ভাড়াইতে হইবে । তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হৃদে যে সকল আঘাত আসে, তাহার সকলগুলিই বহির্জগৎ হইতে কিন্তু মনোহৃদে আঘাত বহির্জগৎ হইতেও আসিতে পারে আবার অন্তর্জগৎ হইতেও আসিতে পারে । চিত্ত এবং উহার এই বিভিন্ন অবস্থাসমূহের নাম অন্তঃকরণ ।

পূর্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটি বিষয় বুঝিতে হইবে । তাহাতে আমাদের পরে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে । তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চিত

বস্তুজ্ঞানের প্রণালী

ও অদ্বৈতবাদ ।

মুক্তা দেখিয়াছ আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই

জান, মুক্তা কিরূপে নিম্নিত হয় । শুক্তির মধ্যে

একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে

উত্তেজিত করিতে থাকে আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে । উহাই তখন নির্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয় । এই মুক্তা বেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্রজগৎকে ঠিক সেই ভাবে গঠন করিতেছি । বাহ্য জগৎ হইতে আমরা কেবল আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি । এমন কি, সেই আঘাতটীর অন্তিম জানিতে হইলেও আমাদের ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয় আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের অংশ-বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করি আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তাহা আর কিছুই নয়—আমাদের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা ঘেরাপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকারপ্রাপ্ত মনকেই জানিতে পারি । যাহারা বহির্জগতের বাস্তব সত্যতার বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহাদিগকেও একথা জানিতে হইবে আর আজকাল এই শারীরবিধান শাস্ত্রের

উন্নতির দিনে এ কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জগৎকে আমরা ‘ক’ বলিয়া নির্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃত পক্ষে ক+মনকেই জানিতে পারি আর এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটী এত অধিক যে, উহা ঐ ‘ক’এর সর্বাংশব্যাপী আর ঐ ‘ক’এর স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বহির্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা বেরূপ গঠিত, পরিণত বা রূপান্তরিত হয়, আমরা উহার সেই ভাবকেই জানিতে পারি। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে বস্তুতঃ জানি, তাহা আত্মা+মন ব্যতীত আর কিছু নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্বসম্বন্ধে সविशेष আলোচনা করিব। তবে এখানেই আমাদের ইহা স্বরণ রাখা আবশ্যক।

তার পর আর একটা বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিঃস্বচ্ছিন্ন জড়প্রত্যয়ের নামমাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া বাইতেছে। যেন একটি সদাপ্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্বদাই এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া বাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনারূপে সমুদয়টিকে এক বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নদী আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু নদীটী প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে উহার তটভূমির পরিবর্তন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তীরবর্তী বৃক্ষলতা এবং উহার পত্রপুষ্পকলাদির পরিবর্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটী কি? উহা এই পরিবর্তনসমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা

এই ক্রমাগত পরিবর্তনকে লক্ষ্য করিয়াই মংগল

কণিকবিজ্ঞানবাদ

কণিকবিজ্ঞানবাদ মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক

ও অদ্বৈতবাদ।

ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই মত খুব

যুক্তিযুক্ত আর ভারতে এই মত বেদান্তের কোন

কোন অংশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। এই মতকে নিরন্তর কর্ত্তব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল আর আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে

ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদে ভয় খাওয়া সত্ত্বেও ইহাতেই বাস্তবিক জগতের পরিভ্রাণ, কারণ, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সকল সমস্তার উত্তর পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদাদি উপাসনাপ্রণালী হিসাবে খুব ভাল বটে, উহা মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে পারে—উহা দ্বারা মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ বিচারনিষ্ঠ অথচ ধর্মপরায়ণ হইতে চাহে, তবে তাহার পথে অদ্বৈতবাদই একমাত্র গতি।

যাহা হউক, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটি নদী-স্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপর দিকে পূর্ণ হইতেছে। তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতে থাকিলেও আমাদের ধারণাসমূহ—আমাদের বস্তুবিষয়ক ধারণাসমূহ অপরিবর্তনীয়। অতএব যেমন বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন আলোকরশ্মি আসিয়া—একটি যবনিকা বা দেয়াল অথবা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়িলেই তখনই, কেবল তখনই উহার এক অখণ্ডভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হইতে পারে, সেইরূপ মানবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া পূর্ণ অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখন এই এক বস্তু হইতে পারে না, কারণ, ইহাও পরিবর্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই

আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন

আত্মাই অচল অখণ্ড বস্তু। পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয়

ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক

অখণ্ড ভাবে পরিণত হয়—ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্মা।

আর যখন দেখিতে পাইতেছি, সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে সূক্ষ্ম জড় অথবা মন যে নামেই অভিহিত কর না এবং সমুদয় স্থূল জড় বা বাহ্য জগৎ—উহার সহিত তুলনায় পরিবর্তনশীল, তখন এই অপরিবর্তনীয় বস্তুটি কখনই জড় পদার্থ হইতে পারে না, অতএব উহা চৈতন্যস্বভাব অর্থাৎ উহা অজড়, অবিনাশী ও অপরিণামী।

তার পর আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া

কে উহা সৃষ্টি করিল—কে জড় পদার্থকে সৃষ্টি করিল,—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ কৌশলবাদ (Argument from design) আনয়ন রূপ যে পূর্ণ-প্রচলিত হেতুবাদ—আমি তাহার কথা বলিতেছি না। এখানে আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে সত্যকে জানিবার চেষ্টা—আর যেমন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেই ভাবে উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র

এক একটা অপরিবর্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি  
পরমায়া। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার

মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহায়ভূতির ঐক্য বিদ্যমান।

নতুন কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কার্য্য করিবে? কি সে মধ্যবর্তী বস্তু, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য করিবে? আমি যে তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটা আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—কারণ, ঐ আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কার্য্য করিবে; উহা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকিবে; উহার সহায়তায়ই অপর আত্মাসমূহ জীবনীশক্তিসম্পন্ন হইবে, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহায়ভূতি করিবে, পরস্পরের জ্ঞান কার্য্য করিবে। এই দর্শনবাপী আত্মাই পরমায়া নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু ঈশ্বর। আবার যখন আত্মা জড়পদার্থ নির্মিত নহে, যখন উহা চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলির অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মালুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না। অতএব উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহমরক্কেদ্যোহমমদাহোহশোষ্য এব চ ।

নিশ্চ্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥

অগ্নি এই আত্মাকে দহ করিতে পারে না, কোন বস্তু ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, ভরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে

না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না—এই মানসাত্মা অজ, অবিনাশী ও অজের।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু, কপিলের মতেও ইহা সর্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু—কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, উহার ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

তার পর আর একটা বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয়—আর এই বিষয়টি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে। এই হেতু আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটার প্রতি অবহিত হইতে ও উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, উহা ভারতীয় সকল বিষয়েরই ভিত্তিস্বরূপ। তোমরা জন্ম ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত ভৌতিক পরিণামবাদের

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিণামবাদ (Evolution) বিষয় শুনিয়াছ। উহার মতে (Evolution) সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভেদ; আমরা

যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম সাপুশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এক, একটা—অপরটাতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে। যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

‘জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূৰ্ব্বাৎ।’

আমাদের শাস্ত্রেও বলিতেছে,—এক জাতি—এক শ্রেণী অপর জাতিতে, অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। কিন্তু তবে ইউরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোন্‌ স্থানে?—‘প্রকৃত্যাপূৰ্ব্বাৎ’—প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা। ইউরোপীয়গণ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন নির্বাচন প্রভৃতি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাতান্তর পরিণামের যে হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা বোধ হয়, ইহারা ইউরোপীয়গণ হইতে অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপুরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বুদ্ধরূপে

পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রের একদিকে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগ না করা যায়, তবে উহা হইতে তদনুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইবে না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে—হইতে পারে উহা। অতএব আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাইই চাই। অতএব বুদ্ধ যদি পরিণামের এক প্রাপ্ত হয়, তবে অপরপ্রাপ্তিই জীবগুণে অবশ্য বুদ্ধত্ব হইবে। যদি বুদ্ধ ক্রমবিকশিত (পরিণত) জীবগুণ হয়, তবে ঐ জীবগুণে নিশ্চিত ক্রমসঙ্কুচিত (অব্যক্ত) বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশস্বরূপ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তির অত্যাচারে বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কোট হইতে মহত্তমও উচ্চতম সাধু পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও অনন্ত সমৃদ্ধিই রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি স্বল্পপরিমাণ বিকাশ হইয়াছে; তোমাতে তদপেক্ষা অধিক আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন, —

‘ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ।’

“যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জলসিঞ্জন করে।” কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্ত কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটা প্রণালী কাটিয়াছে—ঐ প্রণালীর মুখে একটা দরজা আছে—পাছে সমুদয় জল দিয়া ক্ষেত্রকে প্রাণিত করিয়া দেয়, এই জন্ত ঐ দরজা বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দরজাটা খুলিয়া দিলেই জল নিঃশক্তিভাবে উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলপ্রবেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের জলে পূর্বে হইতেই শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীৰ্য্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার—দেহরূপ এই দ্বার—আমরা প্রকৃত পক্ষে ঘাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছি না। আর যতই এই

দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সৰ্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও গুণ প্রকাশিত হইতে থাকে, আর এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান ।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি,—যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে—যদিও এবিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি আমরা উহা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ প্রথা যে সকল মূল ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই

সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার

বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্ব। হইতে পারে, অতীত কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নরনারীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাদে সঞ্চরণ করিতে দেওয়া যায়, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুর্ভেদপ্রকৃতি, আশুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে ইহাদিগকে দমন রাখিবার জন্ত পুলিশ বাড়াইতেছে। একপে সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ—এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি—নিবারিত হইতে পারে, ইহাই মহাসমস্যা। আর যতদিন ভূমি সমাজে বাস করিতেছে, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এবিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকত্তার ঘেরপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মম্বুর মতে কামোদ্ভব পুত্র আর্থ্য নহে। যে সন্তানের জন্ম-যত্ন বেদের বিধানানুযায়ী, সেই প্রকৃত পক্ষে আর্থ্য। আজ কাল সকল দেশে এইরূপ আর্থ্য সন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে



কার্যে পরিণত করি না ; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহান্ ভাব লইয়া একটা বিকৃত কিলুতকিমাকার ব্যাপার করিয়া ছুটিয়াছি। উহা সম্পূর্ণ সত্য যে, আজকাল আর প্রাচীন কালের মত পিতামাতা নাট, সমাজও এক্ষণে পূর্বের তায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন মধ্যাজভূক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজের তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্যে যেরূপই দাঁড়াইয়া থাকুক, মূল তত্ত্বটা নির্দোষ আর যদি একটা তত্ত্ব ঠিক কার্যে পরিণত না করা হইয়া থাকে, তবে বাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটিকেই নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন ? ঋণ্যসমস্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কার্যে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব ধারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে। বাহাতে ভাল করিয়া কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কেই আত্মাসম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, কেবল দ্বৈতবাদীরা বলেন, ( আমরা পরে ইহা বিশেষ ভাবে দেখিব ) অসং কর্মের দ্বারা উহা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায় আবার সংকর্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, ঐগুলি আপাততঃ প্রতীত হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের আত্মাতে পূর্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে কোনো কিছু যে

আত্মাতে আসিবে, তাহা নহে, কোন জিনিষ যে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতায় দ্বৈত উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে।

ও অদ্বৈতবাদী একমত। এইটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বের inspired নহে ( বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে, তাহা নহে ) উহা expired ( ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে ) —উহার প্রত্যেক আত্মায় অবস্থিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে কেবল বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে ; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলি প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটী বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব হইতেই শক্তি অবস্থিত, মুক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের

ভিতরে অবস্থিত। হয় বল যে, উহা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল যে, উহা  
মায়ায় আবরণে আবৃত হইয়াছে—ইহাতে কিছুই আপিয়া যায় না। এইটুকু  
বুঝিতে হইবে যে, পূর্ক হইতেই উহা ভিতরে অবস্থিত। তোমাদিগকে ইহা  
বিশ্বাস করিতে হইবে, প্রত্যেকের ভিতরে যে গূঢ়ভাবে শক্তি অবস্থিত,  
তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে শক্তি  
রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্রতম মানবেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আদ্যতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহা বিরোধ আরম্ভ। তাঁহারা দেহকে  
বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটা জড়শ্রোতমাত্র; সেইরূপ মনকে  
বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও এতদ্রূপ একটা পরমাণু প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন।  
আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। উহার  
অস্তিত্ব অস্বীকার করিলার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটা দ্রব্য এবং ঐ  
দ্রব্যো সংলগ্ন গুণরাশি কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা শুদ্ধ গুণই স্বীকার  
করিয়া থাকি। যেখানে একটা কারণ স্বীকার করিলেই সমুদয়ের ব্যাখ্যা  
হয়, সেখানে দুইটা কারণ স্বীকারের কি প্রয়োজন?—এইরূপে বৌদ্ধদের  
সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার  
করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মতই খণ্ডন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল।  
যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে—তোমার  
একটা আত্মা, আমার একটা আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্

একটি করিয়া আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র  
আত্মা ও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাদের মতে বরাবরই  
সম্বন্ধে বৌদ্ধের আপত্তি। একটু গলদ ছিল। অবশ্য ঐ পর্গাস্ত বৈতবাদের

মত ঠিক—ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি—  
এই শরীর রহিয়াছে, এই স্বপ্ন মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছে আর  
সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছে। এখানে মুন্সিল এইটুকু  
যে, এই আত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বস্তু বলিয়া আর উহাদের উপর দেহমন  
প্রভৃতি গুণপদ্ধতি লাগিয়া রহিয়াছে, বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। এখন  
কথা এই,—কেহই কখন বস্তু দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে  
না। অতএব তাঁহারা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন কি?  
কেন, ক্রমিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বল না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত  
আর কিছুই অস্তিত্ব নাই? উহারা কেহই পরম্পরের সহিত সংলগ্ন নহে,

উহারা মিলিয়া একটা বস্তু হয় নাই, সমুদের তরঙ্গরাজির আঁর একটা আর একটার পশ্চাতে চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটা অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ-পরম্পরামাত্র, একটা চলিয়া যায়, আর একটার জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে আর এই সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্বাণ বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ ইহার সমক্ষে নীরব, দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ অসম্ভব, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না। সর্বব্যাপী অখণ্ড ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুন্তকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, যিনি সেইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, বৌদ্ধেরা বলেন, যদি ঈশ্বর এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত, তিনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ চুঃখপূর্ণ; যদি ইহা ঈশ্বরের কাৰ্য্য হয়, তবে বৌদ্ধ বলেন, আমরা এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ, এই ঈশ্বর অযোক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। বীহারী জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্মাতার অনুমান করেন, আমাদের আর তাঁহাদের যুক্তিসমূহ আলোচনায় প্রয়োজন নাই—ঋণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। স্মরণীয় ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল না। তোমরা বলিয়া থাক, সত্য, কেবলমাত্র সত্যই, তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। “সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পশ্য বিততো দেবযানঃ।” সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখন জয় লাভ করে ন, সত্যের দ্বারা ই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া বাইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল হ্রস্ব ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্ত। তোমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরিব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে বাইতেছ, শানিতেছ, তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার, আর সে যদি বুঝিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক অথবা তোমার অতিবন্দীকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক—

এ ত ছুঁল লোকে চিরকালই করিয়া থাকে—যে আমাকে পরাস্ত করিবে সেই নাস্তিক ! যদি যুক্তিবাদী হইতে চাও, তবে আগাগোড়া যুক্তিবাদী হও, আর যদি তাহা না পার, তবে তুমি নিজের জন্য ষেটুকু স্বাধীনতা চাও, অপরকেও তাহা দাও না কেন ? তুমি এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিবে ? অপর দিকে, উহা একরূপ অপ্রমাণ করা যাইতে পারে । তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ আছে । ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর, অসংখ্য জীবাত্মা এবং প্রত্যেক জীবাত্মাই যে ব্যক্তি, এ সকল তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার ? তুমি ব্যক্তি কিসে ? দেহহিসাবে তুমি ব্যক্তি নহ, কারণ, তোমরা আজ, প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও ভালরূপ জান যে, একসময়ে হয়ত যে জড়রাশি সূর্যে অবস্থিত ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে আর হয়ত এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে অবস্থিত হইতে পারে । তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় হে রামচন্দ্র ? মনের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় ? এই রাত্রে তোমার একরূপ ভাব আবার কাল আর এক ভাব । যখন শিশু ছিলে, তখন যেরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না ; বৃদ্ধ লোকে যেরূপ চিন্তা করে, যুবা অবস্থায় সে সেরূপ চিন্তা করিত না । তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় ? জানেই তোমার ব্যক্তিত্ব, একথা বলিও না—জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য অংশব্যাপী মাত্র । আমি যখন তোমার সহিত কথা কই, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমি উহার সম্বন্ধে জানিতে পারি না । যদি জ্ঞানই বস্তুর সত্তার প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে উহার অস্তিত্ব নাই, কারণ, আমি ত উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি নাই । তবে আর তুমি তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর লইয়া কোথায় দাঁড়াও ? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার ?

আরও গোছেরা উঠিয়া বলিবেন—ইহা যে শুধু অধৌক্তিক, তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নাতিবিরুদ্ধও বটে, কারণ, উহা মানুষকে কাপুরুষ হইতে ও বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিন্তু তোমাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না । এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষই ইহা এরূপ করিয়াছে তবে কেন বাহিরের একজন কাল্পনিক ব্যক্তিবিশেষে

বিশ্বাস কর, বাঁহাকে কেহ কখন দেখে নাই বা শুনে নাই—অথবা বাঁহার নিকট হইতে কেহ কখন সাহায্য পায় নাই? তবে কেন নিজেদের কাপুরুষ করিয়া ফেলিতেছ আর তোমাদের সন্তানসন্তাতিকে শিখাইতেছ যে, মানুষের সর্বোচ্চ অবস্থা কুকুরতুল্য হওয়া, এই কাল্পনিক পুরুষের সমক্ষে আমি দুঃখ, অপবিত্র ও জগতের মধ্যে অতি হেয় অপদার্থ বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকা? অপর দিকে, বৌদ্ধগণ তোমায় বলিবেন, তুমি নিজেকে এইরূপ বলিয়া কেবল যে মিথ্যাবাদী হইতেছ, তাহা নহে, কিন্তু তুমি তোমার সন্তানসন্ততিরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইতেছ। কারণ, এইটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিও যে, লোকে যেমন যেমন ভাবিয়া থাকে, তেমন তেমন হইয়াও থাকে। নিজের সম্বন্ধে তোমরা যে রূপ যে রূপ বলিবে, ক্রমশঃ তোমাদের সেই বিশ্বাস দাঁড়াইবে। ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম কথাই এই,—‘তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছ, তুমি তাহাই হইয়াছ; পরে যাহা ভাবিবে, আবার তাহাই হইবে। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তুমি কখন ভাবিও না যে, তুমি কিছুই নহ, আর যতক্ষণ না তুমি অপর একজনের—যিনি এখানে থাকেন না, মেঘপটলের উপর বাস করেন,—সাহায্য পাইতেছ, ততক্ষণ তুমি কিছু করিতে পার না, ইহাও ভাবিও না। ঐরূপ ভাবিলে তাহার ফল এই হইবে যে, তুমি দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া যাইবে। আমরা অতি অপবিত্র; হে প্রভো, আমাদের পবিত্র কর—এইরূপ বলিতে বলিতে নিজেকে এরূপ দুর্বল করিয়া ফেলিবে যে, তাহা হইতে সকল প্রকার পাপ ক্রমশঃ আসিয়া যাইবে। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রত্যেক সমাজে যে সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এই ব্যক্তি-বিশেষ দৈত্যের ধারণা, তাঁহার সম্মুখে কুকুরবৎ হইয়া থাকা,—এই ভয়ানক ধারণা যে, এই আশ্চর্য্য মানুষজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুকুরবৎ হওয়া—হইতেই হইয়াছে। বৌদ্ধ বৈষ্ণবকে বলেন, যদি তোমার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হয় যে, ভগবানের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক স্থানে গিয়া তথায় অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে করঘোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহা অপেক্ষা বরং আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ। বৌদ্ধ বলিতে পারেন, তিনি এইটী এড়াইবার জন্তই নির্মাণ বা বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন।

আমি তোমাদের নিকট ঠিক বৌদ্ধের জায় হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি; কারণ, আজকাল লোকে বলিয়া থাকে যে, অবৈতৎসর্গের দ্বারা

লোকে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য অপর পক্ষেরও কি বলিবার আছে, সেইটাই তোমাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিতে'ছ। আমরাদিগকে ছুই পক্ষই নির্ভীকভাবে দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি, একজন ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না। আজকাল কি বালকেও এ কথা বিশ্বাস করিবে? যেহেতু কুস্তকার ঘটনির্ণাণ কবিত্তে পারে, অতএব ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন! যদি তাহাই হয়, তবে কুস্তকারও ত একজন ঈশ্বর আর যদি কেহ তোমায় বলে, তিনি মস্তক ও হস্তশূণ্য হইয়াও কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে পাগলা গারদে দিতে পার। তোমার ঈশ্বর, এই ব্যক্তিবিশেষ জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যাহার নিকট তুমি সারা জীবন ধরিয়া চীৎকার করিতেছ, তিনি কি কখন তোমায় সাহায্য করিয়াছেন আর যদি করিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছ? আধুনিক বিজ্ঞান তোমাদিগকে এই আর একটি প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, এরূপ সাহায্য বাহা কিছু তুমি পাইয়াছ, তাহা তুমি নিজ চেষ্টাতেই পাইতে পারিতে। পক্ষান্তরে তোমার এরূপ রূথা ক্রন্দনে শক্তিক্ষয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না, এরূপ ক্রন্দনাদি না করিয়াও তুমি অনায়াসে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতে। আরও আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অত্যাচার আসিয়া থাকে। যেখানেই এই ধারণা ছিল, সেখানেই অত্যাচার ও পৌরোহিত্য রাজত্ব করিয়াছে আর যতদিন না এই মিথ্যাভাবে সমূলে নির্মূল করা হয়, ততদিন, বৌদ্ধগণ বলেন, ঐ অত্যাচারের কখন নিরুত্তি হইবে না। যতদিন মানুষের এই ধারণা থাকে যে, অপর কোন প্রবল পুরুষের নিকট তাহাকে নত হইয়া থাকিতে হইবে, ততদিনই পুরোহিতের অস্তিত্ব থাকিবে, তাঁহারা কতকগুলি দাবি দাওয়া করিবেন, মানুষ যাহাতে তাঁহাদের নিকট মাথা নোয়ায়, তাহার চেষ্টা করিবেন আর গরিব বেচারী মানুষগুলিও তাহাদের কথা ঈশ্বরকে জানাইবার জন্য একজন পুরোহিত চাহিতে থাকিবে। তোমরা ব্রাহ্মণজাতিকে সমূলে নির্মূল করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, বাহারা তাহাদিগকে নির্মূল করিবে, তাহারাই আবার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে আর তাহারা আবার ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইবে।

কারণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের কতকটা বরং সহৃদয়তা ও উদারতা আছে, কিন্তু এই ভুঁইকোঁড়েরা চিরকালই অতি ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া থাকে। ভিক্ষারী যদি কিছু টাকা পায়, তবে সে সমগ্র জগৎকে খড়্‌কুটা জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব যতদিন এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা থাকিবে, ততদিন এই সকল পুরোহিতও থাকিবে আর সমাজে কোন প্রকার উচ্চ নীতির অভ্যুদয়ের আশা করাই যাইতে পারিবে না। পৌরোহিত্য ও অত্যাচার চিরকালই এক সঙ্গে থাকিবে আর কেন লোকে এই ঈশ্বর কল্পনা করিল ? কারণ, প্রাচীনকালে কতকগুলি বলবান লোক সাধারণ লোককে বশ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমাদিগকে আমাদের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে নতুবা তোমাদিগকে সমূলে নিশূল করিব। এইরূপ লোকেই এইরূপ ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিল—ইহার অর্থ কোন কারণ নাই—‘সভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।’

একজন বজ্রোদ্যতহস্ত পুরুষ রহিয়াছেন, যে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাকেই তিনি বিনাশ করিয়া ফেলিতেছেন। এখন বৌদ্ধ বলিতেছেন, তুমি যুক্তিবাদী হইয়া বলিতেছ, সবই কৰ্ম্মফলে হইয়াছে। তোমরা সকলেই অসংখ্য জীবাশ্ম বিখ্যাসী, আর তোমাদের মতে এষ্ট জীবাশ্ম সকলের জন্ম যুগ্ম নাই। এ পর্য্যন্ত বেশ যুক্তি ও জায়সজ্জ বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে; বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা অতীত কারণের ফল, আবার ভবিষ্যতে তাহার অর্থ ফল হইবে। হিন্দু বলিতেছেন, কণ্ড জড়, চৈতন্য নহে; স্মৃতির কৰ্ম্মের ফললাভ করিতে হইলে কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন। বৌদ্ধ তাহাতে বলেন, বৃক্ষ হইতে ফললাভ করিতে গেলে কি চৈতন্যের প্রয়োজন হয় ? যদি বীজ পুতিয়া গাছে জল দেওয়া যায়, তাহার ফল হইতে ত কোনরূপ চৈতন্যের প্রয়োজন হয়না। তুমি বলিতে পার, আদি চৈতন্যের শক্তিতে এই ব্যাপার ঘটয়া থাকে, কিন্তু জীবাশ্মগণই ত চৈতন্য, অর্থ চৈতন্যের প্রয়োজন কি ? যদি জীবাশ্মাদেরও চৈতন্য থাকে, তবে ঈশ্বরবিখ্যাসের প্রয়োজন কি ? অবশ্য বৌদ্ধেরা জীবাশ্মের অস্তিত্বে বিখ্যাসী নহে, কিন্তু জৈনেরা জীবাশ্মায় বিখ্যাসী অথচ ঈশ্বর বিখ্যাস করে না। তবে হে দ্বৈতবাদিন্, তোমার যুক্তি কোথায় রহিল, তোমার নীতির ভিত্তি কোথায় রহিল ? এখন তোমরা অদ্বৈতবাদে দোষণোপ করিয়া বল যে, অদ্বৈতবাদ হইতে দুর্গাতির সৃষ্টি হইবে, তখন একবার ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, আদ্যন্তও দ্বৈতবাদীদের নীতিপরায়ণতার কিরূপ প্রমাণ পাও,

তাহাও আলোচনা করিয়া দেখ। যদি অদ্বৈতবাদী বিশ হাজার বদমায়েস হইয়া থাকে, তবে দ্বৈতবাদীও বিশ হাজার বদমায়েস দেখিতে পাইবে। মোটামুটি বলিতে গেলে বলিতে হয়, দ্বৈতবাদী বদমায়েসের সংখ্যাই অধিক হইবে; কারণ, অদ্বৈতবাদ বুলিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর চিন্তাবৃত্তিসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন আর তাহাদিগকে সহজে ভয় দেখাইয়া কোন কাজ করাইবার উপায় নাই। তবে তুমি আর যাও কোথায়? বৌদ্ধদের হাত এড়াইবে কিরণে? তুমি বেদের বচন উদ্ধৃত করিতে পার, কিন্তু বৌদ্ধেরা ত বেদ মানে না। সে বলিবে, ‘আমার ত্রিপিটকে ত একথা বলিতেছে না আর ঐ ত্রিপিটক অনাদি অনন্ত—এমন কি, উহা বুদ্ধেরও নিজের কথা নহে; কারণ, তিনি বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত সনাতন সত্যের আবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধ আরও বলেন, তোমাদের বেদ মিথ্যা, আমাদেরই ঠিক ঠিক বেদ, তোমাদের বেদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের কল্পিত—সেগুলি দূর করিয়া দাও। এখন তুমি যাও কোথায়?

বৌদ্ধদের যুক্তিজাল কাটিয়া বাহির হইবার উপায় প্রদর্শন করা ঝাইতেছে। দ্রব্য ও গুণ বিভিন্ন—এইটীর উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধদের প্রথম আপত্তি—এটা একটা দার্শনিক আপত্তি। অদ্বৈতবাদী বলেন, না, উহার বিভিন্ন নহে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। তোমরা সেই প্রাচীন দৃষ্টান্ত ‘সর্পরজ্জ্বলে’র কথা অবগত আছ। যখন তুমি সর্প দেখিতেছ, তখন রজ্জু একেবারেই দেখিতে পাও না, রজ্জু তখন একেবারে

উড়িয়া গিয়াছে। কোন বস্তুকে দ্রব্য ও গুণ

অদ্বৈতবাদের দ্বারা বোদ্ধমত ও বলিয়া বিতর্ক করা দার্শনিকদের মস্তিষ্ক-বৈতবাদের সামঞ্জস্য। প্রকৃত দার্শনিক ব্যাপার মাত্র, উহার কোন

যথার্থ ভিত্তি নাই, দ্রব্য ও গুণ বলিয়া পৃথক্

পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তুমি যদি একজন প্রাকৃত ব্যক্তি হও, তুমি শুধু গুণরাশিই দেখিবে, আর যদি তুমি একজন মত্ত বোগী হও, তুমি কেবল দ্রব্যই দেখিবে; কিন্তু এক সময়ে উভয়কে কখনই দেখিতে পাইবে না। অতএব, হে বৌদ্ধ, তুমি যে দ্রব্য ও গুণ লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই। কিন্তু দ্রব্য যদি গুণরহিত হয়, তবে একটা দ্রব্য-মাত্রেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যদি তুমি আত্মা হইতে গুণরাশি তুলিয়া লইয়া দেখাইতে পার, গুণরাশির অস্তিত্ব কেবল মনে, উহার প্রকৃত পক্ষে আত্মার



আরোপিত। তাহা হইলে ত দুটী আত্মারও চিন্তি সিদ্ধ হয় না, কারণ, গুণই এক আত্মা হইতে অপর আত্মার বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক আত্মা যে অপর আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহা তুমি কিরূপে জানিতে পার ? কতকগুলি প্রভেদকারী লিঙ্গ, কতকগুলি গুণের দ্বারা। আর যেখানে গুণের সত্তা নাই, তথায় পার্থক্য কিরূপে থাকিতে পারে ? অতএব দ্বিবিধ আত্মা নাই, একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ; আর তোমার পরমাত্মা স্বীকার অনাবশ্যক, তোমার এই আত্মাই সেই। সেই এক আত্মাকেই পরমাত্মা বলে, তাঁহাকেই জীবাত্মা এবং অজ্ঞাত নামে অভিহিত করা হয়। থাকে। আর হে সাংখ্য ও অজ্ঞাত দ্বৈতবাদিগণ, তোমরা বলিয়া থাক, আত্মা সর্বব্যাপী বিহু অঞ্চ তোমরা কিরূপে বহু আত্মা স্বীকার কর ? অনন্ত কি কখন দুইটী হইতে পারে ? অনন্ত সত্তা একমাত্র হওয়াই সম্ভব। একমাত্র অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, আর সবই তাঁহারই প্রকাশ।

বৌদ্ধ এই উত্তরে নীরব, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শুধু বৌদ্ধকে নিরস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। দুর্বল মতবাদসমূহের দ্বারা কেবল অপর মতের সমালোচনা করিয়াই অদ্বৈতবাদী নিরস্ত নহেন। অদ্বৈতবাদী তখনই অপরাপর মতের সমালোচনা করেন, যখন তাহার। তাঁহার খুব কাছে যেঁসিয়া আসিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেন, এই

পর্যন্তই তাঁহার অপর বাদ খণ্ডন। তার পরেই

অদ্বৈতবাদীর নিজ সিদ্ধান্ত। তিনি নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। একমাত্র

অদ্বৈতবাদই শুধু অপর মত খণ্ডন করিয়া এবং

তজ্জন্ম শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিরস্ত থাকেন না। অদ্বৈতবাদীর যুক্তি এইরূপ। তিনি বলেন, তুমি বলিতেছ জগৎ একটী অবিরাম গতিপ্রবাহ মাত্র। ভাল, ব্যাপ্তিতে সবই গতিশীল বটে। তোমারও গতি আছে ; এই টোপলটী—ইহারও প্রতিনিয়ত গতি (পরিবর্তন) হইতেছে। গতি সর্বত্রই, তাই ইহার নাম সংসার (স্ব ভাত্ অর্থ গমন) তাই ইহার নাম জগৎ (গম্ ভাত্ ক্রিপ্—জগৎ)—অবিরাম গতি ! তাই যদি হইল, তাহা হইলে ত এই জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না ; কারণ, ব্যক্তিত্ব বলিতে অপরিণামী কিছু বুঝায়। পরিণামশীল ব্যক্তিত্ব হইতে পারে না ; এই ব্যাক্যটীই অবিরোধী, সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতে ব্যক্তিত্ব বলিয়া

কিছুই নাই। চিন্তা, ভাব, মন, শরীর, জীব জন্তু সকলেরই অহরহঃ পরিণাম হইতেছে। যাহা হউক, এখন সমগ্র জগৎকে একটী সমষ্টিস্বরূপে ধর। সমষ্টিস্বরূপে কি এই জগতের পরিণাম বা গতি হইতে পারে? কখনই নহে। কোন অল্প গতিশীল অথবা সম্পূর্ণ গতিহীন বস্তুর তুলনায়ই গতির ধারণা সম্ভবপর। অতএব সমষ্টিরূপে জগৎ গতিহীন, পরিণামহীন। অতএব তখনই, কেবল তখনই তোমার প্রকৃত ব্যক্তিগত সম্ভব, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগতের সহিত অভিন্নভাবে জানিতে পার। এই কারণেই বেদান্তী (অদ্বৈতবাদী) বলেন, যতদিন দ্বৈত, ততদিন ভয় দূর হইবার উপায় নাই, কেবল যখন অপর বলিয়া কিছু না দেখে, অপর বলিয়া কিছু অনুভব না করে, যখন কেবল একমাত্র সত্তা থাকে, তখনই কেবল মানুষ মৃত্যুর পারে, সংসারের পারে যাইতে পারে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে শিক্ষা দেন, সমষ্টিজ্ঞানেই মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিজ্ঞানে নহে। যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিবে, তখনই তোমার প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ হইবে। তুমি তখনই ভয়শূন্য ও অমৃতস্বরূপ হইবে, যখন তুমি আপনাকে সমগ্র জগৎস্বরূপ জানিবে। আর তখনই জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বোধ হইবে। এক অখণ্ড সত্তাকেই আমাদের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি সমন্বিত এই জগদ্বক্ষাণ্ড দেখিয়া থাকে। যাহারা আর একটু ভাল কর্ষ করে ও সেই সংকর্ষবলে অন্যবিধ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহারা মৃত্যুর পর ইহাকেই ইন্দ্রাদি-দেবসমন্বিত স্বর্গালোকরূপে দর্শন করে। যাহারা আরও উন্নত, তাহারা সেই এক বস্তুকেই ব্রহ্মলোকরূপে দেখেন আর যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা পৃথিবী স্বর্গ বা অন্য কোন লোক কিছুই দেখেন না, তাহাদের নিকট এষ্ট ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়, তাহার পরিবর্তে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন।

আমরা কি এই ব্রহ্মকে জানিতে পারি? আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সংহিতায় অনন্তের বর্ণনার কথা বলিয়াছি। এখানে তাহার ঠিক বিপরীত—এখানে অন্তর্জগতের অনন্তজ্ঞানের চেষ্টা। সংহিতায় বহির্জগতের অনন্ত বর্ণনা; এখানে চিন্তাজগতের, ভাবজগতের অনন্ত; সংহিতায় অস্তিত্বাদ্যোক্তক ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইয়াছিল; এখানে সে ভাষায় কুলাইল না, নাস্তিত্বাব্যক্ত ভাষায় অনন্ত বর্ণনার চেষ্টা হইল। এই

জগৎস্বাক্ষর রহিয়াছে। স্বীকার করিলাম, ইহা ব্রহ্ম। আমরা কি ইহা জানিতে পারি? না, না। তোমাদিগকে ব্রহ্মকে জানা যায় কি না? আবার এই বিষয়টী স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে।

পুনঃপুনঃ তোমাদের মনে এই সন্দেহ আসিবে,— যদি ইহা ব্রহ্ম হয়, তবে আমরা কিরূপে ইহাকে জানিতে পারি? ‘বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ’—হে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? চক্ষু সকল বস্তু দেখিয়া থাকে—চক্ষু কি নিজেকে দেখিতে পারে? পারে না, কারণ, জ্ঞানক্রিয়াটীই একটী নিম্ন অবস্থা। হে আর্য্যাস্তানগণ, তোমাদিগকে এই বিষয়টী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ, ইহার ভিতরে অনেক বৃহৎ ব্যাপার আছে। তোমাদের নিকট যে সকল পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রলোভন আসিয়া থাকে, তাহার ইহাই একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই। প্রাচ্যদেশের কিন্তু অগ্রভাব। আমাদের বেদে বলিতেছে যে, এই বস্তুজ্ঞান বস্তুটী হইতে নিম্নস্থানীয়, কারণ, জ্ঞান অর্থে সর্বদাই একটা বেড়া দেওয়া বা সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিতে হইবে। যখনই তুমি কোন বস্তুকে জানিতে চাও, তখনই উহা তোমার মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকথিত দৃষ্টান্তে যেমন করিয়া গুক্তি হইতে মুক্তা নির্গত হয়, কথিত হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা কর—তাহা হইলেই বুঝিবে, জ্ঞান অর্থে সীমাবদ্ধ করা কিরূপ। একটা বস্তুকে আহরণ করিয়া তোমার স্বাহুভূতিতে আকৃষ্ট করিলে—তাহার সমগ্র ভাবটী জানিতে পারিলে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। তাহাই যদি হয়, জ্ঞান অর্থে যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে অনন্ত সম্বন্ধে কি তুমি তাহা করিতে পার? যিনি সকল জ্ঞানের উপাদান, যাহাকে ছাড়িয়া তুমি কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার না, যাহার কোন গুণ নাই, যিনি সমগ্র জগতের এবং আমাদের আত্মার সাক্ষিস্বরূপ, তাহার সম্বন্ধে তুমি উহা কিরূপে করিতে পার? তাহাকে তুমি কিরূপে জানিবে? কি উপায়ে তাহাকে বাধিবে?

যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমগ্র জগৎ অনন্তকে জানিবার এইরূপ বৃথা চেষ্টা মাত্র। যেন এই অনন্ত আত্মা নিজ মুখ দর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, আর আত্মকণ্ঠ পূর্ণ্যন্ত সকল প্রাণীই যেন তাহার মুখের প্রতিবিম্ব লইবার দর্পণ-স্বরূপ, এক এক করিয়া এক এক দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন

করিবার চেষ্টা করিয়া ঈ-দিগকে উপযুক্ত না দেখাতে অবশেষে মনুষ্যদেহে তিনি বুদ্ধিতে পারেন যে, এ সবই অসৌম্য—অনন্ত কখন সাত্ত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তখনই পশ্চা-  
বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। দিকে যাত্রা আরম্ভ—আর উহাকেই ত্যাগ বা বৈরাগ্য বলে। ইন্দ্রিয় হইতে পিছু হটিয়া এস, ইন্দ্রিয়ের দিকে যাইও না—ইহাই বৈরাগ্যের মূলমন্ত্র। ইহাই সর্বপ্রকার নীতির মূলমন্ত্র, ইহাই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূলমন্ত্র; কারণ, তোমাদিগকে অবশ্য স্রবণ রাখিতে হইবে, তপস্যায়ই জগতের সৃষ্টি—ত্যাগেই জগতের উৎপত্তি। আর যতই তুমি ক্রমশঃ পশ্চাদিকে ধাবিত হইবে, ততই তোমার সমক্ষে ধীরে ধীরে সকল মূর্তিই প্রকাশিত হইতে থাকিবে, এক এক করিয়া সেগুলি পরিত্যক্ত হইবে, অবশেষে তুমি প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহাই থাকিবে। ইহাই মোক্ষ।

এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুদ্ধিতে হইবে—বিজ্ঞাতারম্ভের কেন বিজ্ঞানী-  
য়াৎ—বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে সাক্ষিস্বরূপের আনন্দ সন্তোষ। কখন জানিতে পারা যায় না, কারণ, যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তুমি তোমার চক্ষের প্রতিবিম্ব দেখ, তাহাকে তুমি কখন চক্ষু বলিতে পার না, তাহা অত্যা কিছু, তাহা প্রতিবিম্ব যাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা, এই অনন্ত সদব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা ত আমাদের মত চলিতে ফিরিতে, জীবন ধারণ করিতে ও জগৎকে সন্তোষ করিতে পারে না! সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সন্তোষ করিতে পারে, লোকে সে কথা বুদ্ধিতে পারে না। “ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ, এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছ” এই কথা লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই,—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সন্তোষ করিতে পারেন। কোন স্থানে যদি একটা কুণ্ঠি হয়, তাহা হইলে ঐ কুণ্ঠির আনন্দ ভোগ বেশী করে কারা?—বাহারা কুণ্ঠি করিতেছে, না, দর্শকেরা? এষ্ট জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি উহা হইতে অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ, আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের

শাক্তিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে শাক্তিস্বরূপ, সেই নিকাম ভাবে, স্বর্গে ঘাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দা স্তুতিতে সমঞ্জানী হইয়া কার্য্য করিতে পারে। যে শাক্তিস্বরূপ, সেই আনন্দভোগ করিতে পারে, অপর কেহ নহে।

তার পর অদ্বৈতবাদ বুঝিতে গেলে মায়াবাদ বুঝা আবশ্যিক। অদ্বৈত-বাদের অন্তর্গত এক একটী বিষয় বুঝিতেই বৎসর বৎসর কাটিয়া যায়, বুঝাইতে আবার আরো বিলম্ব লাগে। অতএব আমাকে ইহার সামান্যভাবে উল্লেখ-মাত্র করিয়াই নিরস্ত হইতে হইবে। এই মায়াবাদ বুঝা চিরকালই একটী কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মায়াবাদ প্রকৃত পক্ষে বাদ বা মতবিশেষ নহে, উহা দেশকালনিমিত্তের নাম—আরও সংক্ষেপে উহাকে নামরূপ বলে। সমুদ্রের তরঙ্গের সমুদ্র হইতে প্রভেদ কেবল নাম ও রূপে আর তরঙ্গ হইতে এই নামরূপের কোন পৃথক সত্তা নাই, নাম-রূপ তরঙ্গের সহিত বর্তমান। তরঙ্গ অন্তর্হিত হইয়া ঘাইতে পারে, আর তরঙ্গের

অন্তর্গত নামরূপ যদি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত  
হইয়া যায়, তথাপি সেই একই পরিমাণ জল  
থাকিয়া যাইবে। অতএব এই মায়াই তোমার ও

আমার মধ্যে, জীবজন্তু ও মানবের মধ্যে, দেবতা ও মানবের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই মায়াই যেন আত্মাকে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে আর এই মায়া নামরূপ ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি ঐ ঙ্গলিকে পরিত্যাগ কর, নামরূপ দূর করিয়া দাও, তবে উহা চিরকালের জ্ঞাত অন্তর্হিত হইবে, তখন তুমি প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহাই থাকিবে। ইহাকেই মায়া বলে। আর উহা কোন মতবাদ নহে, উহা জগতের ঘটনাবলির স্বরূপবর্ণনামাত্র।

বাস্তববাদিগণ বলেন, এই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সে বোঝা অজ্ঞ, ছেলেপুলে নিয়া ধর করে, সে যে জগৎ সত্য বলে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই টেবিলটির নিরপেক্ষ সত্তা আছে, উহার অস্তিত্ব জগৎজ্ঞানোত্তর অপর কোন বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না আর যদি এই সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, এই টেবিলটি যেমন রহিয়াছে, তেমনই থাকিবে। একটু সামান্য জ্ঞান-

লাভ করিলেই সে বুঝিবে, ইহা কখন হইতে পারে  
বস্তুজ্ঞানের ত্রিবিধ সোপান। না। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমুদয়ই পরস্পর  
পরস্পরের উপর নির্ভর করে, উহার পরস্পর

আপেক্ষিক। অতএব আমাদের বস্তুজ্ঞানের তিনটী সোপান আছে,—

প্রথম,—প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্; দ্বিতীয় সোপান—সকল বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান আর শেষ সোপান এই যে, একটী মাত্র বস্তু আছে, তাহাকেই আমরা নানারূপে দেখিতেছি ।

অল্প ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রাথমিক ধারণা এই যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথাও রহিয়াছেন, অর্থাৎ তখন ঈশ্বর ধারণা খুব মানবীয়ভাবাপন্ন, মানুষ যাহা করে, তিনি তাহাই করেন; তবে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী রকমে করেন । আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ ঈশ্বরকে অল্প-

কথায়—কিরূপে অর্থোক্তিক ও অপরিপাক্ত প্রমাণ ঈশ্বরধারণার ত্রিবিধ সোপান হয়, ওয়া যায় । ঈশ্বর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ধারণা

এই যে, একটী শক্তি রহিয়াছে সর্বত্র তাঁহার প্রকাশ । ইনিই প্রকৃত সগুণ ঈশ্বর, চণ্ডীতে ইহার কথাই লিখিত আছে । কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিও যে, এই ঈশ্বর কেবল সমুদয় কল্যাণ গুণরাশির নিধান নহেন ! ঈশ্বর ও সন্তান—দুটী দেবতা থাকিতে পারে না, একই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ভরসা করিয়া ভাল মন্দ উভয়ই বলিতে হইবে আর ঐ যুক্তিসঙ্গত মত স্বীকার করিলে তাহা হইতে যে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তাহাও লইতে হইবে ।

বা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তসৌ নমস্তসৌ নমস্তস্তু নমো নমঃ ॥

বা দেবী সর্বভূতেষু শুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্তু নমস্তস্তু নমস্তস্তু নমো নমঃ ॥

বিনি সর্বভূতে শান্তি ও পবিত্রতা রূপে অবস্থিত, তাঁহাকে নমস্কার করি ।

যাহা হউক, তাঁহাকে শুধু শান্তিরূপ বলিলে চলিবে না, তাঁহাকে সগুণরূপ বলিলে তাহার ফল যাহাই হউক, তাহা লইতে হইবে ।

‘হে গার্গি, এ জগতে যাহা কিছু আনন্দ দেখিতে পাও, সবই—তাঁহার অংশমাত্র ।’

তুমি উদ্ধার দ্বারা যাহা ইচ্ছা কাষ করিতে পার । আমার সম্মুখবর্তী এই আলোকের দ্বারা তুমি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক শত টাকা দিতে পার, আর একজন লোক তোমার নাম জাল করিতে পারে, কিন্তু আলোক উভয়ের পক্ষেই সমান । ইহাই হইল, ঈশ্বর জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান । তৃতীয় সোপান এই যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরেও নাই, ভিতরেও নাই, কিন্তু ঈশ্বর

প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ এই গুলি একপর্যায় শব্দ । দুটা বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই, কতকগুলি দার্শনিক শব্দই তোমাকে প্রভারিত করিয়াছে । তুমি কল্পনা করিতেছ, তুমি শরীর আবার আত্মা আর তুমি এক সঙ্গেই এই শরীর ও আত্মা হইয়া রহিয়াছ । তাহা কিরূপে হইতে পারে ? নিজের মনের ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখ । যদি তোমাদের মধ্যে কেহ যোগী থাকেন, তিনি আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করিবেন, তাহার পক্ষে শরীর একেবারে অস্তিত্ব হইয়া গিয়াছে । যদি তুমি সাধারণ লোক হও, তবে তুমি আপনাকে দেহ-স্বরূপ বিবেচনা করিবে, তখন চৈতন্যের জ্ঞান একেবারে অস্তিত্ব হইবে । কিন্তু মানুষের দেহ আছে, আত্মা আছে, আরও অগাধ জিনিষ আছে, এই সকল দার্শনিক ধারণা থাকাতে তাহার মনে হয়, এগুলি এক সময়েই রহিয়াছে । এক সময়ে একটির অধিক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না । যখন তুমি জড়বস্তু দেখিতেছ, তখন ঈশ্বরের কথা কহিও না । তুমি কেবল কার্য্যই দেখিতেছ, কারণকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না । আর যে মুহূর্ত্তে তুমি কারণকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তে কার্য্য অস্তিত্ব হইবে । এ জগৎ কোথায় গেল ? কে ইহাকে গ্রাস করিল ?

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং.

নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহং ।

নিরবধিগগনাভং নিরুপং নির্দিকল্পং

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাভীতভাবং

সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরং ।

নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥

অজরমমরমস্তাভাববস্তুরূপং

স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনং ।

শমিতগুণবিকারং শাস্তং শান্তমেকং

হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ বিবেকচূড়ামণি ।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় অনির্লক্ষণীয়, কেবল আনন্দস্বরূপ, উপমা-রহিত, অপার, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, অসীম আকাশতুল্য, অংশহীন ও ভেদশূন্য পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন ।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায়—প্রকৃতির বিকারহীন, অচিন্ত্যতত্ত্বরূপ, সমভাবাপন্ন অথচ যাঁহার সমান কেহ নাই, যাঁহাতে কোনরূপ পরিমাণের সম্বন্ধমাত্র নাই ( যিনি অপরিমেয় ), যিনি বেদবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ এবং সর্বদা আমাদের ( ব্রহ্মতত্ত্ব অভ্যাসশীলগণের ) নিকট প্রসিদ্ধ, এইরূপ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন ।

জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি অবস্থায় জরামৃত্যুশূন্য, যিনি বস্তুস্বরূপ এবং যাঁহাতে অভাব কিছুই নাই, স্থির জলরাশি সদৃশ, নামরহিত, সহ রজঃ তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বিকাররহিত, ক্ষয়শূন্য, শাস্ত, এক পূর্ণ ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন ।

আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ; অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর অর্থে উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নহে—তাঁহাকে জানিয়াছি বলিলেই তাঁহাকে ছোট করা হইল, কারণ, পূর্বে হইতেই তুমি সেই ব্রহ্ম । আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্ম এক হিসাবে এই টেবিল নহে, আবার অন্য হিসাবে উহা ঐ টেবিলও বটে । নামরূপ তুলিয়া লও, তাহা হইলেই যে সত্যবস্ত্র থাকিবে, তাহাই তিনি । তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্যস্বরূপ ।

ঔং শ্রী ঔং পুমানসি

ঔং কুমার উত বা কুমারী ।

ঔং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি

ঔং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

তুমিই শ্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি ব্রহ্ম—দণ্ডহস্তে ভ্রমণ করিতেছ, তুমি সমগ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ।

তুমি সকল বস্তুতে বর্তমান রহিয়াছ, আমিই তুমি, আমিই তুমি । ইহাই অদ্বৈতবাদের কথা । এ সম্বন্ধে আরো গুটিকতক কথা বলিব । এই অদ্বৈত-

বাদের দ্বারাই সকল বস্তুর মূলতত্ত্বের রহস্য পাওয়া

অদ্বৈতবাদীর অন্যান্য বাদ যায় । আমরা দেখিয়াছি, এই অদ্বৈতবাদের সমর্থন । দ্বারাই কেবল আমরা যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের

আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারি । এখানেই অবশেষে যুক্তি-বিচার একটী দৃঢ় ভিত্তি পাইয়া থাকে কিন্তু ভারতীয় বৈদান্তিক কখন তাঁহার সিদ্ধান্তের পূর্ববর্তী সোপানগুলিকে খণ্ডন করেন না, তিনি নিজ সিদ্ধান্তের



উপর দাঁড়াইয়া সেইগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে সমর্থন করেন ; তিনি জানেন, সেগুলি সত্য, কেবল একটু ভুল করিয়া দোখা-ছেন, ভুলভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। একই বস্তু—কেবল মায়ার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট ; হইতে পারে কিঞ্চিৎ বিকৃত চিত্র, তাহা হইলেও উহা সত্য, সত্য ব্যতীত মিথ্যা কখনই নহে। সেই এক ব্রহ্ম, যাহাকে অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতির বহির্দর্শে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, যাহাকে অল্পজ্ঞ ব্যক্তি জগতের অন্তর্যামিস্বরূপ দেখেন, যাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ আত্মাস্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন, এমন কি, সমগ্র জগৎ সকলই এক বস্তু, একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট, মায়ার বিভিন্ন কাঁচের মধ্য দিয়া দৃষ্ট, বিভিন্ন মনের দ্বারা দৃষ্ট, আর এই সকল বিভিন্নতার কারণ ইহাই। শুধু তাহাই নহে, উহাদের মধ্যে একটা হইতে আর একটাতে লইয়া যায়। বিজ্ঞান ও সাধা-রণ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি ? রাস্তায় গিয়া যদি কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখ, তবে একজন গাঁওয়ারকে (গ্রামবাসী—অজ্ঞ) উহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। দশজনের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জন বলিবে, ভূতে এই ব্যাপার করিতেছে। সে সর্বদাই ভূত দেখিতেছে, কারণ, অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, কার্যের বাহিরে কারণের অনুসন্ধান করা। একটা টিল পড়িলে সে বলে, ভূত বা দৈত্য উহা ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—মাধ্যাকর্ষণ।

সর্বত্রই বিজ্ঞান ও ধর্মে কি বিরোধ ? প্রচলিত ধর্ম সকল বহিস্মুখী ব্যাখ্যায় এতদূর আচ্ছন্ন—সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা—এইরূপ অনন্ত দেবতা—আর যাহা কিছু  
অদ্বৈতবাদই প্রকৃত ঘটনা হইতেছে, সবই একটা না একটা ভূতে  
বৈজ্ঞানিক ধর্ম। করিতেছে—ইহার মোট কথাটা এই যে, কোন

বিষয়ের কারণ সেই বস্তুর বহির্দর্শে অন্বেষণ করা হইতেছে আর বিজ্ঞানের অর্থ এই যে, কোন কার্যের কারণ সেই বস্তুর ভিতরেই অন্বেষণ করা হইতেছে। বিজ্ঞান যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ততই উহা কার্য-সমূহের ব্যাখ্যা ভূত প্রেতের হাত হইতে ছাড়াইয়া নিজের হাতে লইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবাদই সর্বাপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম। এই জগৎদ্রাব্য বাহিরের কোন দৈত্বের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু উহা আপনা আপনি সৃষ্ট হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রকাশ হইতেছে, আপনা আপনি উহার প্রলয় হইতেছে—এক অনন্ত সত্তা ব্রহ্ম “তত্ত্বমসি যথাকতো”—

হে ষ্ঠেতকেতো তুমি তাহাই । এইরূপে তোমরা দেখিতেছ, ইহাই কেবল একমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম—অপর কিছুই নহে আর এই বর্তমান অর্ধশিক্ষিত ভারতে আজকাল প্রত্যহ যে বিজ্ঞানের বুকনি চলিতেছে, প্রত্যহ আমি যে যুক্তির দোহাই শুনিতেছি, তাহাতে আমি আশা করি, তোমাদের দলকে দল অদ্বৈতবাদী হইতে আর (বুদ্ধের কথায় বলিতেছি) ‘বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়’ জগতে উহা প্রচার করিতে সাহসী হইবে। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদিগকে আমি কাপুরুষ বলিয়া স্থির করিব।

যদি তোমাদের এধরূপ দুর্দলতা থাকে, যদি তুমি একেবারে প্রকৃত সত্য স্বীকার করিতে ভয় পাও বলিয়া উহা অবলম্বন করিতে না পার, তবে

অপরকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দাও, পরিব মূর্ত্তি-  
মূর্ত্তিপুঙ্জের প্রতি ঘৃণা পূজকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও  
পরিভ্যাগ কর। না, তাহাকে একটা দৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার

চেষ্টা করিও না; বাহার সহিত তোমার

মত সম্পূর্ণ না মেলে, তাহার নিকটই প্রচার করিতে বাইও না; প্রথমে এইটী বুঝ যে, তোমরা নিজেরা দুর্বল, আর যদি সমাজের ভয় পাও, যদি তোমার নিজ প্রাচীন কুসংস্কারের দরুন ভয় থাকে, তবে বাহার। অজ্ঞ, তাহার। এই কুসংস্কারে আরো কত ভয় পাইবে, ঐ কুসংস্কার তাহাদিগকে আরো কতদূর বদ্ধ করিবে, বুঝিয়া দেখ। ইহাই অদ্বৈতবাদীর কথা। অপরের উপর সদয় হও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সমগ্র জগৎ কালই শুধু মতে নয়, অমুভূতি বিষয়েও অদ্বৈতবাদী হয়, তাহা হইলে ত খুব ভালই হয়; কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে তার পর যতটা ভাল করিতে পারা যায়, তাহাই কর, তাহাদের সকলের হাত ধরিয়া তাহাদের সামর্থ্যানুসারে ধীরে ধীরে লইয়া যাও আর জানিও যে, ভারতে সকল প্রকার ধর্মের বিকাশই ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইয়াছে। মন্দ হইতে ভাল হইতেছে, তাহা নহে; ভাল হইতে আরো ভাল হইতেছে।

অদ্বৈতবাদের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের বালকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে—তাহারা কাহারও কাছ হইতে উহা শুনিয়াছে,—ঈশ্বর জানেন, কাহার নিকট হইতে—যে, অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়,

আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর, অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই ! একবার উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয় যে, এ যুক্তি পাশবভাষণর ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যাহাকে কশাঘাত ব্যতীত দমন করিবার উপায় নাই। যদি তুমি তাহাই অঐশ্বর্যবাদের নীতিতত্ত্ব ! হও, তবে এইরূপ মনুষ্যপদব্যাচ্য হইয়া থাকিবার অপেক্ষা প্রথমেই তোমার আত্মহত্যা করা আবশ্যিক। যদি কশাঘাত ব্যতীত নীতিপরায়ণ না থাকিতে পার, তবে তোমরা সকলেই অসুর হইয়া দাড়াইবে ! তাই যদি হয়, তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত—তোমাদের আর উপায় নাই। চিরকালই তাহা হইলে তোমাদিগকে এই কণা ও দণ্ডের ভয়ে চলিতে হইবে, তোমাদের আর উদ্ধার নাই, তোমাদের আর পলায়নের পন্থা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতেই, কেবল ইহাতেই, নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করিতেছে যে, সকল নীতিতত্ত্বের মূলভিত্তি—অপরের হিতসাধন। কেন অপরের হিতসাধন করিব ? কারণ, আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। কেন নিঃস্বার্থ হইব ? কারণ, কোন দেবতা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমার স্বার্থের দিকে দেখিবেন না—শাস্ত্রে ইহা বলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে বলুক না কেন—আমি উহা মানিতে যাইব কেন ? আর ধর, কতকগুলি লোকে ঐ শাস্ত্র বা ঈশ্বরের দোহাই গুনিয়া নীতিপরায়ণ হইল—তাহাতেই বা কি ! জগতের অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের নীতি এইটুকু যে—‘চাচা আপনা বাঁচা।’ তাই বলিতেছি, আমি যে নীতিপরায়ণ হইব, ইহার যুক্তি দেখাও। অঐশ্বর্যবাদ ব্যতীত ইহা ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই।

“সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনন্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং ॥”

শ্রবকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হিংসা করেন না। অঐশ্বর্যবাদ বলিয়া দিতেছেন, অপরকে হিংসা করিতে গিয়া তুমি নিষেকে হিংসা করিতেছ—কারণ, তাহারা সকলেই যে তুমি ! তুমি জান আর নাই জান, সকল হাত দিয়া তুমি কাণ্ড করিতেছ, সকল পদ দিয়া তুমি চলিতেছ, তুমিই রাজা, রূপে প্রাসাদে সুখসম্ভোগ করিতেছ আবার তুমিই রাস্তার ভিখারীরূপে দুঃখের জীবন যাপন করিতেছ, অজ্ঞ ব্যক্তিতেও

ভূমি, বিদ্যানেও ভূমি, দুশ্লের মধ্যেও ভূমি, সবলের মধ্যেও ভূমি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও। যেহেতু অপরকে হিংসা করিলে আমাকেই হিংসা করা হয়, সেই হেতুই আমাদের কদাপি অপরের হিংসাচরণ কর্তব্য নহে। সেই জন্তই যদি আমি না খাইয়া মরিয়া যাই, তাহাও আমি গ্রাহ করি না, কারণ যখন আমি শুকাইয়া মরিতেছি, তখনই আবার লক্ষ লক্ষ মুখে আমিই আহ্বার করিতেছি। অতএব এই ক্ষুদ্র আমি আমার—ইহাদের বিষয়—আমার গ্রাহের মধ্যে আনাই উচিত নয়, কারণ, সমগ্র জগতই আমার—আমি যুগপৎ জগতের সকল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আর আমাকে ও জগৎকে কে বিনাশ করিতে পারে? এইরূপে দেখিতেছি, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি। অগ্রাণ্ড বাদ তোমাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইব, উহার কোন হেতু নির্দেশ করিতে পারে না। বাহা ইউক, এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, অদ্বৈতবাদই নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একমাত্র সমর্থ।

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ কি? শ্রুতি বলিতেছেন—‘শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।’ প্রথমে এই আদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। সমগ্র জগতে তোমরা যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছ, তাহা সরাইয়া লইতে হইবে—মানবকে দুর্বল ভাবিও না, তাহাকে দুশ্ল বলিও না। জানিও, সকল

পাপ ও সকল অশুভ—এক দুর্বলতা শব্দ দ্বারা

অদ্বৈতবাদ সাধনে লাভ। নিঃদ্বিষ্ট হইতে পারে। সকল অসৎকার্যের মূল—

দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্তই মানুষ, বাহা করা

উচিত নয়, তাহাই করিয়া থাকে; দুশ্লতার জন্তই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, তাহারা সকলে জানুক। দিনরাত্রি তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। মাতৃসুত্তের সঙ্গে তাহারা ‘সোহম’ আমিই সেই, এই ওজোময়ী বাণী পান করুক। তার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক আর ঐ চিন্তা, ঐ মনন হইতে এমন সকল কার্য্য হইবে, বাহা জগৎ কখনও দেখে নাই।

কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকে—এই অদ্বৈতবাদ কার্য্যকরী নহে—অর্থাৎ জড় জগতে এখনও উহার শক্তির প্রকাশ হয় নাই। এই কথা আংশিক সত্য বটে। বেদের সেই বাণী স্মরণ কর,—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরং ।

ওমিত্যেকাক্ষরং জাহ্না যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

ওম্—ইহা মহারহস্য । ওম্—ইহা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি । যিনি এই ওকারের রহস্য জানেন, তিনি যাহা চান, তাহাই পাইয়া থাকেন ।

অতএব প্রথমে এই ওকারের রহস্য অবগত হও—তুমিই যে সেই ওকার—তাহা জান । এই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের রহস্য অবগত হও ; তখনই কেবল তখনই, তোমরা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে । যদি জড়জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর—তুমি বড় । আমি হয়ত একটী ক্ষুদ্র বৃদ্ধ, তুমি হয়ত পক্ষীতুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের আধাররূপ আর আমরা উভয়েই উগা হইতে বড় ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি । অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর । অঈশ্বরবাদের রহস্য এই যে, প্রথমে নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তার পর অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিতে পার । জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা ই প্রবল ও বীর্যবান হইয়াছে । প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা ই প্রবল ও বীর্যবান হইয়াছে । এই ভারতে একজন ইংরাজ আসিয়াছিলেন—তিনি সামান্য কেরাণীমাত্র ছিলেন—পরস্য কড়ির অভাবে ও অন্তান্ত কারণে তিনি দুইবার নিজের মাথায় গুলি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন আর বখন তিনি উহাতে অকৃতকার্য হইলেন,—তাহার বিশ্বাস হইল,—তিনি বড় বড় কাষ করিবার জন্ত জন্মিয়াছেন—সেই ব্যক্তিই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ । যদি তিনি পাদরীদের উপর বিশ্বাস করিয়া সারাজীবন হাটু গাড়িয়া ‘হে প্রভু, আমি দুর্বল, আমি হীন’ করিতেন, তবে তাহার গতি হইত কোথায় ? নিশ্চিত বাতুলালয়েই তাহার গতি হইত । লোকে এই সকল কুশিক্ষা দিয়া তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে । আমি সমগ্র জগতে দেখিয়াছি,—দীনতার দুর্বলতা-সম্পাদক উপদেশের দ্বারা অতি অল্প ফল ঘটিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে উহাতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে । আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা

দেওয়া হয়—আর তাহারা যে শেবে আধপাগলা গোছ হইয়া দাঁড়ায়, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় ?

অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায় এই। অতএব নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর যদি সাংসারিক ধন নূতন শিক্ষা—‘অদ্বৈতজ্ঞান সম্পদের আকাজক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ অগ্গ্রে বেঁধে যা ইচ্ছা করা’ কার্যে পরিণত কর; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর,—তুমি মহামনীষী হইবে। আর যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি দীক্ষিত হইয়া যাইবে—পরমানন্দস্বরূপ নির্মাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন উহা কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—এই পর্য্যন্ত। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য রাখিলে চলিবে না, এখন আর হিমালয়ের গুহার বন জঙ্গলে সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট উহা আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু সন্ন্যাসীর গুহার, দরিদ্রের কুঠীরে, সর্বত্র—এমন কি, রাস্তার ভিখারী দ্বারাও ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে। কারণ, গীতায় কি উক্ত হয় নাই যে—

অন্নমপ্যাস্য ধর্মস্য জায়তে মহতো ভয়াং ।

এই ধর্মের অন্নমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে।

অতএব তুমি জীই হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা পাশ্চাত্য জাতি আমাদের কিছু হও—তোমার, কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, অপেক্ষা অদ্বৈতবাদ কর্মজীবনে কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, অধিক পরিণত করিয়াছে। ইহার অতি অন্নমাত্র অমুষ্ঠান করিলেও মহান্

কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্য্য-সন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—উঠ, জাগো, আর যতদিন না সেই চরম লক্ষ্য পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে লইয়া আসিতে হইবে—ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে

অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে । অতএব হে আর্য্যসন্তানগণ, আর সে দিকে অগ্রসর হইও না । তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিয়াতিমুখী হইয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেক শোণিতাবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হউক ।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কল্পজীবনে পরিণত করিয়াছে । আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে । তাহাদের দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ভিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম । একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অত্ৰদিকে যাইবার চেষ্টা । এখন মজা দেখ, ছমাস বাদে সেই লোকগুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীকদৃষ্টিতে চাহিতেছে । একরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন কিসে করিল ? মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না—সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—তুই জন্মি-ছিচ্ছ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম, একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস্‌ ত তোকে পিষিয়া ফেলিব । চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, ‘গোলাম, তুই গোলাম আছিস—বা আছিস্‌, তাই থাক্‌ । জন্মিছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্র অন্ধকারে জন্মিছিলি, সেই নৈরাশ্র অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্‌ । সেখানে-’কার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুণ গুণ করিয়া বলিত—‘তোর কোন আশা নাই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্র অন্ধকারে পড়িয়া থাক্‌ । সেখানে বলবান্‌ ব্যক্তি পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল । আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল, একজন উত্তম-বস্ত্রপরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল । সে যে চীরপরিহিত আব ভদ্রলোকটী যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেলনা । আর একটু অগ্রসর

হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, তদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্ত বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল, এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের তিতর সেও একজন মানুষ। হয় ত সে ওয়ানিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করিয়া আসিল, হয় ত সে তথায় দেখিল,—দূরবর্তী পঙ্কিগ্রামসমূহ হইতে মলিনবস্ত্রপরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ভ্রম—মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল,—মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ।

আমাদের এই দেশে, এই বেদান্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণ লোকশ্রেণী শত শত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ মায়াজালে আমাদের সমুদয় হৃদয়শার জড় ফেলিয়া এইরূপ অবনতভাবাপন্ন করিয়া ফেলা আমরাই দায়ী। হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে,—নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্য অন্ধকারে। আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। অবশেষে মনুষ্য-জাতি যতদূর নিকৃষ্টতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ, এমন দেশ আর কোথায় আছে, যেখানে মানুষকে গোমহিষাদির সঙ্গে একত্র শয়ন করিতে হয়? আর ইহার জন্ত অপর কাহারও ঘাড়ে দোষ চাপাইও না—অজ্ঞ ব্যক্তির যে ভুল করিয়া থাকে, সেই ভ্রমে তোমরাও পড়িও না। ফলও হাতাহাতি দেখিতেছ, তাহার কারণও এইখানেই বর্তমান। আমাদেরই বাস্তবিক দোষ। সাহস করিয়া দাঁড়াও—নিজেদের ঘাড়েই সব দোষ লও। অপরের স্বক্ষে দোষারোপ করিতে যাইও না—তোমরা যে সকল কষ্ট ভোগ করিতেছ, তাহার একমাত্র কারণ তোমরাই।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকরন্দ, তোমরা এইটী বিশেষভাবে অবগত হও যে, তোমাদের স্বক্ষে এই মহাপাপ—এই বংশ-পরম্পরাগত ও জাতীয় মহাপাপ রহিয়াছে—ইহা দূর না করিতে পারিলে তোমাদের আর উপায় নাই। তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সমিতি



জন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম উদ্ধারের উপায়—শ্রম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় ও সহানুভূতি। আসিতেছে—যাহা সকলের জন্ত ভাবে, যতদিন না ভারতে আবার ধর্মের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োগ করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। তোমরা ইউরোপীয়দের এবং তাহাদের সভাসমিতির অনুকরণ করিতেছ, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ভাবের অনুকরণ কি করিয়াছ? আমি তোমাদিগকে একটি গল্প বলিব—আমি স্বচক্ষে যে একটি ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট বলিব—তাহা হইলেই তোমরা আমার ভাব বুঝিবে। একদল ইউরোপীয়ান কতকগুলি ব্রহ্মদেশবাসীকে লগুনে লইয়া গিয়া তথায় তাহাদিগের একটি প্রদর্শনী করিয়া খুব পয়সা উপার্জন করিল। শেষে সব পয়সাতুলি নিজেরা লইয়া তাহাদিগকে ইউরোপের অন্তর লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেল। এই গরিব বেচারারা কোন ইউরোপীয় ভাষার একটি শব্দও জানিত না। যাহা হউক, অষ্ট্রিয়ার ইংরেজ কনসল তাহাদিগকে লগুনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা লগুনেও কাহাকেও জানিত না—সুতরাং সেখানে গিয়াও নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। কিন্তু একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলা তাহাদের বিষয় জানিতে পারিয়া এই ব্রহ্মবাসী বৈদেশিকগণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া নিজের কাপড় চোপড়, নিজের বিছানা পত্র, যাহা কিছু প্রয়োজন, সব দিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন আর সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। আর দেখ, তাহাও ফল কেমন হইল। তার পরদিনই যেন সমগ্র জাতিটা জাগিয়া উঠিল—চারিদিক্ হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল—তাহাদিগকে শেষে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সভাসমিতি যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রেমের (অন্ততঃ নিজ জাতির প্রতি) পর্ততদ্ভূত ভিত্তিই তাহাদের সমুদয় কার্যের মূল। তাহারা সমগ্র জগৎকে ভাল না বাসিতে পারে, তাহারা আর সকলের শত্রু হইতে পারে, কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে, তাহারা নিজেদের দেশে নিজ জাতির প্রতি অগাধ প্রেমসম্পন্ন এবং তাহার দ্বারে সমাগত বৈদেশিকগণের প্রতিও সন্ত্য, স্নায় ও দয়াপরায়ণ। পাশ্চাত্য দেশের সকল স্থানে

উহারা কিরূপ অদ্বুতভাবে আমার আতিথ্যসংকার ও যত্ন করিয়াছিল একথা যদি আমি তোমাদের নিকট বার বার না বলি, তাহা হইলে আমি মহা

আমাদের জাতীয়তা অকৃতজ্ঞ তাদোষে দূষিত হইবে। এখানে সে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় হৃদয় কোথায়, যে ভিত্তির উপর এই জাতির উন্নতি প্রেম ও সহায়ত্ব ভিত্তি অভাব। প্রতিষ্ঠিত হইবে? আমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটা

ছোটখাট যৌথ কারবার খুলিলাম—কিছুদিন চলিতে না চলিতেই আমরা পরস্পরকে ঠকাইতে লাগিলাম, শেষে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তোমরা তাহাদের অজ্ঞকরণের কথা বল—আর তাহাদের ত্রায় শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে চাও। কিন্তু তোমাদের ভিত্তি কই? আমাদের বালির ভিত্তি, তাই উহার উপর নিশ্চিত গৃহ অল্পকালের মধ্যেই চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

অতএব হে লাহোরবাসী যুবকজন, আবার সেই অদ্বুত অদ্বৈত পতাকা

উড্ডীন কর—কারণ, আর কোন ভিত্তিতে তোমা-

সর্বস্ব, এমন কি মুক্তির দের ভিতর সেই অপূর্ণ প্রেম জন্মিতে পারে না—

আশা পয়াত ত্যাগ করিয়া বতদিন না তোমরা সেই এক ভগবানকে একভাবে

দেশেব কল্যাণের জন্য সর্বত্র অবস্থিত দেখিতেছ, ততদিন তোমাদের

প্রস্তুত হও। ভিতর সেই প্রেম জন্মিতে পারে না—সেই মেয়ে

পতাকা উড়াইয়া দাও। ‘উঠ, জাগ, বতদিন না লক্ষ্যে প’হিছে—ছ, ততদিন

নিশ্চিন্ত থাকিও না।’ উঠ, আর একবার উঠ—কারণ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই

হইতে পারে না। অপরকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের

অহংকে বিসর্জন করিতে হইবে। খ্রীষ্টিয়ানদের ভাষায় বলি,—তোমরা

ঈশ্বর ও শয়তানের সেবা এক সঙ্গে কখন করিতে পার না। বৈরাগ্য—

তোমাদের পূর্ণপুরুষগণ বড় বড় কায় করিবাব জন্ত স-সার ত্যাগ করিয়া-

ছিলেন। বর্তমান কালে এমন লোক অনেক রহিয়াছেন, যাঁহারা নিজেদের

মুক্তির জন্ত সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও,

এমন কি, নিজেদের মুক্তি পর্যাঙ্ক দূরে ফেলিয়া দাও—যাও—অপরের সাহায্য

কর। তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু এই তোমাদের

সম্মুখে কার্য্যকরী বেদান্ত স্থাপন করিলাম। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিস-

র্জনে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি, আমি,

আমাদের মত হাজার হাজার লোক যদি অনশনে মরে, তাহাতেই বা

কি? কি?

এই জাতি ডুবিতেছে, অগণন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অভিশাপ আমাদের  
মস্তকে রহিয়াছে—যাহাদিগকে আমরা নিত্য-  
দেশের জনসাধারণের প্রবাহিত অমৃতনদী পার্শ্বে বহিয়া যাইগেও তৃষ্ণার  
জন্য প্রাণপণ কর। সময় পয়ঃপ্রণালীর জল পান করিতে দিয়া আসি-  
য়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যাহাদিগকে সন্মুখে  
অপর্যাপ্ত আহারীয় থাকিতেও আমরা অনশনে মরিতে দিয়াছি, অসংখ্য  
লক্ষ লক্ষ লোক—যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, এবং  
প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী, যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা  
লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে  
বলিয়াছি—সকলেই সমান, সকলেই সেই এক ব্রহ্ম কিন্তু উহা কার্যে পরিণত  
করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—“মনে মনে রাখলেই হ’ল—ব্যবহা-  
রিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা—বাপ রে!!” তোমাদের চরিত্রের  
এই দাগ মুছিয়া ফেল। উঠ, জাগো। এই ক্ষুদ্র জীবন যদি যায়, ক্ষতি  
কি? সকলেই মরিবে—সাদু অসাদু, ধনী দরিদ্র সকলেই মরিবে। শরীর  
কাহারও চিরকাল থাকিবে না। অতএব উঠ, জাগো ও সম্পূর্ণ অকণ্ট হও।  
ভারতে বোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র—চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও  
চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা জিনিষকে মরণকামড়ে ধরিয়া ধানিতে  
পারে।

“নীতিনিগুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা সুখ্যাতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন  
বা চলিয়াই যান, মৃত্যু আজই হউক বা শতাব্দান্তেই হউক, তিনিই ধীর, যিনি  
ছায়া পথ হইতে এক পদও বিচলিত না হন।” উঠ, জাগো—সময় চলিয়া  
যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি রুখা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। উঠ,  
জাগো, সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত মতান্তর লইয়া রুখা বিবাদ  
পরিত্যাগ কর। তোমার সামনে যে খুব বড় কাজ রহিয়াছে—লক্ষ লক্ষ  
লোক ডুবিতেছে—তাহাদিগকে উদ্ধার কর!

এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে  
প্রথম আসে, তখন ভারতে ছয় কোটি হিন্দুর নিবাস  
উপসংহার। ছিল, আজ সে স্থলে দুই কোটিরও কম হইয়াছে।  
ইহার কোন প্রতীকার না হইলে দিন দিন আরও  
কমিয়া যাইবে। শেষে আর হিন্দু কেহ থাকিবে না। হিন্দু জাতি লোপের

সঙ্গে সঙ্গেই—তাহাদের শতদোষ সঙ্গেও জগতের সমক্ষে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও এখনও তাহারা যে সকল মহৎ মহৎ ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপে বর্তমান, সে গুলিও লুপ্ত হইবে। আর তাহাদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্ম জ্ঞানের চূড়ামণি স্বরূপ অপূর্ব অবৈত তত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব উঠ, জাগো, জগতের আধ্যাত্মিকতা রক্ষার জন্য বাছ প্রসারিত করিয়া দাও। আর প্রথমে তোমাদের স্বদেশের কল্যাণের জন্য এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত কর। আমাদের প্রয়োজন—ধর্ম ততটা নহে—জড় জগতে এই অবৈতবাদ একটু কার্যে পরিণত করিতে হইবে, প্রথমে অম্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তার পর ধর্ম। পরীষ বেচারার অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্ম উপদেশ দিতেছি! মত মতান্তরে ত আর ক্ষুধা মেটে না! আমাদের দুইটা দোষ বড়ই প্রবল—প্রথমতঃ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়তঃ প্রেমগুণ্যতা—হৃদয়ের শুষ্কতা। লক্ষ লক্ষ মত মতান্তরের কথা বলিতে পার, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের হৃৎ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, বেদের উপদেশানুযায়ী যতদিন না জানিতেছে যে, তাহার তোমার শরীরের অংশ স্বরূপ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা—দরিদ্র ও ধনী, সাধু ও অসাধু, সকলেই যাহাকে তোমরা এক বল, সেই অনন্ত সঙ্গরূপের অংশ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কিছু হইবে না।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিকট অবৈতবাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আর এখন ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—শুধু এ দেশে নয়, সমগ্র। আধুনিক বিজ্ঞানের গৌরবোজ্জ্বল্যে সকল স্থানের বৈতবাদাত্মক ধর্ম সকলের কাচ-নিষ্পিত ভিত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতেছে। শুধু এখানেই যে বৈতবাদীরা শাস্ত্রীয় শ্লোকের টানিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে (এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না—থোকগুলি ত আর রবার নহে!) শুধু, এখানেই যে উহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্ধকারে কোণে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে, ইউরোপ আমেরিকা এই চেষ্টা আরও বেশী। আর তথ্যও ভারত হইতে এই তত্ত্বের কিছু অন্ততঃ গিয়া প্রবেশ করা চাই। ইতিপূর্বেই উহা গিয়াছে—উহার প্রসার দিন দিন আরও বাড়াইতে হইবে। পাঁচাত্তম শতাব্দীতে রক্ষা করিতে উহা বিশেষ প্রয়োজন।

কারণ, পাশ্চাত্য দেশে তথাকার প্রাচীন ভাব উঠিয়া গিয়া এক নূতন ধরণ—  
কাকনের পূজা—প্রারম্ভ হইতেছে। এই আধুনিক ধর্ম অর্থাৎ পরম্পর  
প্রতিযোগিতা ও কাকনপূজা অপেক্ষা যে, সেই প্রাচীন অপরিণত ধর্মপ্রণালী  
ছিল ভাল। কোন ঋতিষতাই প্রবল হউক না কেন, কখনই এরূপ ভিত্তির  
উপর দাড়াইতে পারে না। আর জগতের ইতিহাস আমাদেরকে বলিতেছে,  
যাহারাই এইরূপ ভিত্তির উপর তাহাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছে,  
তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে। যাহাতে ভারতে এই কাকনপূজার তরঙ্গ  
প্রবেশ না করে, তাহার দিকে প্রথমেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।  
অতএব সকলের নিকট এই অদ্বৈতবাদ প্রচার কর, যাহাতে ধর্ম আধুনিক  
বিজ্ঞানের প্রবলপ্রাচীরেও অক্ষত থাকিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, তোমা-  
দিগকে অপরকেও সাহায্য করিতে হইবে—তোমাদের ভাবরাশি ইউরোপ,  
আমেরিকার উদ্ধার সাধন করিবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া  
দিতেছি যে, এখানেই প্রকৃত কাণ রহিয়াছে আর সেই কার্যের প্রথমংশ  
—ভারতের লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় অজ্ঞানতিমিরচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের  
উন্নতি সাধন। তাহাদের কল্যাণের জন্ত, তাহাদের সহায়তার জন্য বাহ  
প্রণারিত করিয়া দাও এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—

তত্বেব ভৈরবিতঃ সর্গো যেযাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

গীতা ।

যাহাদের মন এই সাম্যভাবে অবস্থিত, তাহারা ইহ জীবনেই সংসার জয়  
করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাহারা ব্রহ্মে  
অবস্থিত।

## রাজপুতানা ।

স্বামীজি লাহোর হইতে দেৱাছনে গমন করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন মানস করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকজনের সঙ্গে বেশী দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা কহিতে না হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইত, কিন্তু অদম্য মহাশক্তি তাঁহার ভিতর কার্য করিতেছে, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? অতি গোপনে থাকিলেও লোকে তাঁহার বিষয় জানিতে পারিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল—তিনিও তাহা-দিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এখানে আসিবার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজির শিষ্য সেভিয়ার দম্পতী তখন হিমালয়ের কোন নিহৃত স্থানে একটা আশ্রমবাটী নির্মাণার্থ জমী অধিবেশন করিতেছিলেন—এখানে সুবিধামত স্থান মিলিল না। এখানে সঙ্গী শিষ্যগণকে রীতিমত রামায়ণের ভাষ্যমত বেদান্ত অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। বেদান্তাধ্যাপনার স্বামীজি সময়ে সময়ে একপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সেভিয়ারদম্পতী অপরূহ ভ্রমণের জন্য আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেও খেরল করিতেন না।

দেৱাছন হইতে সাহারাণপুরে আসিলে স্থানীয় উকিল বন্ধুবিহারী বাবু তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্বক নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক এখানে থাকিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তখন রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে বাইতে উৎসুক হইয়াছেন। সূতরাং তাঁহাদের অনুরোধ অত্যাখ্যান করিতে হইল।

সাহারাণপুর হইতে দিল্লীতে আসিয়া স্বামীজি ৪৫ দিন অবস্থান করিলেন। স্বামীজির এক্ষণে আর অভ্যর্থনা প্রতীতিতে রুচি নাই—এখন প্রাচীন শিষ্য ও বন্ধুগণের সহিত মিলনে উৎসুক। তাই এখানে ধনী লোকের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পুরাতন গরিব শিষ্যের বাটীতে উঠিলেন। আবেগিকা যাইবার বহু পূর্বেই ভারতভ্রমণের সময় ইহঁার সহিত স্বামীজির পরিচয় হয় এবং স্বামীজির সহবাসে ইহঁার পূর্ব চরিত্রের পরিবর্তন হয়। ইনি বরাবরই অতি সরল প্রকৃতি ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। স্বামীজিকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে একসময় স্বামীজি রেলের তৃতীয় শ্রেণীর

গাড়ীর কাছে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার নিকট একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থনা করায় ইনি বলিয়াছিলেন, ‘কি গুরুজী, বিলাস ঢুক্ছে বে!’ এখন তাঁহার সেই গুরুজী পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেও গুরুশিষ্যে সেইরূপ অকপট ভাবে কথা চলিতে লাগিল। একদিন তিনি বলিলেন, ‘গুরুজী, প্রায় ৫৬ মাস যাবৎ সন্ধ্যা আত্মিক করছি, কিন্তু কিছু light পাচ্ছি নে।’ স্বামীজি বলিলেন, ‘ভাষায় ভগবান্কে ডাক্’বি। এই বলিয়া গায়ত্রীর অর্থ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আর একদিন স্বামীজির জনৈক ব্রহ্মচারী শিষ্যের শিক্ষা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কি? ব্রহ্মচারী উত্তরপ্রদানে কিছু ইতস্ততঃ করায় স্বামীজি বলিলেন, ‘এ ব্রহ্মচারী কিনা—তাই শিক্ষা রাখিয়াছে।’ শিষ্য অমনি উত্তর করিল—‘আর আপনি বুঝি পরমহংস হয়েছেন!’ বাহা হউক, ইনি প্রাণপণে স্বামীজি ও তাঁহার শিষ্যগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এখানকার কলেজের একটি অধ্যাপক স্বামীজির নিকট খুব যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগে দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোকের একটা ক্ষুদ্র সভা হইল। স্বামীজি সমাগত সকলেরই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে দিল্লীর কেল্লা, কুতব মিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমৃদ্ধ দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামীজি সঙ্গিগণকে এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা গল্পের মত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক একখানি স্মৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।

দিল্লী হইতে স্বামীজি আলোয়ারে চলিলেন। চারিদিকে রাজপুতানার বালির পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। ট্রেন রেওয়াড়ি স্টেশনে পৌঁছিলে দেখা গেল, তথায় খেতড়ির রাজার লোক পাল্কি, উট, রথ, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যান লইয়া উপস্থিত। খেতড়ি জয়পুরের অধীন একটা ক্ষুদ্র-রাজ্য—জয়পুর সহর হইতে মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ১০ মাইল পথ বাইতে হয়। রেওয়াড়ি স্টেশন হইতে প্রায় ২০ মাইল কম পড়ে। কিন্তু স্বামীজি কিরূপে একেবারে খেতড়ি যাটবেন? তাঁহাকে যে আলোয়ার যাইতে হইবে। বাঁহারা উত্তোষনে ‘আলোয়ারে শ্রীবিবেকানন্দ’ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এই স্থানে স্বামীজি আসিয়া প্রায় একমাস ছিলেন। তখন অনেক যুবক তাঁহার চরিত্রে আকৃষ্ট

হইয়া তাঁহার শিষ্য হন। তাগাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন? আলোয়ারে এই ভক্ত শিষ্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ৪৮ দিন তথায় থাকিলেন ও এক আধুনি বহুতাও করিলেন। পরে জয়পুর যাওয়া হইল। এখানেও স্থানীয় বহু বহু সম্মান ব্যক্তি সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বামীজি খেতড়ির রাজার বাঙ্গালায় রহিলেন। শিষ্যগণকে সম্বোধিয়া স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, এই স্থানেই একদিন সাযাণ্ড ফকির বেশে আসিয়াছিলাম—তখন রাজপাচক অনেক মুখনাড়া দিয়া দিনান্তে চারিটা খাইতে দিয়া যাইত! আর এখন পালকের গদিতে শয়নের বন্দোবস্ত হইতেছে—এখন কত লোক সেবার জ্ঞান অহরহঃ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শাপে সত্যই উক্ত হইয়াছে,—‘অবস্থা পূজ্যতে রাজন ন শরীরং শরীরিণাং।’ জয়পুর হইতে ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খেতড়ি যাওয়া হইল। এদিকে মকভূমির মধ্য দিয়া যাওয়া হইতেছে, বাই পড়াওরে পঁহছান হইল, অমনি বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ। কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা রথযোগে চলিতেছে। কত প্রসঙ্গ, কত আনন্দের কথাই হইতেছে। এই সময়ে স্বামীজি রাতে একটা পড়াওয়ে ভূত দেখিয়াছিলেন বলিয়াছিলেন।

খেতড়ি পঁহছিতে প্রায় বার মাইল আছে, এমন সময় রাজা অগ্রবর্তী হইয়া আসিয়া স্বামীজির পাদবন্দনা করিলেন এ৭ং নিজের ছোঁড়ার গাড়ীতে স্বামীজিকে তুলিয়া লইয়া খেতড়িতে উপনীত হইলেন।

এদিকে খেতড়িতে মহা উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। রাজা অল্পদিন হইল, পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাই প্রজাবর্গ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জ্ঞান নানাবিধ আয়োজন করিয়াছে। স্বামীজির আগমনে তাহাদের এই উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সমারোহ সহকারে ভোজ, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল। অভিনন্দনপত্রও পড়া হইল। স্বামীজি ও রাজাজী উভয়েই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। একটা পর্বত-চূড়ায় অবস্থিত মনোহর বাঙ্গালায় স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

১৭ই ডিসেম্বর স্থানীয় স্বল্পগৃহে একটা সভা আহুত হইয়া বিভিন্ন সমিতি হইতে রাজাজী ও স্বামীজি উভয়কেই অভিনন্দন দেওয়া হইল। এই দিন স্বপ্নের সাপ্তাহিক পারিতোষিক নিতরণেব দিনও স্থির হইয়াছিল। রাজাজী সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি ছাত্রাদিগকে পুরস্কার



বিতরণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সমিতি হইতে রাজাজীকে যে অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি সকলকে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন—কারণ, মিশনের প্রধান অধ্যক্ষই (স্বামীজি) তথায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার পূর্বে যে সকল ভাব লইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ভাব-সমূহের বাহাতে আরো বিস্তৃতি হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে শিক্ষাবিভাগের খুব উন্নতি হইয়াছে—এই বৎসরেই তিনটি নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর পুরাতন স্কুলটিরও বেশ উন্নতি হইতেছে—তিনি অঙ্গীকার করিলেন, চিকিৎসা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি শীঘ্রই চেষ্টা করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর স্বামীজি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি রাজাজীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি বৎ-কিকিৎ যাহা করিয়াছেন, রাজাজীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাহাও তিনি করিতে পারিতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন, পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ ভোগ ও প্রাচ্যদেশের—ত্যাগ। তিনি খেতভিনিবাসী যুবকগণকে পাশ্চাত্য আদর্শের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া প্রাচ্য আদর্শের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করা। অতএব—শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ আর আমাদের তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশু-দিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদের কাছে রাখিতে হইবে; তাহারাও বাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এই ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্তা পূরণে সমর্থ হইবে।

২০শে ডিসেম্বর স্বামীজি শিষ্যগণের সহিত যে বাঙ্গালায় ছিলেন, সেই বাঙ্গালায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা

করেন। স্থানীয় সমুদয় ভদ্রলোক এবং কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজাঞ্জী সভাপতি হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এখানে কোন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ না থাকাতে সমগ্র বক্তৃতাটি পাওয়া যায় না। তাঁহার দুই জন শিষ্য সেই সময়ে যে নোট লইয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

খেতড়ি বক্তৃতা।

গ্রীক ও আৰ্য্য—প্রাচীনকালের এই দুই জাতি—বিভিন্ন অবস্থাচক্রে স্থাপিত হইয়া—প্রথমোক্ত জাতি প্রকৃতির মধ্যে বাহা কিছু সুন্দর, বাহা কিছু মন্দ, বাহা কিছু লোভনীয় তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং বীৰ্য্যপ্রদ আবহাওয়া পাইয়া এবং শেষোক্ত জাতি চতুর্লিপ্ত সর্ববিধ মহিমাময় ভাবের মধ্যে স্থাপিত হইয়া এবং অধিক শারীরিক পরিশ্রমের অননুকূল আবহাওয়া পাইয়া দুই প্রকার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট সভ্যতার সূচনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ গ্রীকগণ বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত ও আৰ্য্যগণ অন্তঃপ্রকৃতির অনন্ত আলোচনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একজন ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনায় ব্যস্ত হইলেন, অপরে ভাণ্ডের তত্ত্বসম্বন্ধে নিযুক্ত হইলেন। জগতের সভ্যতায় উভয়েরই নির্দিষ্ট বিশেষ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে একজনকে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে, তাহা নহে। পরস্পরের সহিত কেবল পরস্পরকে পরিচিত হইতে হইবে—তাহা হইলে উভয়েই লাভবান হইবে। আৰ্য্যগণের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রিয়। গণিত ও ব্যাকরণ বিদ্যায় তাঁহারা অদ্বুত ফলশাভ করিয়াছিলেন আর মনের বিশ্লেষণবিদ্যায় তাঁহারা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা পিথাগোরাস, সফ্রেটিস, প্লেটো এবং ইজিপ্টের নিও-প্লেটোনিষ্টদের ভিতর ভারতীয় চিন্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই।

তার পর তিনি বিস্তারিতভাবে ইউরোপের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাবের চিহ্ন কিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় চিন্তা স্পেন, জার্মানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় রাজপুত্র দারা শুকো উপনিষদ্ পারসিতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শোপেনহাওয়ার নামক জার্মান দার্শনিক উহার একখানি লাতিন অনুবাদ দেখিয়া উহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার দর্শনে উপনিষদের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে সাধারণতঃ শব্দবিদ্যার চর্চার জগ্ৰই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত আলোচনা

করিয়া থাকেন। তবে অধ্যাপক ডয়সনের জায় ব্যক্তিও আছেন, যাহাদের দর্শনচর্চায় আগ্রহ আছে। স্বামীজি আশা করেন, ভবিষ্যতে ইউরোপে সংস্কৃতচর্চায় আরো অধিক বড় দেখা যাইবে। তার পর স্বামীজি দেখাইলেন, পুরাকালে ‘হিন্দু’ শব্দে সিদ্ধুদের পরপারবাসিগণকে বুঝাইত—তখন ঐ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শব্দের দ্বারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না। কারণ, সিদ্ধুদের পারে এখন নানা জাতি ও নানা ধর্মাবলম্বী লোক বাস করিয়া থাকে।

তার পর তিনি বেদ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য নিস্তারিত ভাবে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাক্য নহে। বেদনিষদ্ধ তাবরাশি ধীরে ধীরে বিকাশ হইয়া পরিশেষে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামীজি বলিলেন, অনেক ধর্মই এইরূপ গ্রহে নিবদ্ধ, গ্রন্থ-সমূহের প্রভাবও অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দুদের এই বেদরাশি রূপ গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখনও সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তবে বেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে হইবে, পক্ষতদুচ্চ ভিত্তির উপর এই বেদ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। বেদরাশির কলেবর প্রকাণ্ড। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটা বেদাংশের চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা এখনও পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড হলে ধরে না। এই বেদরাশি অতি প্রাচীনতম, সরল, অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার ব্যাকরণও এত অপরিস্রুত যে, অনেকে মনে করেন যে, বেদাংশবিশেষের কোন অর্থই নাই।

তিনি তার পর বেদের দুই ভাগ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। কর্মকাণ্ড বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বুঝায়। ব্রাহ্মণে ষাগবজ্রের কথা আছে। সংহিতা অমুষ্ণুপ্, ত্রিষ্ণুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত স্তোত্রাবলি—সাধারণতঃ উহাতে বরুণ বা ইন্দ্রদেবতার স্তুতি আছে। তার পর প্রশ্ন উঠিল, এই দেবতারা কাহার। এই সম্বন্ধে যেমন এক এক মতবাদ উঠিতে লাগিল, অন্যান্য বচন দ্বারা আবার সেই সকল মত খণ্ডিত হইতে লাগিল।

তার পর তিনি উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণাসমূহের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রাচীন বাবিলনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মরিলে তাহা হইতে আর একটি দেহ বাহির হইয়া যায়। এই 'দ্বিতীয়' শরীরেরও মূল শরীরের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মনোরক্তি আদিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মূল দেহটীতে কোনরূপ আঘাত করিলে 'দ্বিতীয়'টীও আহত হইবে। মূল দেহটী নষ্ট হইলে 'দ্বিতীয়'টীও নষ্ট হইবে। এই কারণে মৃত দেহ রক্ষা করিবার প্রথা সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই মমি, সমাধিসম্ভার প্রভৃতির উৎপত্তি। ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসী এবং যাহুদীগণ ইহাব অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আত্মতত্ত্বে পৌঁছিতে পারেন নাই। এদিকে ম্যাক্সমুলার বলেন, ঋগ্বেদে পিতৃ-উপাসনার লামান্য চিহ্নত্রয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তথায়, মমিগণ একদৃষ্টে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে, এই বীভৎস ও ভীষণ দৃশ্য দেখা যায় না। দেবগণ মানবের প্রতি মিত্রতাবাপন্ন, উপাস্ত ও উপাসকের সম্বন্ধ বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হৃদয়ের অভাব নাই। সামাজিক বলিলেন, বেদের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন দেবতাদের হস্তধ্বনি স্পষ্ট শুনিতেছেন। তাঁহাদের সকল ভাবের হয়ত সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া নাই, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় ভাবোন্মীলিত ছিল, আমরা তাঁহাদের তুলনায় পশুতুল্য।

তার পর তিনি অনেক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার কথিত তত্ত্বের সমর্থন করিতে লাগিলেন—‘যেখানে পিতৃগণ নিবাস করেন, তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও—যেখানে কোন দুঃখ শোক নাই’। এইরূপে এদেশে এই ভাবের আবির্ভাব হইল যে, যত শীঘ্র শবদেহ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, ততই ভাল। তাঁহাদের ক্রমশঃ এই ধারণা হইল যে, মূল দেহাতিরিক্ত একটী সূক্ষ্মতর দেহ আছে; উহা মূলদেহ ত্যাগের পর এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কেবল আনন্দ, কোন দুঃখ নাই। সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর। তাঁহাদের ধারণা এই ছিল যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে। কিন্তু প্রাচীন ঋগ্বেদের ভাব এই যে, মানুষ যদি ঈশ্বরকে চাক্ষুষ দেখিতে পায়, তবেই তাহার স্বার্থ জীবন আরম্ভ হইবে।

এপ্র দিক্কাশিত হইতে লাগিল যে, এই দেবগণ কি। ইচ্ছা সম্বন্ধে

দময়ে মানবকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কখন কখন ইন্দ্র, অতিরিক্ত সোমপানে মত্ত বলিয়াও বর্ণিত ; স্থানে স্থানে তাঁহাকে সর্পশক্তিমান্ সর্পব্যাপী প্রকৃতি বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। বরুণদেব সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সকল বর্ণনাত্মক মন্ত্র-শ্লোক স্থানে স্থানে অতি অপূর্ণ। তারপর আর এক কথা। বেদের ভাষা অতি-শর মহান্ভাবদ্যোতক। তায় পর স্বামীজি প্রলয়বর্ণনাত্মক বিখ্যাত নাসদীয় হুক্ত—যাহাতে অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত বলিয়া বর্ণিত আছে—আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, যাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা যদি অসম্ভ্য হন, তবে আমরা কি ? সেই ঋষিদিগের উপর অথবা তাঁহাদিগের দেবতা ইন্দ্রবরুণাদির উপর তিনি কোনরূপ সমালোচনা করিতে অক্ষম। এ যেন ক্রমাগত পট পরিবর্তন চলিতেছে আর সকলের পশ্চাতে সেই এক বস্তুরহিয়াছেন, যাহাকে জ্ঞানিগণ বহুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—‘একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ এই দেবগণের বর্ণনা অতি রহস্যময়, অপূর্ণ, অতি সুন্দর। উহার দিকে যেন ঘেঁসিবার যো নাই, এত মূঢ় যে, উহার স্পর্শমাত্রেই যেন উহা ভগ্ন হইয়া যাইবে, মরীচিকার মত অন্তর্হিত হইবে।

একটা বিষয় তাঁহার নিকট খুব স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীকদের জায় আর্ধ্যগণও প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন—সুন্দর রমণীয় বাহু জগৎ তাঁহাদিগকেও প্রেলোভিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের এইটুকু বিশেষত্ব ছিল যে, এখানে মহান্ভাব-দ্যোতক না হইলে তাহার কোন মূল্যই ছিল না। মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার বখার্ব তদ্ব্যতিরিক্ত নিরূপণ ইচ্ছা সাধারণতঃ গ্রীকদের মনে উদয়ই হয় নাই। এখানে কিন্তু এই প্রশ্ন প্রথম হইতেই বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে,—আমি কি ? মৃত্যুর পর কোথায় যাইব ? তাহাদের মতে মাহুয মরিয়া স্বর্গে যায়। স্বর্গ কি ? সমুদ্রের বাহিরে যাওয়া, ভিতরে নথ—কেবল বাহিরে—তাহার লক্ষ্য কেবল বাহিরের দিকে, শুধু তাহাই নহে, সে নিজের যেন নিজের বাহিরে। আর যখনই সে এই জগতের দুঃখবিবর্জিত সুখ লাভ করিল, অমনি সে তৃপ্ত হইল—তার ধর্ম আর ইহার উপর উঠিতে পারিল না। হিন্দুদের মন কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। স্বর্গও স্থল জগতের অন্তর্গত। বাহ্য কিছু সংযোগোপর, তাহারই বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী। তাহারা প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিলেন,—‘আত্মা কি তাহা কি তুমি জান ?’ উত্তর আসিল, না।

‘ঈশ্বর আছেন কি?’ প্রকৃতি উত্তর দিল—জানি না। তাঁহারা তখন প্রকৃতির নিকট হইতে কিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, বহিঃপ্রকৃতি যতই মহান হউক, উহা দেশকালে সীমাবদ্ধ। তখন আর একটা বাণী উথিত হইল, অস্তুবিধ মহান্ভাবের ধারণা উদয় হইতে লাগিল। সেই বাণী বলিল,—‘নেতি, নেতি’—ইহা নহে, ইহা নহে—তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হইয়া গেলেন, চন্দ্র সূর্য্য তারা এক হইয়া গেল—তখন আর এক আদর্শ, ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ন ভদ্র হর্ষোতাতি ন চন্দ্রতারকম্ ।

তথায় সূর্য্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও নহে—এই বিদ্রুতও তথায় প্রকাশ পায় না, সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইলেই সমুদয় প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সেই সীমাবদ্ধ, অপরিশ্রুত, ব্যক্তিবিশেষ, সকলের পাণপুণ্যের বিচারকারী ক্ষুদ্র ঈশ্বরের ধারণা রহিল না, আর বাহিরে অবেষণ রহিল না, নিজের ভিতরে অবেষণ আরম্ভ হইল।

ছায়াভগ্নো ব্রহ্মবিদো বদন্তি ।

এইরূপে উপনিষৎসমূহ ভারতের বাইবেল হইয়া দাঁড়াইল। এষ্ট উপনিষদও অসংখ্য, আর ভারতে বহু বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত, সবই উপনিষদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তার পর স্বামীজি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের কথা উত্থাপন করিয়া উহাদের এই ভাবে সমন্বয় করিলেন—এইগুলি যেন এক একটা সোপানস্বরূপ—এক একটা সোপান অতিক্রম করিয়া শেষে ‘তত্ত্বমসি’ রূপ অদ্বৈত ভয়ে পৌঁছান যায়। ইহা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভাষাকারগণ, যথা শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য যদিও সকলেই উপনিষদে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, উপনিষদ একমাত্র মত শিক্ষা দিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, উপনিষদ এক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব সোপানারোহণ ভ্রমে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তার পর তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কল্কগুলি বাহ্য অশুষ্ঠানমাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার লোকে এখন হিন্দুও নহে, বৈদান্তিকও নহে, তাহারা ছুৎমার্গী। রানাস্বর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাড়িবর্ত্তন দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতাবদূর হওয়া চাইই চাই আর

বত শীত্র ইহা চলিয়া যায়, ততই বঙ্গল। উপনিষৎসমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হউক আর বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যেন না থাকে। তার পর তিনি উপনিষদে বর্ণিত দুইটি পক্ষীর উদাহরণ দিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মায় সংঘর্ষ উদ্ভবরূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইলেন।

স্বামীজির শরীর তত সূস্থ না থাকায় এই পর্য্যন্ত বলিয়াই স্বামীজি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে অর্ধঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অর্ধঘণ্টা পরে স্বামীজির পুনরায় প্রায় অর্ধঘণ্টা বক্তৃতার পর সভাতঙ্গ হইল। ইহার আর কোনরূপ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

— —

খেতড়ি হইতে প্রায় সকল শিষ্য ও সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া একজনমাত্র শিষ্যকে সঙ্গেলইয়া স্বামীজি পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাজীও সঙ্গে গেলেন। রাজাজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় এক দেবালয়ে স্বামীজির এক বক্তৃতা হইল। প্রায় ৫০০ শ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। জয়পুর হইতে বহির্গত হইয়া স্বামীজি যোধপুর, আজমির, ঝাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর স্বামীজির স্বাস্থ্য তত ভাল না থাকায় ও অত্যন্ত কারণে চারিদিকে ঘুরিয়া বক্তৃতাাদি প্রদানে সমর্থ হন নাই। মঠাদি প্রতিষ্ঠা, শিষ্যগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্যেই অধিক সময় ব্যাপন করিয়াছিলেন। মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তথায় প্রায় দেড়বৎসর ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যায়। একটু শরীর সুস্থবোধ করিলে ঢাকা এবং আসামের গৌহাটী ও শিলঙে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। উহাদেরও রীতিমত রিপোর্ট পাওয়া যায় না। কেবল ঢাকা হইতে স্বামীজির জনৈক শিষ্য উদ্বোধনে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইটী এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা গেল।

— —

## ঢাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী 'শিষ্য সমভিব্যাহারে' ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোদালন্দের ষ্টামার পৌঁছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকার অণবাহাে ট্রেন পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব জমিদার ৬মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবদী জয়' ধ্বনিতে গগন পবিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজির গাড়ী বসে সঙ্গে দৌড়াইয়া বাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাবুর বাটতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজির সন্দর্শনে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির নিকট সদা সর্বদাই ভদ্রশোকগণ তাঁহার উপদেশোদ্ভূত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহে তিন দিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যহ প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মানসে স্বামীজি সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঙ্গলবাধ নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রে খুব স্রু। শুনা যায় নাকি ভগবান্ পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ভাই দলে দলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্ত আগমন করিয়া থাকে। এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রীগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দহৃদয় ছন্দধ্বনি উঠিত হইতেছে—কোথাও বা হরিনামের মধুরধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামীজি ব্রহ্মপুত্রে হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বড়ি গঙ্গা হইয়া ঢাকা সহরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ঢাকাবাসিগণের অত্যন্ত অস্বস্তিতে স্বামীজি এখানকার জগদ্রাথ



কলেজগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে ‘আমি কি শিখিযাছি?’ এই সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম এই—“আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখন নিজেব জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য্য। কিন্তু নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপভোগ্য করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্ত নানা সম্প্রদায়—বৈদেশিকভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে শিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্ম্মে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিত্তি বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইহঁারা ‘পৌত্তলিকতা’ বলিয়া একটা কথা রচনা করিয়াছেন। ইহঁারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ, উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন্ দিন ভগবানকে তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! বাহা হউক, মা ইহা-দিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহঁাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন—আমি তোমার অত শত বুদ্ধি না—বুদ্ধিতে চাহিও না, আমি চাই দেখরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া মূখ্য হৃৎথকে ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন—বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন দেখর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, দেখর ও সংসার, এক সঙ্গে কর। ইহঁাদের মনমুখ এক নহে। প্রকৃত মহাত্মাগণের উপদেশ এই,—যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম, রব্ রজনী কবি দোনো নহি এক ঠায়। যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে

পারে? এই জন্য ইহারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকান্ ভাগ করিতে হইবে। এই সংসারটা ত ভূয়া, শূন্য, কিছুই নয়। ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না প'র, তবে স্বীকার কর যে, আমি দুর্দল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিয়্য করিও না। মড়াকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এই জন্য ইহাদের মতে এই ধর্ম লাভ করিতে হইলে দৈব লাভ করিতে হইলে, ভাবের ঘরে চুরী প্রথম ছাড়িতে হইবে। আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—ভুলভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং। মনুষ্যঃ মুমুক্শুঃ মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ প্রথম চাই—মনুষ্য—মানুষ জন্ম—ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা—তার পর চাই—মুমুক্ততা—আমাদের সম্প্রদায় ও ব্যক্তি ভেদে সাধন প্রণালী ভিন্নভিন্ন—অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্নভিন্ন—কিন্তু মোটাশুটি এই বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ততা ব্যতীত দৈবের উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ততা কি? মোক্ষের জন্ম—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্ম প্রবল আগ্রহ—এই সংসারে প্রবল যগা। যখন ভগবানের জন্ম এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি দৈবলাভের অধিকারী হইয়াছ। তার পর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। গুরুপরাম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ততা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরুকরণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব? “শ্রোত্রিয়োহবুজিনোহকামহতো যো ব্রহ্মবিতমঃ।” যিনি শাস্ত্রের স্মরণহস্ত জানেন—“পু”থি পড়্কে তুতি ভয়ো পণ্ডিত না ভয়ো কোই। একঅক্ষর প্রেম্বে পড়ে ডই পণ্ডিত হোই ॥” শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজ কাল যে সে গুরু হইতে চাহে। তিনুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। “অবুজিনঃ”—যিনি নিম্পাপ—“অকামহত”—বাঁহার কেবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই—যিনি অহেতুক-দক্ষসিদ্ধি, যিনি কোন লাভের উদ্দেশে অথবা নাম বা যশের জন্ম উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে করতলামলকবৎ করিয়াছেন। তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে দৈব লাভ—দৈবপ্রত্যক্ষ সুগম হইবে। তার পর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই

কয়টা যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ—হে আধ্যাত্মানগণ—তোমরা এই আদর্শ কখন বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাহিরের যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, ভাঙ্গা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে, শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের অতীত প্রদেশে বাইতে হইবে।

৩১শে মার্চ স্বামীজি পোগোজ স্কুলের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে “আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি” (The Religion we are born in) সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজী ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহারও সার মর্ম্ম নিয়ে সঙ্কলিত হইল।

“প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদেরকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তায় এক বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীর্ত্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি মহর্ষি ছিলেন—তাহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আমাদেরকেও তাহাদের ন্যায় ঋষি হইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে—আমার বিশ্বাস, আমরা আরও শ্রেষ্ঠ ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল—আমি তাহা স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি; বর্তমান কালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি দুঃখিত নহি আর ভবিষ্যতে বাহা হইবে, তাহা ভাবিয়াও আমি আশাব্রিত। কারণ, আমি জানি, বীজের বীজত্বাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বাব নিহিত রহিয়াছে।

আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি, তাহার ভিতরে সাধারণ ভাব কি কি? আপাততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ। যতসম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা ত্বেতবাদী। কেহ অবতার মানেন, মূর্ত্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধেও নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাটেরা, মুসলমান বা খ্রীষ্টান, পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে।

পঞ্জাবের অনেক গ্রামে যে হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে ঘুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ চারিধর্মেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের অবাস্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার ঘো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই একটী বিষয়ে একত্ব দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আশাদের ধর্মের ভিতরেও এক মহান সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ—শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে সকল ধর্ম এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তাহাদের ভিতর একখানি বা বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম নানাবিধ অত্যাচার সন্তোষ এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীক ধর্মে নানাবিধ সৌন্দর্য থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল কিন্তু য়াহুদীধর্ম ওল্ডটেস্টামেন্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। হিন্দুধর্মও তদ্রূপ। উহার শাস্ত্র “বেদ” জগতের সপ্তপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটা ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যেই হউক দুইটাগোই হউক, কর্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া বজ্র করিয়া থাকে, আর বিবাহ শ্রাদ্ধাদিগ্ন যজ্ঞে মধ্যে মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আর উহা পূর্বের আয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিল্ল তট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অকৃতকার্য হন। তার পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্—বেদান্ত। উহাকেই শ্রুতি-শির বলিয়া থাকে। আচার্য্যগণ যেখানে শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন, সেইখানেই এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্মই এক্ষণে ভারতের ধর্ম। কোন সম্প্রদায় যদি গিঞ্জ মতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করে, তবে উহাকে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি বৈতবাদী, কি অবৈতবাদী সকলকেই উহার দোহাই দিতে হয়। বৈষ্ণবও আপন মত প্রমাণ করিতে গোপালতাপনী উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত বচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ উপনিষদ্ রচনা পর্য্যন্ত করিয়া লন। এক্ষণে বেদ-সম্বন্ধে হিন্দুগণের মত এই যে, উহা কোন পুস্তকবিশেষ বা কাহার রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে। সাংন্যচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন, “যো বেদেভ্যোহধিলং জগৎ নিশ্চয়ে”—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা

কেহ কখন দেখেন নাই সুচরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব । ঋষিগণ কেবল ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা । তাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্থিত বেদ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র ।

এই ঋষিগণ কে ? বাৎস্যায়ন বলেন,—যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা—তিনি স্পেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন । তাই প্রাচীনকালে বেদা-পুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । প্রকৃত উপায়ে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আর কোন ভেদ থাকে না । পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন—তবে হে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার । সেই ঋষিহলাভের চেষ্টা কর—জগৎ তোমার নিকট আপনা আপনিই নত হইবে । এই বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার । যথেষ্ট বাচং কল্যাণীয়াবদানি জনেভ্যঃ । ব্রহ্মরাজত্বাভ্যাং শূদ্রায চার্ঘ্যায় চ স্বায় চাবণায ॥—শুক্লযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র । এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই ? পুবাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্য যুগের, অমুক অংশ কলিয়ুগের জন্য । কিন্তু বেদ ত এ কথা বলিতেছেন না । ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে ? স্বতি পুবাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মিলে । না মিলিলে—অগ্রাহ্য । কিন্তু এখন আমরা পুবাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর্সন দিয়াছি । বেদের চর্চা ত বাঙ্গালা দেশ হইতে লোপই পাইয়াছে । আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই, যে দিন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রাম নিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে ।

বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আশা নাই । তাঁহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, কাল আবার উহা বদলাইয়া সহস্রবর্ষ পিছাইয়া দিতেছেন । যাহা হউক, এক্ষণে পুরাণের কথা পূর্বেরই বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য । পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বেদের সহিত মিলে না । যথা পুরাণে লিখিত আছে, কেহ দশ সহস্র কেহ বা বিংশ সহস্র বর্ষ জীবিত রহিয়া-ছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই—ঐতায়ুবৈ পুরুষঃ—এখানে বেদের কথাই

গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে অনেক সুন্দর সুন্দর যোগ ভক্তি জ্ঞান কণ্ঠের কথা দেখিতে পাই, সে গুলি অবশ্য লইতে হইবে। তার পর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র, যেমন কাপিল তন্ত্র। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধধর্ম্মাংশী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভাষ্যে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অমুদ্রিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি ধারাপ জিনিষ থাকিলেও লোকে উহা যতদূর ধারাপ ভাবে, তাহা নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগই একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আত্মকালকার সমুদায় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কস্মকাল তন্ত্রমতেই অমুদ্রিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সত্ত্বেও কতকগুলি এক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটি বিষয়—তিনটি অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল হুজুন পালন ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য জীবাশ্মাগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জন্মবাদ। আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ এক, কেহ কেহ বা পৃথক্ প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটি সকলেই বিশ্বাস করেন। এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ, সম্ভাগ করিবার জিনিষ বলিয়া জানে—আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ—উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা—প্রণালীবদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তদ্রূপ অন্তর্জগতের অবশেষে অতিশয় সাহসী।

যাহা হউক—এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আর দু'একটি কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এই অবতারবাদের প্রকৃত তাৎপর্য—মুখ্যপূজা—মুখ্যের ভিতর ঈশ্বরসাক্ষাৎই প্রকৃত ঈশ্বর সাক্ষাৎ।

হিন্দুগণ পদ্ধতি হইতে প্রকৃতির জগৎ যান না—মন্মথ হইতে মন্মথের জগৎ গমন করিয়া থাকেন। তার পর মূর্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্তদেবতা বা তীর্থ সকল দেবতাই এক একটা পদের নাম—কিন্তু এই পঞ্চ উপাস্তদেবতা কেবল সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই মূর্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাদম বর্ণিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া উহা অশ্রদ্ধ কার্য্য নহে। এই মূর্তিপূজার তিতরে নানানিধি কুৎসিত ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহা নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিগাহের উপাসনার ষোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণসংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মন্তকে ভগবানের আশীর্বাদ পতিত হউক। কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবখানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়ত উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এম সকলে মিলিয়া উহা পূর্য্য করিতে চেষ্টা করি, না পারি—এক-সঙ্গে ডুবিয়া মরি। আর ব্রাহ্মগণকেও বলি, তোমরা রথ্য আত্মমান আর রাখিও না—শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মত্ব আর নাই—কাণ্ডে তোমরা এতকাল য়েচ্ছ রাজ্যে বস করিতেছ। যদি তোমরা নিজের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিল্লভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভি-প্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত জগৎ ভূবানে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া ভূবানে প্রবেশ কর; তাহা না পার, আপনাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সন্ন্যাসধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।

## উপসংহার।

এই গ্রন্থে স্বামীজি প্রথমবার আমেরিকা প্রত্যাগমন হইতে দেহত্যাগের পূর্বপর্যন্ত বস্তুগুলি বস্তুত দিয়াছিলেন এবং কোথায় কিরূপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাই নিবন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তাঁহার বাল্যকালে ধর্মজীবনের বিকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সঙ্গ, সংসারত্যাগ, মঠে গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনভজন, সমগ্র ভারতভ্রমণ ও তপত্বার ইতিহাস, আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর অমরনাথাদি তীর্থভ্রমণ, নূতন মঠ স্থাপনান্তর নূতন ব্রহ্মচারিগণকে শিক্ষাদানের ইতিহাস প্রভৃতি স্বামীজির সম্বন্ধে অনেক মনোহর ও শিক্ষাগ্রদ বিষয় জানিবার আছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আপাততঃ এই স্থানে ক্ষান্ত হওয়া গেল। উহার মধ্যে কিছু কিছু উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু কিছু পরে উদ্বোধনে এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। উৎসুক পাঠকগণকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে।

